

Banglapdf.net Presents

মাসুদ রানা



অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



roni060007

মাসুদ রানা ৩৯৪
অন্তর্ধান
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7394-0

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ঠাণ্ডা মাথার, প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াককে

প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে মাসুদ রানা।

উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই দেখানো পথে,

ওকেই ধোঁকা দিয়ে। পিছনে ফেলে গেছে

ওর প্রিয় কয়েকজন বন্ধুর লাশ।

মরতে বসেছে সোহানাও!

এ ছাড়া রয়েছে অচেনা আরও দুই প্রতিপক্ষ দল,

ড. সিদ্দিকীকে হাতে পাবার জন্য

মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। শুরু করে দিয়েছে

খুন, অপহরণ আর ধ্বংসযজ্ঞ। তারপর?

অসুস্থ সোহানা শত্রুর হাতে...

রানার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়...

সিদ্দিকীর হাতে মৃত্যুর নির্যাস!

আর আপনার হাতে? বইটির দ্বিতীয় খণ্ড!

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা!



সেবা বই

প্রিয় বই

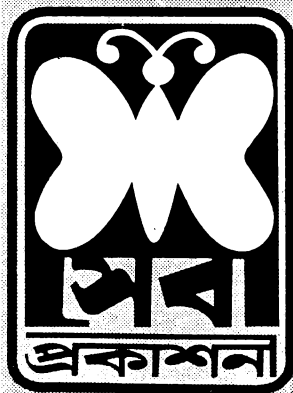
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



একষট্টি টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দুরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

e-mail: sebakprok@citechco.net

Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-394

ANTORDHAN

Part-II

A Thriller Novel

By: Qazi Anwar Husain

এক

সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই, লালচে একটা আভায় ঢেকে গেছে গোটা অলব্যানি। সেই আলোয় পথ দেখে গাড়ি চালাচ্ছে সোহানা চৌধুরী, পাশে বসে আছে মাসুদ রানা। খুব দুর্বল ও, ড্রাইভ করবার মত শক্তি নেই, শুধু পথনির্দেশ দিয়ে চলেছে সঙ্গিনীকে। অন্তরা আশরাফের বাড়ি চেনে না সোহানা, তাই রানার কথামত এগোতে হচ্ছে ওকে। তাড়া অনুভব করছে দুজনেই, তারপরও সাবধানে যেতে হচ্ছে, স্পিড লিমিটের মধ্যে থেকে। পুলিশ আটকালে সব ভজকট হয়ে যাবে।

পথনির্দেশ দেবার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে রানা, সবকিছু ব্যাখ্যা করছে সোহানার কাছে। ‘অন্তরা আমাদের রিলোকেশন টিমের ফর্জার, সেটা গোপন রাখা হয়েছিল ড. সিদ্দিকীর কাছে। তাই সেদিন ভোররাতে অ্যাসল্ট টিমকে খবর পাঠানোর আগে সেফ-সাইটের কম্পিউটার হ্যাক করেছে সে। আমাদের টিমের পার্সোনাল ডেটা ঘেঁটেছে। অন্তরার নাম-ঠিকানা সব জেনে নিয়েছে।’

বাঁক ঘোরার জন্য একটু চুপ করে থাকল সোহানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু ওকে খুন করবে কেন সিদ্দিকী? এখনও নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র কিছুই দেয়নি অন্তরা। ওগুলো হাতে পাবার আগ পর্যন্ত ওকে জীবিত রাখতে হবে তাকে। অন্তরাকে আমি ভাল করে চিনি, ও এত সহজে কিছুই দেবে না সিদ্দিকীকে।’

তা ছাড়া সেফ-সাইটে কী ঘটেছে, সেটাও নিশ্চয়ই টিভি আর খবরের কাগজের বদৌলতে জেনে ফেলেছে ও। না জানলেও সন্দেহ করেছে।’

‘তাতে লাভ নেই,’ রানা বলল। ‘সিদ্ধিকী যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেটা জানা নেই ওর। লোকটা একজন চতুর ম্যানিপুলেটর, আমাকে পর্যন্ত গাধা বানিয়েছে। অন্তরার দোরগোড়ায় হাজির হয়ে নতুন একটা গল্প ফেঁদে বসবে সে... অবিশ্বাস করবার উপায় থাকবে না ওর...’

‘শুধু লোকটার অভিনয় দেখে নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র বানিয়ে দেবে অন্তরা? নাহ্, আমার তা মনে হয় না।’

‘কাগজপত্র সব বানানো আছে, সোহানা,’ রানা বলল। ‘বাকি ছিল শুধু নাম লেখা আর ছবি তুলে ডকুমেন্টগুলোয় বসিয়ে নেয়া। নতুন কী নাম, আর কী ধরনের চেহারা নেবে সিদ্ধিকী, সেটা ঠিক করা হয়নি বলে কাগজপত্র ফাইনাল হয়নি। লোকটা সব জানে, তাই সেদিন ও অ্যাসল্ট টিমটাকে খবর দিয়েছে। আমার আর মনসুরের টিমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, তা ছাড়া নতুন নাম-পরিচয়টা আমাদেরকে জানতে দিতে চায়নি, সেজন্যেই খতম করে দিতে চেয়েছে। অন্তরার কাছে এখন সবকিছু রেডিমেড আছে, ওকে বোকা বানিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারলেই সিদ্ধিকীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পঙ্গু একটা মেয়ে কিছুই করতে পারবে না লোকটার বিরুদ্ধে, ওকে খুন করে সবকিছু সহজেই হাতিয়ে নিতে পারবে।’

‘মাই গড!’ আঁতকে উঠল সোহানা। ‘লোকটা মানুষ, না পিশাচ?’

‘আরও খারাপ,’ রানা গম্ভীর গলায় বলল। ‘আন্দালিব সিদ্ধিকী একজন ম্যানিয়াক... ঠাণ্ডা মাথার অত্যন্ত প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াক!’

‘কিন্তু এভাবে খুনখারাপিতে মেতে ওঠার কারণটা কী? সে যদি সত্যিকার অর্থে বিপদে পড়ে থাকে, তা হলে সরাসরি আমাদের সাহায্য না নিয়ে এসব করছে কেন?’

‘গৃহ কোনও রহস্য যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আগে সিদ্ধিকীকে ঠেকাই। ওই যে, বাঁয়ের রাস্তাটায় যাও।’

মোড় ঘুরল সোহানার ফোর্ড টরাস। সামনেই আবাসিক এলাকা—রাস্তার দু’ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক ডুপ্লেক্স বাড়ি। ধীর গতিতে এগোল সোহানা।

একটু পরেই আঙুল তুলে দেখাল রানা, ‘ওই যে... ওটা!’

বাড়িটা দোতলা, পুরনো আমলের ভিক্টোরিয়ান ধাঁচে গড়া। নীচতলায় বিশাল বিশাল কয়েকটা থাম রয়েছে, ঢালু ছাতগুলোর কিনারা বেঁকে গেছে খান্দানি গোঁফের মত। এমনিতে বিল্ডিংটার রং সাদা, তবে দীর্ঘদিনের অযত্নে এখন ধূসর দেখাচ্ছে। সামনে বড় একটা লন আছে, ঘাসগুলো সুন্দরভাবে ছাঁটা। বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। পোর্চের নীচের সিঁড়ির পাশে একটা র‍্যাম্প দেখতে পেল সোহানা; পঙ্গু অন্তরা আশরাফ যেন হুইলচেয়ার নিয়ে সহজে ওঠানামা করতে পারে, সেজন্যে তৈরি করা হয়েছে ওটা।

‘দূরে পার্ক করো,’ রানা নির্দেশ দিল। ‘সিদ্ধিকী যদি বাড়ির ভিতরে থাকে, ও যেন আমাদের দেখতে না পায়।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির সীমানা থেকে একশো গজ দূরে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল সোহানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, ‘ওখানে আর কেউ থাকে?’

‘উঁহু,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘আগারকাভারে রেখেছি আমি অন্তরাকে... আত্মকেন্দ্রিক একজন শিল্পী হিসেবে। বাড়ির বেঙামেন্টে একটা স্টুডিও আছে, ওখানে বুসে ফর্জারির সব কাজ

করে ও... ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য ওকে একাই থাকতে হয়।’

‘কিন্তু পঙ্গু একটা মেয়ের জন্য এত বড় একটা বাড়ি মেইনটেন করা কঠিন কাজ না? তার ওপর দিয়েছ দোতলা বাড়ি... ওঠানামা করে কীভাবে?’

‘পুরনো একটা রিকণ্ডিশনড এলিভেটর আছে ভিতরে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আমাদের এজেন্সিরই এক বৃদ্ধা অপারেটর করে। হাউসমেইডের কাজটা কাতার, ওই ভদ্রমহিলা আসলে অন্তরার সঙ্গে আমাদের কন্ট্যাক্ট হিসেবে কাজ করে। সপ্তাহে দু’দিন আসে সে, ওই ফাঁকে অন্তরাকে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দেয়... পুরনো অ্যাসাইনমেন্টের ফলস্ ডকুমেন্টও সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।’

অন্তরাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনলেও রানা এজেন্সির সঙ্গে সোহানা সরাসরি জড়িত নয় বলে এসব খুঁটিনাটি জানে না। সব শুনে তাই মুগ্ধ হলো ও। বলল, ‘হুম, ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু ওর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কী?’

‘নরমাল অ্যান্টি-বার্গলারি সিস্টেম। হাইটেক কিছু বসাতে রাজি হয়নি অন্তরা, তাতে নাকি প্রতিবেশীরা সন্দিহান হয়ে উঠবে। এমনিতে সঙ্গে একটা পিস্তল রাখে ও, খুবই আত্মবিশ্বাসী। পা-দুটোই শুধু খারাপ, নইলে সম্পূর্ণ সুস্থ। ফোন না-ধরবার কোনও কারণ নেই ওর, দুশ্চিন্তা হচ্ছে সেজন্যেই।’

‘বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে।’

‘সম্ভব,’ স্বীকার করল রানা। ‘কিন্তু যদি না যায়?’

‘তোমার উদ্বেগটা বুঝতে পারছি,’ সোহানা বলল। ‘কিন্তু ওর বাড়িতে তুমি হাজির হলে কাতারটা নষ্ট হয়ে যাবে না? আসলে হয়তো কিছুই ঘটেনি ওখানে।’

‘শিয়োর হবার বিকল্প কোনও কায়দা জানা আছে তোমার?’

‘পুলিশে ফোন করো... প্রতিবেশী সেজে। বলো যে, বাড়িটা ভিতর থেকে সন্দেহজনক আওয়াজ পেয়েছ।’

‘সমস্যা তো একটাই, আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। আমেরিকান পুলিশ আজকাল হাইটেক কলার আই.ডি. ব্যবহার করে, ওতে আমাদের সেলফোনের নাম্বার উঠবে... নাম্বারটা ট্রেস করে আমাদেরকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে ওরা।’

‘পে-ফোন ব্যবহার করো যদি?’

‘একজন প্রতিবেশী পে-ফোন ব্যবহার করবে কেন? বাড়ি টেলিফোন ব্যবহার করাটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়? কলার আই.ডি.-তে পে-ফোনের নাম্বার দেখলে কলটাকে ভুয়া ভাবতে পারে ওরা।’

‘হুম, সমস্যাই দেখছি!’

‘শুধু ফোন নিয়েই সমস্যা নয়,’ রানা বলল। ‘সমস্যা পুলিশকে নিয়েও। ওরা বাড়ির ভিতর তল্লাশি চালালেই অন্তরার সমস্ত ফর্জারির ইকুইপমেন্ট দেখতে পাবে। আমাদের এজেন্সির পুরো রিলোকেশন প্রোগ্রাম বিপদে পড়ে যাবে তাতে।’

‘বাড়িতে তা হলে আমাদেরকেই যেতে হবে?’

‘আমাদেরকে নয়, আমাকে,’ রানা শুধরে দিল। ‘সিদ্দিকী যদি ওখানে থাকে, তা হলে পুরো ব্যাপারটা খুব বিশ্রী আকার ধারণ করতে পারে। তোমাকে ব্যাকআপ হিসেবে প্রয়োজন হবে আমার।’

‘কিন্তু তোমাকে আমি একা যেতে দিই কী করে?’ সোহানা প্রতিবাদ করল। ‘বিছানায় পড়ে থাকা উচিত তোমার, অবস্থা খুবই খারাপ। এই শরীর নিয়ে ওই ম্যানিয়াকটাকে মোকাবেলা করবে কীভাবে? পিছনে থাকতে হয় তুমি থাকো, আমি যাব আগে।’

‘না, সোহানা,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘যেতে হবে আমাকেই। সিদ্দিকী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওর সঙ্গে

বোঝাপড়া আমাকেই করতে হবে!’

‘কিন্তু...’

‘আর কোনও কিন্তু নয়,’ বাধা দিয়ে দৃঢ় গলায় বলল রানা।
‘আমি যাচ্ছি। তুমি সতর্ক থেকে। বিপদ দেখলেই আমি
সেলফোনে রিং দেব তোমাকে।’

সোহানাকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে
পড়ল রানা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে শুরু করল অন্তরার বাড়ির
দিকে।

কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে সোহানা ডাকল, ‘রানা!’

থামল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী?’

‘আমার ভয় করছে।’

‘আমারও,’ সরল গলায় বলল রানা, তাকাল দোতলা বাড়িটার
দিকে। ‘তবে সেটা অন্তরার জন্য।’

ঘুরে আবার চলতে শুরু করল ও।

সূর্য ইতোমধ্যে ডুরু ডুরু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দীর্ঘ, গাঢ়
ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। একদিক থেকে ব্যাপারটা ভাল,
অন্ধকারে চেহারা দেখা যাবে না। বাড়ির কাছে পৌঁছানোর আগেই
পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে মুশকিল, কারণ সরাসরি সামনের দরজা
দিয়েই ঢুকতে হবে রানাকে... সাধারণ একজন অতিথির মত।

অন্তরার বাড়িটা আশপাশের অন্যান্য বাড়িঘরের চেয়ে বড়,
গড়ে উঠেছে জমিটার পিছনদিককার পুরো সীমানা ছুঁয়ে। ফলে
পিছনদিকে কোনও রাস্তা বা গলি নেই। রাস্তা ফেলে ওখান দিয়ে
লুকিয়ে-চুরিয়ে এগোতে গেলে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে যাবে
রানা, সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। ওকে চোর ভেবে পুলিশে ফোনও
করা হতে পারে। কিন্তু এ-মুহূর্তে পুলিশকে সংক্রামক ব্যাধির মত
এড়িয়ে চলতে চাইছে ও। আর যা-ই ঘটুক, পুলিশ কিংবা
আইন-প্রয়োগকারী কোনও সংস্থাকে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে

জড়াতে দিতে চায় না কিছুতেই।

আঁধার নেমে এলেও অন্তরার বাড়ির কোনও জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে না—ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল রানাকে। লক্ষণটা খারাপ হতে পারে, আবার ভালও হওয়া বিচিত্র নয়—হয়তো বাড়িতে নেই মেয়েটা, কোথাও বেড়াতে গেছে। ওকে সিনেমাগাল বলে জানে রানা, হয়তো নতুন কোনও মুভি দেখতেই বেরিয়েছে। ফোন রিসিভ না-করার পিছনে সেটা একটা সুন্দর ব্যাখ্যা হতে পারে।

তারপরও খটকা লেগে রইল রানার মনে। বেরুবার সময় যদি অন্তরার জানা থাকত যে, ফিরতে রাত হবে, তা হলে দু-একটা বাতি জ্বেলে রেখে যেত না কি? নিরাপত্তার জন্য ওটুকু তো করা উচিত ছিল ওর।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল রানা। লনের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সাইডওয়াক ধরে এগোল পোর্চের দিকে, ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে রয়েছে স্নায়ু, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে জানালাগুলোর উপর—কোথাও বিপদের আভাস দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে পারে।

বারান্দার সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে নিজেকে নাস্তা মনে হলো রানার, আশপাশে কোনও আড়াল দেখতে পাচ্ছে না। একই সঙ্গে উদ্বেগ অনুভব করছে—অন্তরার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ও। পঙ্গু মেয়েটাকে ও-ই তো নিয়ে এসেছে এই বিপজ্জনক পেশায়। কোটের ভিতর বগলের কাছে ডান হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, মুঠোয় ধরা সিগ-সাওয়ারের বাট।

বারান্দায় উঠে এসেছে ও, সামনে বাড়ির সদর দরজা—মুখ বরাবর উচ্চতায় এক টুকরো স্বচ্ছ কাঁচ লাগানো আছে। সাবধানে ওখান দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। ছায়ায় ঢাকা করিডোর ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না—জনমনিষির সাড়া নেই। কী মনে হতে নব ধরে

মোচড় দিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে খুলে গেল পাল্লাটা। বিস্মিত হলো রানা—দরজাটা খোলা পাবে আশা করেনি, সেটা স্বাভাবিক নয়।

শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ও, সাবধানে আবার ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। আহত কাঁধের কারণে স্থির থাকছে না পিস্তল-ধরা হাতটা, দু'হাতেই তাই ধরতে হলো অস্ত্রটা, চোখ বোলাল চারপাশে। করিডোরের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি, দোতলায় চলে গেছে; ডানে-বাঁয়ে দুটো দরজা। ওর নিজের শ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই বাড়ির ভিতরে। একেবারে সুনসান নীরবতা, যেন শাশানে এসে পড়েছে।

ভিতরের স্বল্প আলোর সঙ্গে চোখ সহিয়ে নিতে একটু অপেক্ষা করল রানা, তারপর ধীর গতিতে এগোতে শুরু করল। সতর্কভাবে পা ফেলছে যাতে শব্দ না হয়, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে সেফটিক্যাচ অফ করা সিগ-সাওয়ারটা। একটা বন্ধ দরজা পেরুল ও—এলিভেটরের এন্ট্রান্স। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল করিডোরের শেষ প্রান্তে। ওপরতলায় যাবার আগে নীচটা দেখে নেবে বলে ঠিক করল, তাই সিঁড়ির পাশে বামদিকের দরজাটা খুলে উঁকি দিল ভিতরে।

কিচেন ওটা। পুরনো আমলের গ্যাসের চুলা লাগানো আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে একটা ফায়ারপ্লেস। কুকিং এরিয়ার একপাশে ডাইনিং স্পেস—সেখানে ছোট্ট একটা গোলাকার টেবিল ঘিরে চারজনের বসার ব্যবস্থা। আবছা আলোয় সিল্কে একগাদা এঁটো থালাবাসন দেখা গেল—কখন থেকে পড়ে আছে, কে জানে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে পাই করে ঘুরল রানা, ঝট করে তাক করল পিস্তলটা।

‘গুলি কোরো না!’ চাপা নারীকণ্ঠ ভেসে এল ছায়ার ভিতর

থেকে । ‘আমি ।’

সোহানা ।

‘চলে এসেছ কেন?’ বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা ।
‘তোমাকে গাড়িতে থাকতে বললাম না?’

‘সরি, তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে রেখে আমার পক্ষে এসে থাকা সম্ভব হলো না,’ এগিয়ে এসে বলল সোহানা । ‘তোমার শারীরিক অবস্থার খবর আমার চাইতে ভাল কেউ জানে না । জেদেই নশে এসেছ বটে, কিন্তু লড়াই বাধলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না । তাই ভেবে দেখলাম, যদি ব্যাকআপ সাপোর্ট প্রয়োজন হয়... সেটা বাড়ির ভিতরেই দিতে হবে তোমাকে ।’

‘কথার মারপ্যাচ তো ভালই রপ্ত করেছ দেখছি ।’

মুচকি হাসল সোহানা । ‘কথা শুনি নি বলে শাস্তি দিতে পারো, আমার আপত্তি নেই ।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা । ‘থাকো তা হলে, চোখ-কান খোলা রেখো ।’

‘রেখেছি,’ সোহানা বলল । ওর হাতেও একটা পিস্তল রয়েছে, রানাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকল কিচেনের ভিতরে । সিস্কের কাছে গিয়ে ঐটো থালাবাসন পরীক্ষা করে দেখল । বলল, ‘বেশি পুরনো নয় এগুলো । লেগে থাকা খাবার শুকোয়নি; মনে হচ্ছে, লাঞ্ছের পরে রাখা হয়েছে ।’

হাতঘড়ির ‘লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা । বলল, ‘কিন্তু এতক্ষণে ডিনারও করে ফেলার কথা অন্তরার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুবই নিয়ম মেনে চলে ও । ওখানে আরও থালা-বাসন থাকার কথা ।’

‘বাইরে খেতে যায়নি তো?’

‘গেলে এগুলো ঐটো ফেলে যাবে কেন? ধুয়ে ফেলত না?’

‘হুম,’ বলে দরজার কাছে ফিরে এল সোহানা । ‘ব্যাপারটা

সুবিধের মনে হচ্ছে না। পুরো বাড়ি সার্চ করে দেখা দরকার।
ভাগ হয়ে যেতে চাও?’

‘না, একসঙ্গে থাকাই ভাল হবে। এসো আমার সঙ্গে, আগে
বেষমেন্টে যাব। অন্তরার ওঅর্কশপ ওখানে, সিদ্দিকী যদি
আমাদের আগে এ-বাড়িতে পৌঁছে থাকে, তা হলে ওখানে ওর
চিহ্ন পাওয়া যাবে।’

‘চলো তা হলে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির ডানপাশের দরজার দিকে এগোল রানা,
সোহানা অনুসরণ করল ওকে। কবাটের পাশে গিয়ে থামল
দুজনে, একটু অপেক্ষা করল, তারপর নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল
রানা দরজাটা, চৌকাঠের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল।

সংকীর্ণ একটা স্টেয়ারওয়ে দেখতে পেল ও, ধাপে ধাপে
নীচের দিকে চলে গেছে। তলার দিকটায় জমাট বেঁধে আছে ঘন
অন্ধকার। সাড়াশব্দ নেই কোনও, কারও নড়াচড়ারও আভাস
পাওয়া গেল না।

রানার পকেটে একটা ছোট ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে, বের করল
ওটা; তুলে ধরল মাথার উপরে, তারপর জ্বালল। আত্মরক্ষার
টেকনিক এটা—অ্যামবুশকারীরা সাধারণত আলোর উৎসের দিকে
গুলি চালায়, ফ্ল্যাশলাইটটা মাথার উপর ধরে রাখায় গুলি ওদিকেই
যাবে, গায়ে লাগবে না; বরং মাজল ফ্ল্যাশ দেখে ও-ই হয়তো
উল্টো ঘায়েল করতে পারবে শত্রুকে।

তবে সতর্কতাটুকুর কোনও সুফল পাওয়া গেল না। আলো
জ্বালবার পর কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেলেও গুলি ছুটে এল না
নীচ থেকে। সোহানার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রানা,
তারপর নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। পায়ের নীচে কাঁচাকোঁচ
করে উঠল পুরনো কাঠের ধাপ, তবে শব্দ বলতে ওটুকুই। পুরো
বাড়ির মত বেষমেন্টেও কবরের নিস্তন্ধতা বিরাড় করেছে। তীক্ষ্ণ

চোখে তাকিয়ে রইল ও, ছায়ার আড়াল থেকে আচমকা কোনও বিপদ হলেই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

অশুভ কী যেন অনুভব করছে রানা—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানান দিচ্ছে, কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। অস্বস্তি বোধ করছে সেজন্যে। আড়চোখে একবার পিছনে তাকাল—সোহানা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছু পিছু আসছে। ওকে উপরে থাকতে বলবে কি না ভাবল, পরমুহূর্তেই আবার বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কাছাকাছি থাকলেই ভাল, বিপদ দেখা দিলে বাঁচাতে পারবে পরস্পরকে।

একটু পরেই বেয়মেণ্টের মেঝেতে পা রাখল ওরা। আলো ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখল রানা—এটা ভাঁড়ার ঘর। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো কয়েকটা র্যাকে রাখা হয়েছে নানা রকম খাবার-দাবার। একপ্রান্তে একটা বন্ধ দরজা—ওপাশে অন্তরার ওঅর্কশপ। ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার আর স্পেশাল প্রিন্টারসহ নানা রকম ফর্জারির ইকুইপমেন্ট রাখে ওখানে অন্তরা, কাজও করে।

হঠাৎ করে নাকে একটা পোড়া গন্ধ পেল রানা, মাথা ঘোরাতেই ওঅর্কশপের দরজার নীচে আলোর আভা দেখতে পেল। বুকেটা খামচে ধরল কী যেন, দৌড়ে দরজাটার দিকে ছুটে গেল ও। নবে হাত দিতেই তড়িতাহতের মত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হলো—ওটা প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে!

সময় নষ্ট করল না রানা, পিছিয়ে গিয়ে সজোরে লাথি হাঁকল পাশায়। কাঠ ভাঙার শব্দ হলো, নবের দাঁত ছিটকে গেল, ধড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত বাতাসের একটা ঝলকা ছুটে এল ভাঁড়ারের দিকে। নিজের অজান্তেই পিছু হটল রানা সোহানা। যখন সোজা হলো, তখন দুজনেরই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

পুরো ওঅর্কশপে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন—কম্পিউটার, ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র... সবকিছুর উপর উদ্বাহ নৃত্য জুড়েছে কমলা রঙের শিখা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধ হয়ে গেল রানা, অন্ধকার থেকে হঠাৎ তীব্র আলোর মুখোমুখি হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ক্ষমতা হারাল। তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও, চেষ্টায়ে উঠল, ‘অন্তরা! তুমি আছ ভিতরে?’

জবাব পাওয়া গেল না। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হতেই আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ করল সোহানা, রানার বাহু খামচে বলল, ‘রানা! দেখো!!’

তাকাল রানা, স্থবির হয়ে গেল। লেলিহান শিখার মাঝখানে হুইলচেয়ারে নিষ্পন্দভাবে বসে আছে একটি নারীমূর্তি—মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। ইতোমধ্যে পোশাক পুড়তে শুরু করেছে, উন্মুক্ত মুখের পাশটা কালো হয়ে গেছে আগুনের আঁচে। হালকা একটা মাংস-পোড়া গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

‘অন্তরা!!!’ প্রায় আত্ননাদের মত করে উঠল রানা, আগুনের দেয়াল ভেদ করে ঢুকে পড়ল ওঅর্কশপের ভিতর।

‘রানা, ফিরে এসো!’ চেষ্টায়ে উঠল সোহানা পিছন থেকে।

তবে ওর ডাক শুনতে পাচ্ছে না রানা, অন্তরার পাশে ছুটে গেল ও, গায়ের কোট খুলে চাপড় দিয়ে নেভাল জামা-কাপড়ের আগুন। তারপর হাত রাখল ঘাড়ে—পালস্ দেখার জন্য।

আঙুলের তলায় রক্তবাহী শিরার কোনও লাফানি অনুভব করল না ও—অর্থাৎ পরিষ্কার, মারা গেছে অন্তরা। বুকের মধ্যে শূন্যতা ভর করল রানার, তীব্র শোক আর বিষাদ ছেয়ে ফেলছে পুরো অস্তিত্বকে। ভাবছে, আরও আগে কেন টের পেল না ড. সিদ্ধিকীর মতলব... কেন আগেভাগেই অন্তরাকে সতর্ক করে দেয়নি?

সোহানা এসে ঢুকল ওঅর্কশপে, ওর কাঁধে হাত রেখে বলল,

‘চলে এসো, রানা। ওর জন্যে আর কিছু করবার নেই আমাদের।’

ঘোর লাগা দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা। বলল, ‘আ... আমার জন্যে ও মারা গেল, সোহানা। আমার জন্যে!’

‘না!’ দৃঢ়কণ্ঠে বলল সোহানা। ‘শুধু শুধু নিজেকে দোষারোপ কোরো না, রানা। ড. সিদ্দিকী ওকে মেরেছে। তুমি নও।’

কথাটা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল যেন রানা। ঠিক বশেছে সোহানা। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, বুকের ভিতর থেকে হতাশ সরে গিয়ে সেখানে তীব্র প্রতিহিংসা ভর করেছে। ড. সিদ্দিকীকে জবাবদিহি করতে হবে ওর কাছে, কেন নিরীহ একটা পশু মেয়েকে খুন করেছে এভাবে। নিজের জীবন দিয়ে হলেও শয়তানটাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবে ও এর জন্য।

‘আমাদেরকে বেরুতে হবে, রানা,’ চারদিকে তাকিয়ে ভয়াত কণ্ঠে বলল সোহানা। ‘নইলে পুড়ে মরব।’

ঝুঁকে অন্তরার লাশটা কাঁধে তুলে নিল রানা। বলল, ‘এগোও, আমি পিছনে আছি।’

আগুনের দেয়াল ভেদ করে ভাঁড়ার ঘরে ফিরে এল ওরা। পিছনে তাকিয়ে দেখল, ইতোমধ্যে কাঠের মেঝে ধরে রিস্ত্রি পেতে শুরু করেছে লেলিহান শিখা। ব্যাপারটা লক্ষ করে রানা বলল, ‘ওঅর্কশপের দরজাটা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ সম্ভব আগুনটাকে চার দেয়ালের ভিতর আটকে রাখতে হবে। পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে গেলে সর্বনাশ!’

‘কবাট ভেঙে ফেলেছ তুমি,’ মনে করিয়ে দিল সোহানা।

‘তা হলে ভেজিয়ে দাও। তাতেও কিছুটা কাজ হবে।’

দরজাটা টেনে দিল সোহানা, রানার কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল, তারপর আলো জ্বলে এগোতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে। অন্তরার লাশ কাঁধে পিছনে থাকল রানা।

স্টেয়ারকেসে পৌঁছুতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সোহানা,

উপরে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। চোখ তুলে তাকাতেই ছায়ার মধ্যে একটা স্থলদেহী ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। ফ্যাশলাইটের আলো ফেলবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু লোকটা ক্ষিপ্ৰগতিতে সরে গেল আলোকরশ্মির সামনে থেকে। পরমুহূর্তেই চৌকাঠের আড়াল থেকে কী যেন উড়ে এল ওদের লক্ষ্য করে।

‘রানা! সাবধান!!’ চৈঁচিয়ে উঠল সোহানা। পাই করে উল্টো ঘুরল ও, ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরিয়ে দিল স্টেয়ারকেসের সামনে থেকে।

কাঁধে অন্তরা থাকায় তাল সামলাতে পারল না রানা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। বেকায়দা আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। ওই অবস্থায় ঠং করে একটা শব্দ শুনল ও, সিঁড়ির মাথা থেকে ছুঁড়ে দেয়া জিনিসটা এসে আছড়ে পড়েছে সোহানার পায়ের কাছে। চোখ ফেরাতেই একটা ছোট্ট ধাতব সিলিঙার দেখতে পেল ও—অ্যারোসলের ক্যান কেটে বানানো হয়েছে। মেক-শিফট একটা ফিউয রয়েছে সিলিঙারের উপরে, জ্বলছে ওটা... দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে দ্রুত।

‘সোহানা! সরে যাও! সরে যাও ওটার কাছ থেকে!’ চৈঁচিয়ে উঠল রানা।

নির্দেশটা অনুধাবন করতে পারল না সোহানা; সম্মোহিতের মত ও তাকিয়ে রয়েছে সিলিঙারটার দিকে। ঠিক পরমুহূর্তেই ওটা বিস্ফোরিত হলো।

দুই

বুক কেঁপে উঠল রানার, সোহানাকে ছিন্ন-ভিন্ন হতে দেখবে ভেবে আতঙ্কে চোখদুটো বড় হয়ে গেল। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না সোহানার ভাগ্যে। সিলিগুরটা জোর আওয়াজ তুলে ফেটে গেল ঠিকই, তবে আগুনের গোলা বা শকওয়েভের পরিবর্তে হিস হিস করে প্রায় বর্ণহীন একটা গ্যাস বেরিয়ে এল ওর ভিতর থেকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে সোহানা, বাঁঝালো একটা গন্ধ নাকে আঘাত করতেই সংবিৎ ফিরে পেল। বুঝতে পারল, ওটা শৌকা ঠিক হবে না। দম বন্ধ করে ফেলল ও, রানাও একই কাজ করেছে আগেই। ফেটে যাওয়া সিলিগুরটার কাছ থেকে সরে গেল তাড়াতাড়ি।

ফড় ফড় করে শব্দ হলো, রানা শার্টের তলার অংশটা ছিঁড়ে ফেলেছে। দুই টুকরো করে একটা দিয়ে নাক-মুখ বাঁধল, অন্যটা ঝাড়িয়ে দিল সোহানার দিকে। রানার মত নিজেও নাক-মুখ ঢাকল ও, যাতে গ্যাসটা সহজে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকতে না পারে। তারপর লাথি দিয়ে ভাঁড়ারের এক কোণে সরিয়ে দিল সিলিগুরটা।

‘কী মনে হয়?’ রানা জিজ্ঞেস করল। ‘নক-আউট গ্যাস?’

‘জানি না,’ সোহানা বলল। ‘তবে নক-আউট হলে এতক্ষণে নেওড়া হয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।’

‘নেওড়া ওটা?’ রানা শঙ্কিত।

‘ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছি। একটু নিশ্চয়ই গেছে ফুসফুসে, তবে কোনও রিঅ্যাকশন বুঝতে পারছি না। সব স্বাভাবিকই লাগছে।’

‘আশ্চর্য তো!’ রানা অবাক হলো। অল্প একটু টানলেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া তো হবার কথা। ভুরু কুঁচকে ও জানতে চাইল, ‘কে ছুঁড়েছে ওটা, দেখতে পেয়েছ?’

‘মোটাসোটা একজন... চেহারা দেখা যায়নি, তবে ড. সিদ্দিকী হবারই সম্ভাবনা বেশি।’

পিছন দিকে তাকাল রানা। ওঅর্কশপ থেকে ভেসে আসা কালো ধোঁয়ায় ভাঁড়ার ঘরটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস টানলেই ফুসফুসে জ্বালাপোড়া অনুভব করছে ওরা। গ্যাসের রহস্যটা পরে ভেদ করলেও চলবে, তার আগে জরুরি হলো জীবন বাঁচানো। ও বলল, ‘আমাদেরকে বেরুতে হবে এখান থেকে...’

‘উপরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে সিদ্দিকী,’ সোহানা বলল।

‘এসো দেখি, খোলা যায় কি না।’

সিঁড়ি ধরে এগোলো ওরা, একদম উপরের ধাপে পৌঁছে দরজার নব ধরে মোচড় দিল। ঘুরল ওটা, তবে দরজা খুলল না। বন্ধ দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে শুরু করল রানা। কিন্তু অনড় রইল শক্ত দরজা, কিছুই হলো না। বুঝতে পারল, ওপাশ থেকে ছিটকিনি আটকে দেয়া হয়েছে।

‘গুলি করো,’ সোহানা বলল পিছন থেকে। ‘ছিটকিনি উড়িয়ে দাও।’

‘লাভ নেই,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘পাল্লাটা আড়াই ইঞ্চি পুরু। গুলি করলেও যাতে না ভাঙে, ওভাবেই তৈরি করিয়েছিলাম আমি। ওঅর্কশপের সিকিউরিটির জন্যে।’

‘তা হলে?’

ঠোট কামড়ে একটু ভাবল রানা, বেয়মেণ্টের খুঁটিনাটি মনে

করছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওঅর্কশপের ভিতর অ্যাকসেস আছে এলিভেটরটার—ওটা দিয়ে ওঠানামা করত অন্তরা, হুইলচেয়ারের কারণে সিঁড়ি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। কথাটা সোহানাকে বলল ও।

‘সমস্যা একটাই,’ তিক্ত গলায় বলল সোহানা। ‘জায়গাটা এখন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। তা ছাড়া এলিভেটরের কথাটা সিদ্ধিকীর্ণ মত মিস্গাইডেড জিনিয়াস ভাববে না, তা কি হয়? নিশ্চয়ই অচল করে রেখেছে।’

‘তাতে অসুবিধে নেই,’ রানা বলল। ‘এলিভেটর না চললেও শাফট ধরে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।’

‘কিন্তু আগুনের ব্যাপারে কী করবে?’

‘ভাঁড়ারের একপাশে একটা বাথরুম আছে, ওখান থেকে শরীর ভিজিয়ে নেব। এসো।’

বাথরুমে ঢুকে আলগা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল ওরা, বালতির পানিতে ভেজালো ভাল করে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে শরীরও ভেজালো। যখন সম্ভ্রষ্ট হলো, তখনই আবার ভেজা কাপড় চড়াল শরীরে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা-সোহানা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল, তারপর দরজা খুলে একছুটে ঢুকে পড়ল ওঅর্কশপের ভিতরে। এখন পুরো কক্ষটাই আগুনের দখলে, চোখ খুলে রাখা দায়—চারপাশে শুধু কমলা রঙের নাচন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শরীর শুকিয়ে যেতে শুরু করল।

সময় নষ্ট করল না রানা, এলিভেটর ডোরটা কোন্‌দিকে, তা জানা আছে ওর। চোখ খুলল না, আন্দাজের উপর ছুটল ওদিকে, এক হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সোহানাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এলিভেটর ডোরের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, তবে দরজাটা বন্ধ। উপরে যাবার বাটন চেপে লাভ

হলো না, মেকানিজমটা কাজ করছে না—তীব্র উত্তাপে, কিংবা ড. সিদ্দিকীর কারিগরি ফলানোর কারণে। ও নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, কোমর থেকে খুলে ফেলল চামড়ার বেল্টটা, বাকলের সরু কিনারটা ঢুকিয়ে দিল দুই পাল্লার মাঝখানের খাঁজে, চাড় দিতে শুরু করল।

একটু পরেই সামান্য ফাঁক হলো দরজা, দু'হাত ভেজা কাপড়ে মুড়ে তাতে ঢুকিয়ে দিল সোহানা, টান দিয়ে সরিয়ে ফেলল পাল্লাদুটো। ভিতরে তাকিয়ে এলিভেটর কারটাকে নীচেই দেখতে পেল রানা, সিদ্দিকী সম্ভবত সিঁড়ি ধরে উপরে ফিরেছে। তাড়াতাড়ি সোহানাকে নিয়ে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল ও, দরজা আবার টেনে দিল।

ভিতরটা উত্তপ্ত তন্দুরের মত গনগনে হয়ে আছে, খুবই অস্বস্তিকর। এর মধ্যেই ক্ষণিকের জন্য অন্তরার কথা মনে পড়ল রানার—লাশটা ভাঁড়ার ঘরে রয়ে গেছে, নিয়ে আসা যায়নি... আনার উপায়ও ছিল না। অপরাধবোধ মাথা চাড়া দিতে চাইলে চোয়াল শক্ত করে চাপা দিল ওটাকে। আগে বাঁচতে হবে, তারপর শায়েস্তা করবে ড. সিদ্দিকীকে। সোহানা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেছে, উপরে তাকিয়ে সেই আলোয় একটা মেইন্টেন্যান্স হ্যাচ দেখতে পেল রানা। ছাতটা বেশি উঁচু নয়, হাত তুলতেই নাগাল পাওয়া গেল ওটার। ধাক্কা দিয়ে হ্যাচটার মুখ সরিয়ে ফেলল ও, অন্ধকার একটা ফোকর উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এলিভেটরের ভিতরে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে। সেদিকে এক পলক তাকাল রানা, তারপর এক লাফে আঁকড়ে ধরল ফোকরের কিনারা, উঠতে শুরু করল উপরে। সোহানা নীচ থেকে ঠেলে ওকে সাহায্য করল। শরীরের পুরো ভর পড়ছে হাত আর কাঁধের পেশির উপর। চড়চড় করে ব্যাণ্ডেজটার একপাশ আলগা হয়ে যেতে শুরু করল, একই সঙ্গে হামলা করল তীক্ষ্ণ

ব্যথা—ক্ষতটার মুখ খুলে গেছে আরার। রক্ত গড়াতে শুরু করল রানার কাঁধ আর বুক বেয়ে।

যন্ত্রণাটা মুখ বুজে সহ্য করল ও, উঠে পড়ল এলিভেটর কারের ছাদে। তারপর উবু হয়ে হাত ঝাড়িয়ে দিল ফোকরের ভিতরে, সোহানাকে টেনে তুলল।

ওর রক্তে-ভেজা শার্ট আর কোটের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সোহানা। বলল, 'ইয়াল্লা! তোমার কাঁধের ক্ষতটা...'

'জানি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ওটা নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ে। আগে চলো বেরোই এখান থেকে।' শাফটের দেয়ালে বসানো লোহার ল্যাডার দেখাল ও। 'উঠতে শুরু করো।'

'না, আগে তুমি,' মাথা নেড়ে বলল সোহানা। 'তোমার হাতের অবস্থা খারাপ, পড়ে যেতে পারো। নীচে থাকলে আমি কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারব।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল রানা। সোহানার মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছুতেই ওকে টলানো যাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করবারও সময় নেই। তাই কাঁধ ঝাঁকাল ও, ঘুরে ল্যাডারের ধাপ আঁকড়ে ধরল, উঠতে শুরু করল উপরদিকে।

বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোরের অ্যাকসেস ডোরে পৌঁছুতে সময় লাগল না, তবে ওখান দিয়ে বেরুবার ইচ্ছে নেই রানার। ড. সিদ্দিকীর মত প্রতিভাবান দুষ্টবুদ্ধির লোক ঠিকই অনুমান করবে, স্টেয়ারকেসের দরজা বন্ধ থাকায় ওরা এলিভেটর শাফট দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিছু করতে হবে না তাকে, শুধু দরজাটার দিকে অস্ত্র তাক করে বসে থাকবে, ওরা বেরুতে গেলেই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। কাজটা কঠিন নয়, যদি মারুফের এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেলটা এখনও থাকে তার কাছে। থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

জেনেশুনে ফাঁদের ভিতর পা দেয়ার কোনও মানে হয় না।

নীচের দিকে তাকিয়ে সোহানাকে ইশারা করল রানা, যাতে শব্দ না করে। তারপর একতলার লেভেল পেরিয়ে উঠে চলল উপরে। সিদ্ধিকী নিশ্চয়ই ভাববে না, ওরা দোতলা দিয়ে বেরুতে পারে।

আহত কাঁধটা টনটন করছে ব্যথায়, অবিরাম ধারায় রক্ত বেরুচ্ছে। কষ্টটা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু শরীর হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসল। ঘেমে হাতের তালু তেলতেলে হয়ে গিয়েছিল আগেই, একতলা অতিক্রম করে কিছুদূর উঠতেই হাত ফসকে গেল ওর। মুঠিতে শক্তি পেল না, পড়ে যেতে শুরু করল। নীচেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পড়তে থাকা দেহটাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ফেলল সোহানা, ব্যালাস নষ্ট হয়ে গেল ওরও। ধাম করে দুজনে প্রায় একসঙ্গে বাড়ি খেল ল্যাডারের শক্ত ধাপে। ক্ষতের উপর চাপ পড়েছে রানার, সবকিছু ভুলে চোঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। একতলার এলিভেটর ডোর-ভেদ করে বৃষ্টির মত ছুটে এল তপ্ত বুলেট, বিঁধতে শুরু করল শাফটের দেয়ালে। অস্ত্রের জন্য রক্ষা পেল রানা-সোহানা, বুলেটের ধারা থেকে মাত্র তিন ইঞ্চি উপরে ঝুলছে ওদের পা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুজনে, তারপরই একটা আর্তনাদ ছেড়ে চাপা গলায় রানা বলল, 'উপরে... কুইক!'

গোলাগুলির তাণ্ডবকে পিছনে ফেলে আবার ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। আকস্মিক বিপদ রানার শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে—শারীরিক দুর্বলতা, ব্যথা-বেদনা সব ভুলিয়ে দিয়ে বাড়তি শক্তি যোগাচ্ছে। তর তর করে উপরদিকে উঠছে এখন ও।

দোতলায় থামল না রানা। সিদ্ধিকীর পরবর্তী স্টেপেজ এই ফ্লোরটাই হবে, তাই ওই দরজাটা পেরিয়ে আরও এগিয়ে চলল ও; বাড়িটা দোতলা হলেও টপ ফ্লোরের উপরে একটা অ্যাটিক আছে,

এলিভেটরটা চলে গেছে ওই পর্যন্ত। ওরাও ওখান দিয়েই বেরুবে। দোতলা বাদ দিয়ে অ্যাটিকে হানা দেবে না খুনে বিজ্ঞানী, কাজেই শাফট থেকে বেরুবার জন্য একটু হলেও সময় পাবে ওরা।

ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে একটু পরেই আবার দোতলার এলিভেটর ডোর ঝাঁঝা হয়ে ঘোঁতে শুরু করল। তবে ততক্ষণে নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছে গেছে রানা-সোহানা। পাশেই অ্যাটিকের একজিট দেখতে পেয়ে বেণ্টের বাকলটা আবার ব্যবহার করল রানা, চাড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অন্ধকার অ্যাটিকে পা রাখল দুই বিসিআই এজেন্ট। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিল রানা, এখান থেকে বেরুবার পথটা খুঁজে বের করতে হবে। নইলে বন্ধ কামরাটা ওদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠতে পারে।

অ্যাটিকের একপ্রান্তের মেঝেতে লাগানো ট্র্যাপডোরটা নজরে পড়ল কিছুক্ষণের ভিতর। সেটার উপর আলো ফেলতেই সোহানা বলল, ‘ওখান দিয়ে বেরুনো যাবে না। নীচে সিদ্ধিকী অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।’

‘জানি,’ রানা বলল। ‘তবে ভাব দেখাতে হবে যেন আমরা এ-পথেই যাবার চেষ্টা করছি।’

‘আসলে যাব কোন্ পথে?’

আলো মুরিয়ে অ্যাটিকের ছোট স্কাইলাইটটা দেখাল রানা। ‘ওখান দিয়ে যাবে তুমি। বাড়ির চাল বেয়ে নীচে চলে যাবে। আমি এদিকে সিদ্ধিকীকে ব্যস্ত রাখব। তুমি নীচ দিয়ে ফিরে এসো। দ্বিমুখী হামলা চালাব। ফাঁদে আমরা নই, লোকটা নিজেই পড়বে তা হলে।’

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, এগিয়ে গেল স্কাইলাইটের দিকে। ছাতটা নিচু, সহজেই শার্সি সরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল ও।

সোহানার বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর গেল ট্র্যাপডোরের দিকে। সাবধানে হাতলটা ধরল ও, তারপর টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা। ওপাশে একটা ছোট সিঁড়ি, নীচে গিয়ে মিশেছে দ্বিতীয় তলায়।

নামবে কি না ভাবছিল রানা, ঠিক তক্ষুণি অন্ধকারে আলোর ঝলকানি দেখতে পেল। সিঁড়ির নীচ থেকে ভেসে এল গুলিবর্ষণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে পিছিয়ে গেল ও, ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে, একই সঙ্গে সুস্থ হাতটা দিয়ে কোমর থেকে বের করে এনেছে সিগ-সাওয়ার। ড. সিদ্দিকীর গুলিবর্ষণে বিরতি পড়ার অপেক্ষায় রইল... আর সেটা পেতেই ট্র্যাপডোরের ফোকর দিয়ে হাত বের করল; ধাঁই ধাঁই করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল শত্রুর উদ্দেশে।

ম্যাগাজিন খালি হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল রানা, খালি চেম্বারে হ্যামারটা খটাস করে পড়তেই ঝট করে সরে গেল ট্র্যাপডোরের কাছ থেকে। কয়েক সেকেন্ড যেতেই নীচ থেকে আবার গুলি ছোঁড়া হলো। অ্যাটিকের কাঠের মেঝে ভেদ করে, ট্র্যাপডোরের ফোকর গলে ছুটে এল এম-১৬-এর একরাশ বুলেট। কাঠের চলটা উড়তে শুরু করল, বাতাস ভারি হয়ে উঠল পোড়া বারুদের গন্ধে। ট্র্যাপডোরের কাছ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো রানা, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে গুলি খাবে।

পিছিয়ে এলেও মনে মনে হিসেব রাখছে ও—এম-১৬-এর ম্যাগাজিনে মোট বিশ রাউন্ড বুলেট থাকে, শেষ হতে সময় লাগবে না। সেক্ষেত্রে রিলোড করতে হবে সিদ্দিকীকে—আনাড়ি একজন অস্ত্রধারীর পক্ষে কাজটা খুব দ্রুত করা সম্ভব নয়। ওই সুযোগে আরেক দফা হামলা চালাবে বলে ঠিক করেছে। হিসেব কষতে কষতে দ্রুত নিজের সিগ-সাওয়ারে গুলি ভরল ও।

একটু পরেই থেমে গেল সিদ্দিকীর এম-১৬। ঠিক বিশটা গুলি করেছে সে। সম্ভ্রষ্ট হয়ে আবার ট্র্যাপডোরের দিকে এগোল রানা, সিগ-সাওয়ার থেকে থেমে থেমে গুলি করেছে। চকিতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল—সোহানার এতক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলবার কথা। তাই শেষ বুলেটটা চেম্বারে রেখে ছুটল ও—দুন্দাড় করে নামতে শুরু করল অ্যাটিকের সিঁড়ি ধরে। ল্যাণ্ডিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছে ডাইভ দিল, ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল দোতলার করিডোরে।

হাঁটু গেড়ে ফ্যারিং পজিশন নিল রানা, ঝড়ের বেগে ঘোরাল হাতের পিস্তলটা... যেখান থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল, সেদিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল—কোথায় ড. সিদ্দিকী! শূন্য করিডোর খাঁ খাঁ করছে চোখের সামনে।

পায়ের নীচে উত্তাপ অনুভব করল ও, ফ্লোর গরম হয়ে উঠেছে—সিদ্দিকী সম্ভবত নীচতলাতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইতোমধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সিঁড়ির খোলা জায়গাটা দিয়ে রাশ রাশ কালো ধোঁয়া উঠে আসতেই সন্দেহের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দোতলা। চোখ জ্বালাপোড়া করতে শুরু করল, পোড়া বাতাস ফুসফুসকেও ভোগাতে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা—ড. সিদ্দিকী গেল কোথায়? পালিয়ে গেছে? নাকি আশপাশের কোনও রুমে ঢুকে ঘাপটি মেরে রয়েছে ওর জন্যে? কাছাকাছি গেলেই গুলি ছুঁড়বে?

সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। ভাল হাতে পিস্তলটা শক্ত করে ধরল রানা, পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে—কোনও দরজায় সামান্যতম নড়াচড়ার আভাস পেলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। তবে একটু

পরেই বোঝা গেল, এত সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না; এম-১৬-এর গুলি ফুরিয়ে যেতেই পালিয়ে গেছে সে, রানাকে ঘায়েল করবার জন্য অপেক্ষা করেনি।

সিঁড়ি পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছে গেল ও। ততক্ষণে পুরো দোতলা ছেয়ে গেছে ধোঁয়ায়। খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করেছে রানা, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে—হাইপারভেন্টিলেশনের প্রভাবে। তারপরও স্বস্তি পাচ্ছে না একটুও—শ্বাসনালী আর গলা এমনভাবে জ্বলছে যেন মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখদুটো হয়ে গেছে টকটকে লাল, অনবরত পানি ঝরছে। কাঁধের ব্যথাটাও ভোগাচ্ছে খুব, শরীরের ওই পাশটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ঢেউয়ের মত কিছুক্ষণ পর পরই ব্যথার স্রোত ছুটে আসছে স্নায়ু বেয়ে।

কষ্টে-সৃষ্টে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা। রেলিং আঁকড়ে অন্ধের মত যাচ্ছে, ধোঁয়ার একটা কালো পর্দা ঢেকে রেখেছে ওকে। দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায়, চোখের জ্বালাপোড়ার কারণে পাতাদুটো খোলাও রাখতে পারছে না। হাতড়ে হাতড়ে অর্ধেক পথ গেল ও, দুই ফ্লোরের মাঝামাঝি ল্যাণ্ডিংটা অতিক্রম করতেই দুর্বল বোধ করতে শুরু করল—শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। হাতদুটো নড়তে চাইছে না, হাঁটুতেও জোর পাচ্ছে না... অস্বিজেনের অভাবে নিজেকে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত মনে হচ্ছে। কয়েক ধাপ নামতেই দুলাতে শুরু করল সারা দুনিয়া।

হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল ও, নিজের উপর আর নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনোমতে রেলিংয়ে হাত ঠেকিয়ে শরীরটাকে সিঁধে রাখল বটে, তবে নীচতলার ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছুতেই উধাও হয়ে গেল অবলম্বনটা। টলে উঠল রানা, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে শুরু করল।

ঠিক তক্ষুণি পিছন থেকে এক জোড়া হাত ধরে ফেলল ওকে... পতন ঠেকাল, তারপর টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল

বাড়ির পিছনদিকে। চোখ মেলে সোহানার অপরূপ মুখশ্রী দেখতে পেল রানা—আগুনের আভায় অন্যভুবনের অঙ্গরার মত লাগছে ওকে। হাঁপাচ্ছে ও, এখানে-সেখানে মুখ ব্যাদান করে থাকা আগুনের শিখা এড়িয়ে রানার ভারী শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে বেচারির।

‘ছাড়ো আমাকে,’ মৃদু স্বরে বলল রানা। ‘হাঁটতে পারব।’

‘বোকার মত কথা বোলো না!’ চোখ রাঙাল সোহানা। ‘নিজের অবস্থা দেখেছ? এখন বাহাদুরি দেখাবার সময় নয়।’

‘সত্যিই পারব,’ রানা বলল। ‘তোমার গায়ে একটু ভর দিতে হবে আর কী। ছাড়ো আমাকে, এভাবে টেনে বেশিদূর নিতে পারবে না।’

যুক্তিটা বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, রানাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। একটা হাত কাঁধের উপর ফেলে ওকে ভর দেয়ালো, তারপর ছোট ছোট কদমে দুজনে এগোতে থাকল বাড়ির পিছনদিকে।

‘সিদ্ধিকী কোথায়, দেখেছ?’ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না,’ সোহানা মাথা নাড়ল। ‘চোখে পড়েনি। উপরে ছিল না?’

‘উঁহু, ভেগেছে,’ রানা বলল। ‘আমাদের প্ল্যানটা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল। পিঠটান দিয়েছে তাই।’

‘আমি সার্মনে দিয়ে এসেছি... কই, ওকে তো বেরুতে দেখলাম না।’

‘পিছন দিয়েই হয়তো পালিয়েছে।’

‘ওখান দিয়ে যাবার পথ আছে?’ জানতে চাইল সোহানা।

‘হ্যাঁ, আঙিনার সীমানায় একটা ছোট গেট...’

সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ করে, দমকল-বাহিনী আসছে। বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে প্রতিবেশীদের কেউ

সম্ভবত খবর দিয়েছে ওদের। ঝট করে পিছনে তাকাল সোহানা, যেন দেখতে পাবে গাড়িগুলোকে। তবে সেটা স্রেফ রিফ্লেক্স। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে ও বলল, ‘আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, রানা। পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেডের সামনে পড়া চলবে না।’

‘জানি,’ সংক্ষেপে বলল রানা। ‘এগোতে থাকো।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে পিছনের আঙিনায় পৌঁছে গেল ওরা। বাড়ির ভিতর থেকে আগুনের আভায় পুরো জায়গাটাই আলোকিত হয়ে আছে। ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস পেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করল রানা, ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসছে। আঙুল তুলে বেড়ার গায়ে ছোট্ট গেটটা সোহানাকে দেখাল ও, দুজনে দ্রুত এগোতে থাকল ওদিকে।

বাড়ির সামনে থেকে দমকলকর্মীদের হৈচৈ ভেসে এল, সেইসঙ্গে ফায়ার-ট্রাকের ইঞ্জিনের ভারি গর্জন। ল্যাডার আর হোস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা।

পিছনের আঙিনাটা বেশ বড়, আগুনের আভা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে না। তা ছাড়া সীমানার কাছটায় দুটো বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ আছে, তলাটা ওগুলোর ছায়ায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। ওখানে পৌঁছে স্বস্তি বোধ করল রানা—আঁধারের কাভার পেয়ে গেছে, এখন আর ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন ওদেরকে দেখতে পাবে না।

বেড়ার পাশে গুল্লোর নিচু ঝোপ, মাঝখানটায় একটুখানি ফাঁকা... সেখানে দেখা গেল সাদা রঙের ছোট গেটটাকে। রানা বলল, ‘অন্তরা লাগিয়েছিল এটা। পাশের বাড়ির ছেলেরা ওর লনের ঘাস কেটে দিয়ে যায়, পিছনে গেট থাকলে লনমোয়ার মেশিন আনতে সুবিধে হয় ওদের।’

‘তালা মারা নেই তো?’ সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

‘থাকলে কিছু করার নেই। টপকে ওপারে যেতে হবে।’

রানার কথাটা শেষ হতে না হতে ঝট করে খুলে গেল গেটের পাল্লা। মাঝবয়েসী এক পুরুষ, এক মহিলা আর অল্পবয়েসী একটা ছেলে হস্তদন্ত ভঙ্গিতে ঢুকল আঙিনায়। প্রতিবেশী এরা, পিছনের বাড়িটাতে থাকে—বুঝতে পারল রানা।

‘কী হয়েছে?’ দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা। ‘আপনারা কারা?’

‘অন্তরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,’ রানা বলল। ‘কীভাবে যে আগুন লাগল, বুঝতেই পারিনি। কোনোমতে বেরিয়ে এসেছি...’

‘মিস আশরাফ কোথায়?’

‘বেয়মেন্টে... ওর কাছে পৌঁছুতেই পারিনি...’

‘গুলির শব্দ শুনলাম মনে হলো?’

‘পেইন্ট-ক্যান ফাটার শব্দ,’ তাড়াতাড়ি বলল সোহানা। ‘আপনারা যান, ফায়ার-ফাইটারদের বলুন যেন আগে বেয়মেন্ট থেকে অন্তরাকে বের করে আনে। আমরা আসলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না...’

কী বুঝল কে জানে, লোকটা আর কথা বাড়াল না, ছেলেকে নিয়ে ছুট লাগাল অন্তরার বাড়ির দিকে। কিন্তু মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে বিহ্বল হয়ে... ইতস্তত করছে।

‘দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’ সোহানা বলল। ‘যান, নিজের বাড়িটা অন্তত বাঁচান।’

‘মানে!’ চমকে উঠল মহিলা।

‘আগুনটা এদিকে চলে আসতে পারে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বাড়ির দেয়াল আর ছাদ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা। যান, দেরি করবেন না।’

পড়িমরি করে ছুটে চলে গেল মহিলা।

‘আমাদেরকে দেখে ফেলল ওরা,’ অনুযোগের সুরে বলল সোহানা। ‘পুলিশকে বলে দেবে...’

‘তাতে অসুবিধে নেই,’ রানা নির্বিকার। ‘শুধু চেহারার বর্ণনা দেবে, পরিচয় তো আর জানে না। তা ছাড়া, ব্যাপারটা এড়াবারও উপায় ছিল না।’

চারদিক থেকে হৈ-হল্লা বাড়ছে—আরও লোকজন জড়ো হচ্ছে জ্বলন্ত বাড়িটার আশপাশে। সেটা লক্ষ করে রানা বলল, ‘চলো, আর দেরি করা উচিত হবে না। একটা ফ্যামিলিই যথেষ্ট, আর কারও চোখে পড়তে চাই না।’

সোহানার সাহায্য নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে শুরু করল ও। পিছনের বাড়িটার আঙিনা হয়ে সরু একটা গলিতে পৌঁছুল, সেটা ধরে পুরো দু’রক দূরে চলে গেল। তারপর ঘুরে উঠে এল মেইন রোডে, ধীরে ধীরে এগোতে থাকল নিজেদের পার্ক করা গাড়িটার দিকে।

একটু পরেই শক্তি ফুরিয়ে এল রানার—রক্তক্ষরণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, হাঁটতে পারছে না আর। এমনিতে লোকজন সবাই অগ্নিকাণ্ড দেখায় ব্যস্ত, ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না; তবে হঠাৎ রক্তাক্ত একজন মানুষকে দেখে যে সন্দিহান হয়ে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। অবস্থাটা বুঝতে পেরে রাস্তার পাশের একটা গাছের আড়ালে রানাকে অপেক্ষা করতে বলল সোহানা, একা চলে গেল গাড়ি আনতে।

বেশি সময় নিল না ও, মিনিট পাঁচেক পরেই ফোর্ড টরাসের কালচে অবয়বটা উদয় হলো রানার দৃষ্টিসীমায়। ঠিক গাছের পাশে এসে থামল গাড়িটা, প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে গেল নিঃশব্দে। চারপাশটা দেখে নিল রানা, তারপর দ্রুত উঠে পড়ল টরাসে। দরজা বন্ধ করতেই অ্যাক্সসেলারেটর চাপল সোহানা, গতি বাড়িয়ে ছোটাতে শুরু করল গাড়ি। অন্তরার বাড়িটাকে

পিছনে ফেলে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

‘গাড়ি আনতে কোনও অসুবিধে হয়েছে?’ রানা জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল সোহানা। ‘নাহ্। পুলিশ বরং আমি গাড়ি সরানোয় খুশি হয়েছে, আরেকটা ফায়ার-ট্রাক রাখার জায়গা পেয়েছে ওরা।’

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল দুজনে। শেষে নীরবতা ভেঙে সোহানা বলল, ‘তোমার ক্ষতটার অবস্থা কী?’

‘আবার মুখ খুলে গেছে। বুঝতে পারেনি?’

‘হ্যাঁ, আন্দাজ করেছি। আবার ড্রেসিং করতে হবে, তাই না?’
দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘হ্যাঁ।’

একটু ইতস্তত করল সোহানা। তারপর ডাকল, ‘রানা?’
‘বলো।’

‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব। বাড়ির ভিতরে... যখন আগুন আর গোলাগুলি চলছিল... তোমার ভয় করেনি?’

ভুরু কুঁচকে সোহানার দিকে তাকাল রানা। বলল, ‘হঠাৎ এ-কথা জানতে চাইছ কেন? এ-ধরনের সিচুয়েশনে ভয় তো স্বাভাবিক রি-অ্যাকশন... সেটা খুব ভাল করেই জানো তুমি। আমাদের ট্রেইনিঙের একটা বড় অংশ ছিল এই ভয়টাকে ট্যাকেল করবার নিয়ম শেখা...’

‘না...’ আবার ইতস্তত করল সোহানা। ‘আমি সে-কথা বলছি না। আমি আসলে... আমি আসলে সত্যিকার ভয়ের কথা বলছি... মানে... যেটা ট্রেইনিং দিয়ে ঠেকানো যায় না।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সরল গলায় বলল, ‘তোমার জন্য ভয় হচ্ছিল আমার।’

‘আমারও।’

‘মানে!’

‘নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম আমি, রানা,’ বলল সোহানা।
‘এখনও পাচ্ছি!’ স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত সরিয়ে রানার দিকে
তুলে ধরল ও—হাতটা কাঁপছে ভীষণভাবে।

‘রিল্যাক্স!’ মোলায়েম গলায় বলল রানা। ‘পরিস্থিতিটা গুরুতর
ছিল। এটা শকের সাইড-এফেক্ট।’

‘না, রানা,’ ঘাবড়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল সোহানা। ‘এই
ভয়টা স্বাভাবিক নয়। কিছু একটা ঘটে গেছে আমার ভেতর।
গোটা ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মত সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছি
আমি। বিশ্বাস করো!’

তিন

প্রায় নগ্ন অবস্থায় বাথটাবের পানিতে গা ডুবিয়ে শুয়ে আছে রানা,
পরিধেয় বলতে রয়েছে শুধু আগরওয়্যারটা। কয়েক গজ দূরে
বাথরুমের কাউন্টারের উপর... মেকআপ মিররের সামনে রাখা
হয়েছে একটা বিদ্যুৎ-চালিত হটপ্লেট—কয়েলগুলো গনগনে লাল
হয়ে গেছে, তাপ ছড়াচ্ছে। একটা সসপ্যান বসানো হয়েছে
বৈদ্যুতিক এই চুলার উপর—পানি ফুটছে, তাতে জীবাণুমুক্ত করা
হচ্ছে একটা বাঁকানো সুঁই আর মাছধরা ছিপের এক বাঙিল
নাইলন মনোফিলামেন্ট সুতো। অন্তরার বাড়ি থেকে ফিরে
আসবার পথে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে থেমে সমস্ত সরঞ্জাম
কিনে এনেছে সোহানা—রানার ক্ষতটা সেলাই করবার জন্য।

মোটলে ফিরে এসেছে ওরা। ড্রেসিংয়ের জন্য বাথরুমে

দুকবার আগে সেলফোনের মাধ্যমে ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারের জ্যাম্বলড্ লাইনে যোগাযোগ করেছে রানা; কথা বলেছে চিফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে। এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর রিপোর্ট দিয়েছে ও সংক্ষেপে; কী করতে চায়, তা-ও জানিয়েছে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেছেন রাহাত খান, কিছুক্ষণ কথা বলেননি। শেষে মুখ খুলে শুধু অনুমতি দিয়েছেন, ‘গো অ্যাহেড।’

‘ইয়েস, সার।’

‘খুব বিশ্বস্ত ছাড়া কারও সামনে দেখা দিয়ো না, রানা। সেফ-সাইটের হামলায় তুমি মারা গেছ বলে ‘ভাবছে সবাই, কাজেই লুকিয়ে কাজ করতে সুবিধে হবে,’ বলেছেন রাহাত খান। ‘মনে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে আমেরিকানরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তোমাকে সাবধানে এগোতে হবে। তোমার ইনজুরি কেমন?’

‘সিরিয়াস নয়, সার,’ নিজের সত্যিকার অবস্থাটা চেপে গিয়ে বলেছে রানা। বুকে আগুন জ্বলছে ওর, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ড. সিদ্দিকীকে নিজ হাতে শাস্তি দিতে না পারলে আগুনটা নিভবে না। ‘মিশন কন্টিনিউ করতে পারব।’

‘সোহানার কী অবস্থা?’

আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়েছে রানা, মায়া অনুভব করেছে। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় থাকার কারণে হঠাৎ নার্ভ দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে পারে—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। শুধু শুধু কথাটা বসকে জানাবার কোনও মানে হয় না। তাই বলেছে, ‘ও ঠিক আছে, সার। একদম ঠিক।’

‘একা কিছু করতে যেয়ো না,’ বলেছেন চিফ, ‘ওকে সঙ্গে রেখো। আহত হয়েছ, সাহায্যের জন্য সোহানাকে দরকার হবে তোমার।’

‘জী, সার।’

‘বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন। আমাদের পাঁচজন এজেন্টকে খুন করে কেউ পার পেয়ে যাবে—তা হতে দেয়া যায় না। তা ছাড়া তলে তলে কী ঘটছে, সেটা জানাও প্রয়োজন। আই ওয়ান্ট আন্সারস্, রানা!’

‘পাবেন, সার,’ কথা দিয়েছে রানা।

আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিয়েছেন রাহাত খান। রানা এসে ঢুকেছে বাথরুমে। জামা-কাপড় ছেড়ে বাথটাবে নেমে পড়েছে, ড্রেসিংয়ের আগে পরিষ্কার করে নিচ্ছে শরীরে জমে থাকা সব ময়লা। একটু পরেই ব্যাণ্ডেজ, মলম আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলো সোহানা, সবকিছু নামিয়ে রাখল কাউন্টারের উপর।

‘কী অবস্থা তোমার?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘স্বাভাবিক হয়েছে?’

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

‘দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না,’ ভুরু কঁচকাল রানা। ‘মুখটা আমসি হয়ে আছে।’

‘আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না,’ মৃদু প্রতিবাদ করল সোহানা। ‘নিজের দিকে নজর দাও।’

‘সেজন্যেই তো মাথা ঘামানো দরকার,’ রসিকতা করল রানা। ‘তুমি আমার ডাক্তার, নার্ভাস হয়ে ভুল ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেলো যদি!’

হাসল না সোহানা। বলল, ‘আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, ঠিকমত কাজ করতে পারব। তবে মনের অবস্থা যদি জানতে চাও... কী যেন ঘটে গেছে আমার মধ্যে, রানা। এমন ভয় আমার জীবনে হয়নি, মনে হচ্ছে আর কোনোদিন স্বাভাবিক হতে পারব না।’

‘রিল্যাক্স,’ হালকা সুরে বলল রানা। ‘এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। সবসময় বিপদের মাঝে থাকতে হয় আমাদেরকে, উদ্বেজনা দমিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। সবকিছুই তো সীমা আছে... কখনও-সখনও নার্ভ যদি হার মানে, সেটাকে সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই। বিশ্রাম পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

‘কী জানি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক,’ কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

‘ঠিক তো বটেই,’ রানা সহজ ভঙ্গিতে হাসল। ‘এবার কাজ শুরু করো, ডাক্তার মেমসাহেব!’

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, তাকাল রানার শরীরের দিকে। বলল, ‘তোমার গায়ে আরও কালসিটে পড়েছে। যে-অবস্থা দেখছি, তাতে কাল সকালে আর হাঁটতে পারবে না।’

‘কাল আমাকে হাঁটতে হবে না,’ রানা বলল। ‘সারাদিন আমরা গাড়িতে থাকব... চলার মধ্যে।’

‘সেটা আজ রাতেই শুরু করা দরকার,’ বলল সোহানা। ‘মোটেলটা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া অন্তরার পড়শিরা আমাদেরকে দেখেছে, পুলিশও দেখেছে আমাদের। গাড়িটা ছিল ওদের চোখের সামনে, নাম্বার প্লেট মনে থাকবে অনেকেরই। কানেকশন খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। যত দ্রুত সম্ভব, এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের।’

‘ঠিক বলেছ,’ রানা একমত হলো। ‘ড্রেসিংটা হয়ে গেলেই রওনা হব।’

হটপ্লেটের উপর বসানো সসপ্যানের দিকে তাকাল সোহানা। ‘কী মনে হয়—পরিষ্কার হয়েছে ওগুলো?’

‘দশ মিনিটের বেশি হলো ফুটছে পানিটা। এতক্ষণে তো হয়ে যাবার কথা।’

‘তা হলে শুরু করি, কী বলো?’

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা।

এক টুকরো সার্জিক্যাল গজ দিয়ে ওর কাঁধের ক্ষতটা মুছে শুকনো করল সোহানা। আজ আর হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহারের দরকার নেই, তাই শুধু জীবাণুনাশক বেটাডিন ঢেলে পরিষ্কার করল। এরপর অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম মেখে দিল জায়গাটায়। এবার সসপ্যান থেকে সুঁই আর সুতো তুলে নিল ও, ধুয়ে ফেলল অ্যালকোহল দিয়ে। একটা ছোট কাঁচিও সেদ্ধ করা হয়েছে পানিতে—তুলে নিল ওটাও। তারপর দক্ষ হাতে সুঁইয়ে সুতা পরাতে শুরু করল।

‘তোমার আসলে ডাক্তার, কিংবা নার্স হওয়া উচিত ছিল,’ প্রশংসার সুরে বলল রানা।

‘হ্যাঁ,’ বক্তব্যটি করল সোহানা, ‘মানুষের শরীরের কাটা-ছেঁড়া সেলাই করতে তো খুব ভাল লাগে আমার!’

মোটা সুঁইটা দেখে কাষ্ঠ হাসি হাসল রানা। ‘তা হলে সেলাইটা না-ই বা করলে।’

‘আর কোনও উপায় নেই,’ এগিয়ে এল সোহানা। ‘ক্ষতের মুখটা বন্ধ রাখতে হবে। ব্যাণ্ডেজ কাজ হচ্ছে না, দেখছই তো। সেলাই-টাই একমাত্র বিকল্প।’

‘ভুল বললে,’ ঠাট্টা করল রানা। ‘স্ট্যাপল করে দিলেও কিষ্ট হয়!’

‘মার খাবে!’ চোখ রাঙাল সোহানা। ‘সোজা হও। কাজ করতে দাও আমাকে।’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বাথটাবে সিঁধে হয়ে বসল।

‘তৈরি থাকো,’ সোহানা বলল, ‘বেশ ব্যথা লাগবে কিষ্ট!’

‘অসুবিধে নেই,’ রানা হাসল। ‘দেহ-মনে ব্যথা পেতে পেতে

অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত সুন্দরীর হাতে চিকিৎসা পাবার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়?’

‘তা-ই?’ কটাক্ষ করল সোহানা। পরমুহূর্তে ঘ্যাচ করে সুইটা বিঁধিয়ে দিল রানার কাঁধের চামড়ায়।

গাড়ির মৃদু ঝাঁকিতে চোখ মেলল মাসুদ রানা। উল্টোদিক থেকে পার হতে থাকা বেশ কয়েকটা হেডলাইট চোখে পড়ল ওর, নিজেকে আবিষ্কার করল টরাসের পিছনের সিটে—গলা পর্যন্ত কম্বল-ঢাকা অবস্থায়। আশপাশে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা জিনিসপত্রের স্তুপ। ওর শরীর থেকে ঝরা রক্তের দাগ ঢাকতে সবক’টা সিট মুড়ে ফেলা হয়েছে নতুন চামড়ার কাভার দিয়ে, সেগুলোর কটু গন্ধে বাস্তবে ফিরে এল ‘ও। তাকাল সোহানার দিকে। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে মেয়েটা।

‘কোথায় আমরা?’

‘উঠেছ?’ মাথাটা একটু ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল সোহানা, আবার সোজা হলো। ‘পুকিপসি পেরিয়ে এসেছি একটু আগে, এখন দক্ষিণে আছি। তোমার ঘুম কেমন হলো?’

‘ভাল,’ ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসতে থাকা গাড়িগুলোর হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

‘কাঁধের কী অবস্থা?’ জিজ্ঞেস করল সোহানা।

‘সাড়া পাচ্ছি না,’ বলল রানা। ‘অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম নাকি?’

‘হ্যাঁ। তোমাকে গাড়িতে তুলতে খুব কষ্ট হয়েছে।’

‘সরি,’ দুঃখ প্রকাশ করল রানা। ‘সামান্য একটা সেলাইয়ের ব্যথা সইতে পারব না—এটা ভাবিনি।’

‘দোষটা তোমার নয়, শরীরের। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সামান্য ব্যথাও আর সইতে পারছে না।’

‘হুঁ।’ সিটের তলা থেকে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল তুলে নিল রানা। মুখ খুলে চুমুক দিল পানিতে।

‘খিদে পেয়েছে?’ জানতে চাইল সোহানা।

‘নাহ্।’

‘তাও কিছু মুখে দাও। শরীরে শক্তি পাবে। সিটের উপর স্যাণ্ডউইচের একটা প্যাকেট আছে।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিল রানা, একটা স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় বসাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘ক’টা বাজে?’

‘প্রায় একটা।’

‘মোটেল রুমটা পরিষ্কার করতে অসুবিধে হয়নি তো?’

‘উঁহুঁ। তোমার রক্তমাখা তোয়ালে আর কাপড়-চোপড় একটা কনস্ট্রাকশন সাইটের ডাম্পস্টারে ফেলে দিয়ে এসেছি। তোয়ালে-তে মোটেলের নাম নেই, কাজেই ওগুলো থেকে আমাদেরকে ট্রেস করতে পারবে না কেউ।’

‘ফিসারপ্রিন্ট?’

‘প্রত্যেকটা ফার্নিচার, দরজা-জানালায় হাতল... ভালমত মুছেছি। বিছানার উপর রুমের চাবি আর খামের ভিতর ভাড়া-সহ মোটা বখশিশ রেখে এসেছি। সবদিক কাভার করা হয়েছে, তোমাকে ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।’

‘খুব ভাল।’ স্যাণ্ডউইচটা দ্রুত শেষ করল রানা, পানি খেল। রাস্তার হালকা ট্রাফিক দেখল কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার টায়ার্ড লাগছে না?’

‘কিছুটা তো লাগছে। কেন?’

‘সামনে কোথাও সাইড করো। আমি কিছুক্ষণ ড্রাইভ করি।’

‘পারবে?’ ভুরু কোঁচকাল সোহানা।

‘ডান হাতটা চালু আছে এখনও। অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়া তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।’

‘হুম। ভাল কথা, কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছে?’

‘নিউ জার্সি। ওখানে পৌঁছে আরেকটা মোটেল খুঁজে নেব।’

‘তারপর?’

‘খানিকটা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেই ফাঁকে প্রস্তুতিও নেব।’

‘কীসের জন্য?’

‘সিদ্দিকী,’ থমথমে গলায় বলল রানা। ‘ওকে শিকার করতে বেরুব আমি!’

চার

‘হায়! হায়! এ কী অবস্থা?’ প্রায় হাহাকার করে উঠল অটোমোবাইল পেইন্ট-শপের মালিক লোকটা। ‘এত সুন্দর একটা গাড়ি... কে করেছে এ-অবস্থা?’

আঁতকে ওঠার মত দৃশ্যই বটে। ঝকঝকে নতুন টরাস গাড়িটার সারা শরীর ঢেকে গেছে কটকটে সবুজ আর টকটকে লাল রঙা স্প্রে-পেইন্টের হিজিবিজি দাগে। কিম্বদন্তিমানকার একটা বস্তুর মত মনে হচ্ছে বাহনটাকে।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, ‘বজ্জাত ছেলেপুলেদের কাণ্ড। আধঘণ্টার জন্য রাস্তার পাশে রেখে একটা কাজে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি এ-অবস্থা। বদমাশগুলোকে হাতের কাছে পেলে বেত মেরে পিঠের ছাল তুলে ফেলতাম...’

‘এ-গাড়ি তো এখন পুরোটা নতুন করে পেইন্ট করতে হবে!’

বলল মালিক।

‘জানি,’ চেহারা তিক্ততা ফোটাল রানা। ‘ডিলারশিপে গিয়েছিলাম, ওরা বলল—ওয়ারেন্টিতে ভ্যাণ্ডলিজম কাভার করে না। নতুন করে রঙ করে দিতে পারে, তবে সেজন্য আমাকেই গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে। অ্যামাউন্টটা শুনে ভিরমি খাবার জোগাড় হয়েছে আমার, বলতে গেলে পালিয়ে এসেছি।’

‘কত চেয়েছে ওরা?’

আকাশছোঁয়া একটা অঙ্ক বলল রানা। এই পেইন্ট-শপে ওটার তিন ভাগের দু’ভাগ নিলেও বিশাল লাভ থাকবে।

লোকটার চোখ চকচক করে উঠতে দেখে বোঝা গেল, টোপটা গিলেছে সে। স্বাভাবিক, এমন একটা দাঁও মারার সুযোগ কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যবসায়ী হাতছাড়া করবে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে সে প্রস্তাব দিল, ‘আমি যদি ওদের চেয়ে দুইশ’ ডলার কমে করে দিই, তা হলে চলবে?’

‘দুইশ’? ভুরু কোঁচকাল রানা। ‘বাজেট তো তারপরও ফেল মারছে...’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ তাড়াতাড়ি বলল পেইন্ট-শপের মালিক। ‘আমি আরও পঁচিশ ডলার ডিসকাউন্ট দেব, কারণ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই রেটে কিন্তু আর কেউ রাজি হবে না। ডিলারদের অবস্থা তো দেখেই এসেছেন, ওরা স্রেফ জবাই করবে আপনাকে।’

শ্রাগ করল রানা। ‘কী আর করা! ঠিক আছে, রাজি আমি।’

খুশিতে বত্রিশ দাঁত বেরিয়ে পড়ল পেইন্ট-শপের মালিকের। জিজ্ঞেস করল, ‘রঙ কি অরিজিনালটাই রাখতে চান, নাকি অন্য কিছু?’

‘না, না,’ আপত্তি জানাল রানা, ‘নীল রঙটা প্রথম দিন থেকেই আমার বউ সহ্য করতে পারছে না। আমাকে বলে দিয়েছে, যাতে

ধূসর রঙ করি।’

‘ঠিক আছে, তা-ই হবে।’

সোহানাকে নিয়ে এরপর ফিলাডেলফিয়ার একটা ব্যাঙ্কে গেল রানা। কাউন্টারের সামনে গিয়ে ক্লার্কের কাছে পরিচয় দিল, ‘মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ কায়সার।’

একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। ‘এখানে সই করুন, মি. কায়সার।’

করল রানা। অ্যাকাউন্ট নাম্বারও লিখল।

কম্পিউটারে সইটা মিলিয়ে দেখল ক্লার্ক। শেষ ট্রানজ্যাকশনের তারিখটা লক্ষ করে বলল, ‘অনেকদিন পর এলেন আপনি, মি. কায়সার।’

‘হ্যাঁ, এক বছর,’ রানা বলল। ‘তবে ঠেকায় না পড়লে সেফটি-ডিপোজিট বক্স ব্যবহার করি না আমি। ঠেকাটা যত দেরিতে আসে, ততই মঙ্গল।’

ভুরু কুঁচকে মক্কেলের দিকে তাকাল ক্লার্ক। মুখের কালসিতে আর স্লিঙে ঝোলানো বাম হাত দেখে বুঝল—ঠেকা হোক বা না-হোক, অন্তত ঝামেলার মধ্যে আছেন ভদ্রলোক। চেহারাও সহানুভূতি ফোটাল সে। বলল, ‘আপনার চাবিটা বের করুন প্লিজ।’

ক্লার্কের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিচলিত হলো না রানা। ইতোমধ্যে চুল ছোট করে ছেঁটে নিয়েছে ও, চোখে চশমা দিয়েছে, নাকের নীচে লাগিয়েছে একটা পুরু গোঁফ। ব্যাঙ্কের ফাইলের ছবির সঙ্গে চেহারাটা হুবহু মিলে যাবে। সোহানাও ছদ্মবেশ নিয়েছে—মাথায় পরচুলা পরেছে, চোখের মণির রঙ পাল্টে ফেলেছে নীল রঙের কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে। ওদের আসল পরিচয় ফাঁস হবার ঝুঁকি নেই।

চাবিটা ক্লার্কের হাতে তুলে দিল রানা। লোকটা জানতে চাইল, ‘আপনারা কি কিউবিকল ব্যবহার করতে চান?’

‘অবশ্যই!’

‘ঠিক আছে, আসুন।’

মার্বেল পাথরে মোড়া একটা সিঁড়ি ধরে আগারগাউণ্ডে ওদেরকে নিয়ে গেল ক্লার্ক। সামনেই একটা ভারি লোহার দরজা, পাশে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক। প্যানেলে কোড চেপে দরজাটা খুলল লোকটা, দুই মঞ্চেলকে নিয়ে ঢুকল আলোকিত একটা ভল্ট-রুমে। চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে স্টিলের তিরি অসংখ্য ছোট ছোট হ্যাচে, চাবির নম্বর দেখে নির্দিষ্ট বক্সটা খুঁজে বের করল ক্লার্ক। ওটায় দুটো চাবির ফুটো আছে—একটায় রানারটা ঢোকাল লোকটা, আরেকটায় ঢোকাল নিজের একটা চাবি। দুটো একসঙ্গে ঘোরাতেই খুলে গেল বক্সের তালা। হ্যাচটা খুলে ভিতর থেকে একটা ধাতব কণ্টেইনার বের করে আনল ক্লার্ক, তুলে দিল রানার হাতে।

‘কিউবিকলগুলো ভল্টের বাইরে,’ জানাল সে।

‘ধন্যবাদ।’

‘মোস্ট ওয়েলকাম,’ হাসল ক্লার্ক। ‘কিউবিকলে কলিং বেলের সুইচ আছে। কাজ শেষ হলে ওটা বাজিয়ে খবর দেবেন আমাকে। কণ্টেইনারটা আবাস ঢুকিয়ে রাখব।’

‘আপাতত তার প্রয়োজন হবে না,’ রানা বলল। ‘আজ শুধু জিনিস নিতে এসেছি, কিছু রাখতে নয়।’

‘আপনার যা মর্জি।’ রানার চাবিটা ফিরিয়ে দিল ক্লার্ক।

মঞ্চেলদের রেখে ভল্ট থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। সোঁহানাকে নিয়ে কিউবিকলের দিকে এগোল রানা।

একসারিতে ছোট ছোট কয়েকটা কামরা ওগুলো। একটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল

কণ্টেইনারটা। ঢাকনা খুলে ভিতর থেকে কয়েকটা ম্যানিলা এনভেলোপ বের করল রানা, সঙ্গে দুটো মখমলের পাউচ।

‘ব্যাগ দাও,’ বলল ও।

একটা হ্যাভারস্যাক এনেছে সোহানা, ওটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। মুখ খুলে সবক’টা খাম আর পাউচ ভরল রানা, তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্যাঙ্ক থেকে।

নিউ জার্সির মোটোলে ফিরে এল রানা-সোহানা। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে হ্যাভারস্যাক থেকে সবকিছু ঢালল বিছানায়। ম্যানিলা খামগুলো খুলতেই ছোট ছোট নোটে দশ হাজার ডলার বেরল।

‘চমৎকার!’ মন্তব্য করল সোহানা। ‘খরচা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।’

‘এগুলো সরকারি টাকা—বিসিআই থেকে ধার হিসেবে নেয়া... ইমার্জেন্সি সামলানোর জন্য,’ নীরস গলায় বলল রানা। ‘ভেবো না গয়না কিনতে পারবে।’ ঠাট্টা করছে ও।

‘মনটাই খারাপ করে দিলে!’ সোহানা ভান করল।

হাসল রানা।

‘আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে,’ সোহানা বলল। ‘আমার সমস্ত ইমার্জেন্সি ফাণ্ড একত্র করলেও তো এত টাকা হবে না।’

‘সবচেয়ে অ্যাকটিভ এজেন্ট হবার কুফল,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা।

‘কুফল! এত টাকা... তোমার কাছে কুফল মনে হচ্ছে?’

‘নয়তো কী? সবই তো ধার নেয়া। যদি কোনও রকমে হারাই, আমার সাত জনমের পেনশন খতম হয়ে যাবে ফেরত দিতে দিতে।’

‘বলো কী! তোমার সব ইমার্জেন্সি ফাণ্ডেই কি এত টাকা আছে নাকি?’

‘তা অবশ্য নেই। ফিলাডেলফিয়ার ফাণ্টা সবচেয়ে রিচ। সেজন্যেই ওখান থেকে তুলে এনেছি।’

‘কিন্তু আমেরিকায় এত জায়গা থাকতে ফিলাডেলফিয়াতে কেন বেশি টাকা রাখতে গেলে?’

‘সিম্পল—জায়গাটা নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের মাঝামাঝি। এদেশের ও-দুটো শহরেই সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হয় আমাকে।’

খামের ভিতর থেকে দুটো ক্রেডিট কার্ড বেরিয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে সোহানা জিজ্ঞেস করল, ‘এগুলো মেইনটেন করো কীভাবে?’

‘রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসের ঠিকানায় বিল যায়। নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ থেকে জাকির ওগুলোর পেমেন্ট দেয়। বছরে দু’একবার আমি ব্যবহার করি কার্ডগুলো, যাতে ক্যানসেল না হয়ে যায়।’

‘হুম, এজেন্সিটা থেকে ভালই সাপোর্ট পাও তুমি। আমাকে তো এ-ধরনের সবকিছু নিজেই ম্যানেজ করতে হয়।’

জবাবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা। সোহানা বাধা দিয়ে বলল, ‘জানি, জানি, কী বলবে। সবচেয়ে অ্যাকটিভ এজেন্ট হবার কুফল... তাই না?’

‘এজেন্সি নিয়ে যে কত ঝামেলা পোহাতে হয়, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।’

‘তার দরকার নেই। আর কী কী এনেছ, সেগুলো দেখাও।’

একটা পাউচ খুলল রানা। ভিতর থেকে বের করল নকল পরিচয়ের বিভিন্ন রকম ডকুমেন্ট। আইডি কার্ড, ‘পাসপোর্ট’, ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে হরেক রকম কাগজপত্র।

‘এগুলো সব অন্তরার তৈরি করে দেয়া,’ বলতে বলতে গলাটা ধরে এল রানার।

ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল সোহানা। ‘রিল্যাক্স, ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে তারপর দেখা করব আমরা অন্তরার সঙ্গে।’

নিজেকে সামলে মাথা ঝাঁকাল রানা, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ওর।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য দ্বিতীয় পাউচটা দেখাল সোহানা। ‘ওটায় কী?’

‘এটা? গিফট... তোমার জন্য।’

‘তাই নাকি?’ পাউচটা তুলে মুখ খুলল সোহানা, উঁকি দিল ভিতরে। পরমুহূর্তে নিঃশব্দে হাসল। ‘হ্যাঁ, একজন এসপিয়োনাজ এজেন্টের জন্য উপযুক্ত উপহারই বটে!’ জিনিসটা বের করে আনল ও।

‘তা হবে কেন?’ হালকা সুরে বলল রানা। ‘মেয়েরা তিনটে জিনিস দেখে আকৃষ্ট হয়, এটা জানো না? গাড়ি, টাকা আর আগ্নেয়াস্ত্র!’

‘বুঝছি, তোমাকে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের উপর সবকিছু দিতে হবে।’

সোহানার হাতে শোভা পাচ্ছে একটা সিগ-সাওয়ার নাইন মিলিমিটার পিস্তল—রানারটার যমজ। ওটার মত এটাও মডিফাই করা—ফ্যাক্টরি-ইকুইপড সাইট সরিয়ে একটা রিয়ার সাইট বসানো হয়েছে; ফ্রন্ট সাইটের পরিবর্তে রয়েছে একটা লিউমিনাস বিন্দু। নিকষ অন্ধকারেও লক্ষ্যস্থির করতে অসুবিধে হয় না এর ফলে। ভিতরের মুভিং পার্টসগুলো ঘষে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে, প্রলেপ দেয়া হয়েছে পার্মানেন্ট ফ্রিকশন রিডিউসার দিয়ে। এই পিস্তল কিছুতেই জ্যাম হবে না। বাইরের দিকটাও বিশেষ ধরনের কালো রঙে ঢাকা—আলো প্রতিফলিত হয় না।

দক্ষ হাতে পিস্তলটা নেড়ে-চেড়ে দেখল সোহানা। সিগ-সাওয়ার ব্যবহার করে না ও, তবে চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি বলে

দিচ্ছে—অস্ত্রটা ওর পছন্দ হয়েছে।

‘তোমার হাতে মানিয়েছে বেশ!’ প্রশংসার সুরে বলল রানা।

‘হুম,’ বলল সোহানা। ‘কিন্তু সিগ সাওয়ারের তো সেফটি ক্যাচ নেই। সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়... ব্যাপারটা ভাল লাগে না আমার।’

‘তাতে কী? কনসিলড ওয়েপন হিসেবে তো অতুলনীয়। এমন ফায়ার-পাওয়ার লুকিয়ে বহন করা... ব্যাপারটা চমৎকার নয়?’

‘তা অবশ্য ঠিক বলেছ।’ পিস্তলটা নামিয়ে রেখে ম্যাগাজিন তুলে নিল সোহানা। ‘আটটা অ্যামিউনিশন ধরে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, চেম্বারে একটা রাখলে নয়টা বুলেট। শক্তিও অন্যান্য অ্যামিউনিশনের চেয়ে বেশি।’

‘ফুললি লোডেড,’ ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করে বলল সোহানা। ‘ইমার্জেন্সির জন্য রেডি। তবে পিস্তলটার যে-অবস্থা, পরিস্কার করতে জান বেরিয়ে যাবে।’

‘চার বছর ধরে তেল পড়েনি ওটায়। সেফটি-ডিপোজিট বক্সে পড়ে ছিল। একটু কষ্ট তো হবেই।’

‘এবং কষ্টটা করতে হবে আমাকেই,’ ভুরু কুঁচকে বলল সোহানা। ‘তুমি তো সময়মত একটা হাত অচল করে বসে আছ।’

হাসল রানা। সকৌতুকে বলল, ‘পাশ থেকে আমি উৎসাহ দেব। কিছু ভেবো না!’

কয়েক ঘণ্টা পর রানা প্রস্তাব দিল, ‘চলো, শপিঙে যাই।’

‘চমৎকার আইডিয়া!’ সোৎসাহে বলল সোহানা। ‘বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।’

‘ড্রাইভ কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। আমি বাম হাতটা নড়াতে পারছি না।’

‘কোনও অসুবিধে নেই। কোথায় যাবে?’

ফোনবুক খুলে কয়েকটা ঠিকানা আর ম্যাপ দেখাল রানা।
হার্ডওয়্যার স্টোর, অটো-সাপ্লাই স্টোর আর একটা গান-শপ।

‘কেনাকাটার জন্য ভাল জায়গাই বেছেছ দেখছি,’ বলল
সোহানা। ‘আমি ভেবেছিলাম গহনার দোকান! কী কিনবে?’

‘গেলেই দেখতে পাবে।’

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে হাতুড়ি, ডাঙ্ক টেপ, জু-ড্রাইভার,
ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার, টগল সুইচ, গ্লাভ, কভারঅল, পানির
টিউব আর একগাদা জু-ক্ল্যাম্প কিনল রানা।

‘এসব কীসের জন্য?’ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহানা।

সংক্ষেপে রানা শুধু বলল, ‘ইঁদুর ধরার ফাঁদ বানাব।’

‘হেঁয়ালি শুনে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

অটো-পার্টসের দোকান থেকে কেনা হলো একটা এয়ার-
ফিল্টার, দুটো ফগ-ল্যাম্প আর চার টুকরো চামড়ার কাপড়।

ওগুলো দেখে বিভ্রান্ত বোধ করল সোহানা। শ্যামোয়া লেদার
দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করা হয়; কিন্তু রানা নিশ্চয়ই সে-মতলবে
নেই? গাড়ি যত নোংরা হয়, ততই ভাল। মানুষ আগ্রহ নিয়ে
তাকায় না। প্রশ্ন করে কোনও সদুত্তর পেল না ও।

গান-শপে ঢুকে সোহানাকে গানবেল্টের র্যাকের কাছে নিয়ে
গেল রানা। বলল, ‘ভাল দেখে দুটো বেল্ট বের করো। আমাদের
পিস্তলদুটোর জন্য।’

কয়েক মিনিটের মধ্যে র্যাক থেকে এক জোড়া বেল্ট নামাল
সোহানা। ঠাট্টার সুরে বলল, ‘আমার কানের দুলের সঙ্গে মানাবে
বেশ, কী বলো?’

মুচকি হাসল রানা, কাউন্টারে গিয়ে দোকানিকে জিজ্ঞেস
করল, ‘আপনার কাছে কাইডেক্স হোলস্টার আছে?’ জিনিসটা
পাতলা এক ধরনের চামড়ায় তৈরি, বৃষ্টি বা ঘামে ভেজে না।
পাতলা হওয়ায় কাপড়ের তলায় কাইডেক্সের উপস্থিতি চোখে পড়ে

না।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল দোকানি। জিজ্ঞেস করল,
'কোন্ মডেলের পিস্তল রাখবেন?'

বলল রানা।

কাউন্টারের তলা থেকে কালো রঙের এক জোড়া
শোল্ডার-হোলস্টার বের করে দিল দোকানি। আকারে বেশি বড়
নয়, রঙটাও আলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে না। নেড়ে-চেড়ে দেখল
রানা, সন্তুষ্ট হলো।

'আর কিছু?' জানতে চাইল দোকানি।

'সিগ-সাওয়ারের দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন,' সোহানা বলল।
'আর একটা ক্লিনিং কিট।'

'অ্যামিউনিশনও দরকার আমাদের,' রানা যোগ করল।
'ম্যাগসেফ নাইন মিলিমিটার—একশো বিশ রাউণ্ড।' অত্যাধুনিক
বুলেট ওটা, রেসিন-কোটেড। বুলেটের ভগ্নাংশ ছিটকে গিয়ে
আশপাশের কোনও নিরীহ টার্গেটকে আহত করে না।

অ্যামিউনিশনের নাম আর পরিমাণ শুনে সন্দেহ ঘনাল
দোকানির চোখে। এই বুলেট প্র্যাকটিস-শুটিঙে ব্যবহার হয় না।
জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের লাইসেন্স আছে?'

'অবশ্যই!' বলে পকেট থেকে একটা ফায়ারিং লাইসেন্স বের
করে দেখাল রানা। 'চাইলে ভেরিফাই করে নিতে পারেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল দোকানি, ভেরিফিকেশনের ঝামেলায় যেতে
চাইছে না। বড় মাপের ক্রেতা পেয়েছে, তাতেই খুশি। বলল,
'বাদ দিন, আমি অ্যামিউনিশন নিয়ে আসছি।'

'আর হ্যাঁ,' বলল রানা। 'গোটাকয়েক লেড-সিঙ্কার পেলে খুব
ভাল হয়।'

মোটলে ফিরে সবকিছু আনপ্যাক করল ওরা। ভুরু কুঁচকে

সোহানা বলল, ‘শুধু পিস্তলের জিনিসপত্র ছাড়া বাকি কোনও কিছুই পিছনে যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না আমি।’

জবাব না দিয়ে রানা বলল, ‘ড্রেসিংয়ের জন্য যে সুই-সুতা আর কাঁচি কিনেছিলাম, সেগুলো কোথায়?’

‘ফাস্ট এইড কিটে। কেন, তোমার সেলাই আবার খুলে যাচ্ছে নাকি?’

‘না। আনো তো ওগুলো, অন্য কাজ আছে।’

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি থেকে ফাস্ট এইড কিট নিয়ে ফিরে এল সোহানা। ওটা বিছানার উপর রেখে ভুরু নাচাল।

‘তোমার ব্রেজারটা খোলো,’ রানা বলল। ‘লাইনিং কেটে লেড সিল্কার ঢোকাতে হবে। ভিতর দিকে বগলের জায়গাটায় শ্যামোয়া লেদারও পট্টির মত সেলাই করতে হবে। কীভাবে করবে, আমি দেখিয়ে দেব।’

‘কেন?’

‘বড্ড প্রশ্ন করো! কাজ শেষ হলেই তো দেখতে পাবে!’

আর কথা বাড়াল না সোহানা। লক্ষ্মী মেয়ের মত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রানা নির্দেশ দিয়ে গেল, সেই অনুসারে লাইনিং খুলে সিল্কার ঢোকাল ও; ব্রেজারের ভিতর দিকে চামড়ার পট্টিও বসাল। পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় হলো কাজটা সারতে।

‘সর্বশেষে গুণান্বিতা তুমি!’ হেসে বলল রানা। ‘সেলাইটা চমৎকার হয়েছে। প্রফেশনাল দর্জিরাও ফেল!’

‘দেখো, দর্জির সঙ্গে তুলনা করবে না, খবরদার!’ চোখ রাঙাল সোহানা।

‘সরি। তবে কাজটা আসলেই ভাল হয়েছে।’

‘ঘোড়ার ডিম! কী যে করলাম, তাই তো বুঝতে পারছি না।’

‘এখুনি বুঝবে। পিস্তলসহ গানবেন্ট আর হোলস্টার পরো। উপরে চড়াও ব্রেজারটা।’

পরল সোহানা। ঘুরে ঘুরে চারপাশ থেকে ওকে দেখল রানা।
সম্ভ্রাণ্টি ফুটল চেহাঁরায়। বলল, ‘গুড। পিস্তলটা বোঝা যাচ্ছে না।’

‘তা তো এমনিতেও বোঝা যেত না। ব্লেজারটা অল্টার
করবার দরকার কী ছিল?’

‘পিস্তলটা ড্র করো, তা হলেই বুঝতে পারবে।’

‘ড্র করব?’ জ্রকুটি দেখা দিল সোহানার কপালে।

‘হ্যাঁ। থ্রি, টু, ওয়ান... ড্র!’

ঝট করে ব্লেজারের ফ্ল্যাপ সরাল সোহানা, ডান হাতে
অবলীলায় বের করে আনল সিগ-সাওয়ারটা। ক্লাসিক
ভঙ্গিমা—এক হাতে তুলল, অন্য হাতটা এনে মুঠো করে ধরল
প্রথম হাতটাকে। দু’হাতে স্থির হয়ে রইল অস্ত্রটা, তাক করা আছে
অদৃশ্য টার্গেটের দিকে, দু’হাঁটু সামান্য ভাঁজ হয়ে রয়েছে।
পজিশনটা গুলি ছোঁড়ার জন্য একেবারে আদর্শ।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘কী? বুঝতে পেরেছ?’

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চেহাঁরায় বিস্ময়। বলল, ‘চামড়ার
পট্টির কারণে হোলস্টারের উপর দিয়ে খুব সহজে পিছলে গেছে
ফ্ল্যাপটা, সিঙ্কারের ওজনের কারণে সরে যাবার পর স্থির
থেকেছে... আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। ড্র করতে সুবিধে
হয়েছে আমার।’

‘কারেক্ট!’

‘এটা তোমার আবিষ্কার?’

‘আবিষ্কার বলা ঠিক না, শ্রেফ একটা মডিফিকেশন।’ বিনয়
ঝরল রানার কণ্ঠে।

‘ভালই বলেছ।’ সোজা হলো সোহানা। ‘তবে ফগ-লাইট
আর হার্ডওয়ারগুলো কী কাজে লাগবে, সেটা এখনও পরিকার
হয়নি।’

‘গুটা আরেকটা কাজ,’ বলল রানা। ‘এবং বরাবরের মত...

কাজটা তোমাকেই করতে হবে।’

‘জানতাম!’ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা।

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে কেনা গ্লাভস্ আর কভারঅল পরে কাজ শুরু করে দিল সোহানা—টরাসের পিছনদিকে ফগ-ল্যাম্প দুটো লাগাচ্ছে। পাশ থেকে রানা বলল, ‘সম্ভব হলে কাজটা আমিই করতাম। কিন্তু সেলাইয়ে টান পড়ছে, বাম হাতটা এখনও নড়াতে পারছি না।’ বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা ফোটাল ও।

‘বাদ দাও তো,’ মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সোহানা। ‘আসল কথা বলো—ফগ-লাইট পিছনদিকে বসাচ্ছি কেন? ওগুলো তো গাড়ির সামনের দিকে থাকবার কথা।’

‘এগুলো সাধারণ ফগ-ল্যাম্প না; এক হাজার ওয়াটের কোয়ার্ট্‌য় হ্যালোজেন ল্যাম্প,’ রানা বলল। ‘চার লাখ আশি হাজার ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার রয়েছে একেকটার—খুবই শক্তিশালী বাতি।’

‘বুঝলাম। কিন্তু পিছনদিকে কী কাজে লাগবে এগুলো?’

‘কেউ ধাওয়া করলে তাকে অন্ধ করে দেব,’ মুচকি হেসে বলল রানা। ‘ড্যাশবোর্ডে সুইচ থাকবে, সেটা টিপে দিলেই তীব্র আলো পিছনের গাড়ির ড্রাইভারের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।’

‘সুন্দর বুদ্ধি,’ স্বীকার করল সোহানা। ‘ইমপ্রোভাইজেশনে তোমার জুড়ি নেই।’ কণ্ঠে প্রশংসার সুর ফুটল।

‘ধ্যাত্, কী যে বলো!’ অপ্রস্তুত দেখাল রানাকে। ‘একটু ভাবলে তোমার মাথা থেকেও এ-রকম কয়েক হাজার বুদ্ধি বেরুবে।’ আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উল্টো ঘুরল ও।

‘যাচ্ছ কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল সোহানা।

‘তোমার কাজ কমাতে। দেখি, এয়ার-ফিল্টারটা বদলাতে পারি কি না।’

‘আগেরটা থাকলেই বা ক্ষতি কী?’

‘নতুনটা বিশেষ ধরনের—পিকআপ বাড়ায়। তা ছাড়া এয়ার সাপ্লাইয়ের লাইনটাও বদলাব। ইঞ্জিনে এয়ার-ফ্লো বাড়াতে পারলে হর্সপাওয়ারও বেড়ে যাবে।’

‘পাইপ, হুক আর ক্ল্যাম্প কি সেজন্যেই কিনেছ?’

‘হঁ।’

টরাসের সামনের হুড খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ফিল্টার বদলাতে বিশেষ অসুবিধে হলো না, একহাতেই কাজটা করা যায়। কিন্তু লাইনে হাত দিয়েই বুঝল, একা পারবে না। পুরনো ক্ল্যাম্পগুলো খুলে অপেক্ষায় রইল ও, সোহানার কাজ শেষ হলে নতুন লাইন বসানো শুরু করবে।

একটু পরেই ফগ-ল্যাম্পের ফিটিং শেষ করল সোহানা, এসে হাত লাগাল রানার সঙ্গে।

‘গাড়ির কম্পিউটার চিপটা বদলাব,’ কাজের ফাঁকে বলল রানা। ‘ডেটোনা বিচের একটা স্পেশালিটি কার-পার্টস শপের সঙ্গে কথা বলেছি একটু আগে; ওরা একটা হাই-পারফরমেন্স চিপ দেবে।’

‘আর কোনও মডিফিকেশন করবে?’ জানতে চাইল সোহানা।

‘হেভি-ডিউটি শক অ্যাবজর্ভার বসাব। তা ছাড়া ইগনিশনেও কারিগরি ফলানো দরকার, যাতে ইমার্জেন্সিতে চাবি ছাড়াও দ্রুত স্টার্ট দেয়া যায়।’

‘বাহ, তোমার দেখছি কিছুই চোখ এড়ায় না। কখন করবে ওসব?’

‘সময় আছে। সবার আগে তোমাকে ট্রাঙ্কে ঢুকতে হবে।’

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সোহানার। ‘ট্রাঙ্কে ঢুকব! কেন? মতলবটা কী তোমার?’

‘শুশ্রূষা করব না, নিশ্চিত থাকতে পারো,’ হাসল রানা।

‘আমার আসলে একটা মাপ দরকার...’

‘কীসের জন্যে?’

‘আধ-ইঞ্চি পুরু একটা স্টিলের পাত বসাব পিছনের ট্রাক্কে—বুলেটপ্রুফ আর্মার হিসেবে কাজ করবে ওটা। শত্রুদের ছোঁড়া গুলি ট্রাক্কে ফুটো করে গাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবে না।’

‘হুম! তুমি কোনও চান্স নিতে চাও না, তাই না?’

‘নট এনি মোর।’

কয়েকদিন পর।

‘নোড়ো না!’ শাসনের সুরে বলল সোহানা।

‘কী করব, তোমার হাতদুটো বরফের মত ঠাণ্ডা,’ অনুযোগ করল রানা। ‘চামড়ায় লাগলেই সারা শরীর শিরশির করে উঠছে।’

‘নালিশ বাদ দিয়ে মূর্তি হয়ে যাও। এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে, বুঝতেও পারবে না কীভাবে কী হলো।’

হেসে ফেলল রানা।

সোহানার ভুরু কুঁচকে গেল। ‘হাসছ কেন?’

‘একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল।’

‘শোনাও।’

‘পচা কৌতুক... মাইণ্ড কোরো না আবার!’

‘আগে শুনেই দেখি না!’

‘সেক্স-এডুর্কেশন ক্লাসে এক টিচার বলছেন—পনেরো মিনিটের আনন্দের জন্য বাকি জীবন মাটি কোরো না। সেটা শুনে এক ছাত্রী উঠে দাঁড়াল। বলল—পনেরো মিনিট!! এত লম্বা সময় কীভাবে আনন্দ পাওয়া যায়, টিচার? আমি তো কীভাবে কী ঘটে, টেরই পাই না।’

‘তাই নাকি?’ অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। কৌতুক শোনায মন নেই ওর, রানার কথার ফাঁকে দ্রুত হাতে কেটে ফেলছে

কাঁধের স্টিচগুলো। ‘এই তো, হয়ে গেছে। টের পেয়েছ কিছু?’

‘নাহ্। আশ্চর্য তো! ভালই ডাক্তারি শিখে ফেলেছ দেখি!’

মুচকি হেসে কাঁচি আর চিমটে সরিয়ে রাখল সোহানা। কাছ থেকে দেখল ক্ষতটাকে। সম্ভ্রষ্ট গলায় বলল, ‘সুখবর। ক্ষতটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে, ইনফেকশনও নেই। তবে তোমার শরীরে গুলি আর কাটাছেঁড়ার কালেকশনে আরেকটা দাগ যোগ হলো।’

‘ওভাবে বোলো না। এগুলো আমার বিউটি স্পট!’

‘যত্ন না নিলে বিউটিটা বিস্ট হয়ে যেতে পারে। সাবধানে থেকো। আমি একটা ব্যাণ্ডেজ দিচ্ছি।’

অ্যাডহিসিভ টেপ আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে কাঁধের উন্মুক্ত ক্ষতটা ঢেকে দিল সোহানা। রানা বলল, ‘থ্যাঙ্কস।’

হেঁটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল ও, নিজেকে দেখল। সেফ-সাইটের হামলার পর দশদিন পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে কয়েক দফা মোটেল পাচ্ছে ওরা, গাড়ির নাম্বার প্লেটও বদলেছে প্রতিটা মোটেলের চেক-ইন করবার আগে। ছোট্ট ছোট্ট ওই মোটেল পাটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাকি পুরোটা সময় বিশ্রাম এবং সুস্থ হবার পিছনে ব্যয় করেছে ও। মাঝে-মাঝে ঢাকায় যোগাযোগ করেছে ওরা, পরিস্থিতি জানিয়েছে; তবে আমেরিকায় রানা এজেন্সির কোনও শাখা বা অপারেটরের সঙ্গে কথা বলেনি। বিসিআই চিফ নির্দেশ দিয়েছেন—যা-করবার, তা ওদের দুজনকেই করতে হবে...-এবং গোপনে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখল রানা। কাঁধের ক্ষত ছাড়া বাকি সমস্ত আঘাতের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। শরীরে শক্তি ফিরে পেয়েছে ও, কাঁধের আড়ষ্ট ভাবটাও তেমন একটা নেই আর। স্বস্তি বোধ করল—চুপচাপ বসে থাকার সময় শেষ হয়েছে। গত দশটা দিন স্রেফ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে ওকে। সোহানার সঙ্গে যতই

খুনসুটি করুক, বাস্তবে এক ধরনের বিষণ্ণতা ও ক্রোধ অনুভব করছিল রানা। ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি একটা রাতও, চোখ বুজলেই ভেসে উঠছিল মনসুর, মারুফ, রফিক আর শাহরিয়ারের মৃত্যু-দৃশ্য। অন্তরার প্রাণহীন দেহটাও মানসচোখে দেখতে পাচ্ছিল ও, অবর্ণনীয় এক যন্ত্রণা গ্রাস করছিল সমগ্র অস্তিত্বকে। একজন মাত্র মানুষ দায়ী এর জন্য। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী। তাকে নিজের হাতে শায়েস্তা করতে না পারলে কষ্টটা কমবে না। অথচ এতগুলো দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে ওকে।

অবশেষে অবসান ঘটেছে অপেক্ষার। সুস্থ ও, ড. সিদ্দিকীকে মোকাবেলা করবার জন্য। চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল, ঘুরে দাঁড়াল রানা।

বলল, ‘আমি তৈরি, সোহানা। চলো, গর্ত ছেড়ে বেরুনোর সময় হয়েছে এবার।’

পাঁচ

ওয়াশিংটন ডি.সি.। ভোর সাড়ে ছ’টা।

যুবকটি আমেরিকান, সুঠামদেহী। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় একটা উলের ট্রাউজার পরেছে, উপরে রয়েছে নীল রঙের সোয়েট-শার্ট। জগিং করতে করতে একটা বাঁক ঘুরল সে, ঢুকে পড়ল মিউনিসিপাল পার্কে। ঘাসে ঢাকা জমিন পেরিয়ে নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়েতে উঠল, গতি বাড়িয়ে ছুটতে থাকল পার্কের ভিতরদিকে। একটু পর বাদামি চামড়ার আরেক যুবক উদয় হলো

তার পাশে—প্রথমজনের মত পোশাক এর-ও পরনে, শুধু সোয়েট-শার্টটার রঙ ধূসর; মাত্র দু'কদম দূরত্ব রেখে তাল মিলিয়ে ছুটেতে থাকল। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না আমেরিকান যুবক, অযাচিত দ্বিতীয় জগারের দিকে তাকালও না। সময়টা সাতসকাল হলেও পার্কে স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষের অভাব নেই, সবাই কোনও না কোনও শারীরিক ব্যায়াম করছে; এদের মধ্যে কেউ যদি জগিঙে ওর সঙ্গী হতে চায়, তাতে আপত্তির কী আছে?

তবে বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পরও যখন দ্বিতীয় জগার সঙ্গ ছাড়ল না, তখন আমেরিকান যুবক কৌতূহলী হয়ে উঠল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মানুষটার দিকে। চেহারাটা দেখে থমকে গেল সে, নাঁড়িয়ে পড়ল—দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটেছে।

‘দৈব অভিজ্ঞতা হচ্ছে নাকি?’ সকৌতুকে বলল আমেরিকান যুবক। ‘ধর্মীয় স্তরে এতই উন্নতি হয়েছে যে, মৃত মানুষ হাজির হচ্ছে আমার সামনে?’

‘কেন, দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না?’ ভুরু নাচাল দ্বিতীয় যুবক।

‘চোখের দেখাই শেষ কথা নয়, মি. রানা। আমাদের বাইবেলের কতটুকু পড়েছেন, জানি না; তবে সেইন্ট টমাস কিন্ত্র যিশু খ্রিস্টের বুদ্ধির ক্ষতের উপর হাত না রাখা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করেননি।’

‘গল্পটা জানা আছে আমার,’ হাসল রানা। ‘তবে মাই ডিয়ার এরিক, আমি যিশু খ্রিস্ট বা মৃত মানুষ... কোনোটাই নই। তা ছাড়া দেখাবার মত ক্ষত-টতও নেই আমার গায়ে।’

এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের মুখেও এবার পাল্টা হাসি দেখা দিল। ছ'মাস হলো ওয়াশিংটনে ব্যুরো হেডকোয়ার্টারে বদলি হয়ে এসেছে ও, এর মধ্যে দুজনের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কুশল বিনিময়ের ভঙ্গিতে বলল, ‘কেমন আছেন, মি. রানা?’

‘ভাল। তোমার ওই মিস্টার ডাকার স্বভাবটা এখনও যায়নি দেখছি।’

‘আগেই বলেছি, গুরুকে সম্মান না দেখিয়ে থাকতে পারব না আমি।’

‘তা অবশ্য বলেছ।’ পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল রানা। দৌড়ানোর সময় ঝাঁকি খাওয়ায় আহত বাম কাঁধটা ব্যথা করছে, হালকা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওটা সয়ে নেয়ার প্রয়াস চালাল।

‘হঠাৎ করে কোথেকে উদয় হয়েছেন, বলুন তো?’ জিজ্ঞেস করল এরিক। ‘আমি তো শুনেছি, আপনি নিখোঁজ হয়েছেন। অনেকের ধারণা, মারা গেছেন।’

‘গুজবে কান দিয়ো না। এ-সব উড়ো কথা কে শুনিয়েছে তোমাকে?’

‘আপনার এজেন্সি থেকেই বলেছে। একটা কাজে যোগাযোগ করেছিলাম, ওরা বলল—চারজন এজেন্ট আর একজন ক্লায়েন্টসহ আপনি উধাও হয়ে গেছেন। আপনাদের একটা সেফ-সাইট ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি অবশ্য তেমন উদ্বিগ্ন হইনি। বেড়ালের মত আপনারও যে ন’টা প্রাণ—তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।’

‘হঁ। ক্লায়েন্ট বা সেফ-সাইটের ব্যাপারে ওরা কিছু বলে দেয়নি তো?’

‘নাহ্,’ এরিক মাথা নাড়ল। ‘আপনার লোকজন মুখে তালা ঐটে রাখায় ওস্তাদ। আমি বলে ওটুকু জানিয়েছে, অন্য কেউ হলে তা-ও বলত বলে মনে হয় না। আমাকে অবশ্য জিজ্ঞেস করেছে, পুরো ঘটনাটা সম্পর্কে কিছু শুনেছি কি না।’

‘শুনেছ?’

‘উঁহঁ। কানাঘুষোও না।’

ধীর পায়ে হেঁটে পার্কের জলাশয়ের পাশে চলে এল ওরা,

একটা বেঞ্চ দখল করে বসল। এরিক বলল, 'কী ঘটেছে, খুলে বলবেন আমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বলব বলেই এসেছি। তোমার সাহায্যও দরকার। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। পারবে তো?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন আমাকে করা উচিত হচ্ছে না আপনার,' আহত সুরে বলল এরিক।

প্রশ্নটা অবান্তরই বটে। এরিক স্টার্ন রানার পরীক্ষিত বন্ধুদের একজন। বছরদুয়েক আগে নিউ অর্লিয়েন্সে একটা জনসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, আর গুপ্তঘাতক বলে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় রানাকে। পুরোটাই ছিল ষড়যন্ত্র, র্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা গোপন অঙ্গ-সংগঠন নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘটায় কাণ্ডটা। ওদের ছড়িয়ে রাখা মিথ্যে সূত্র দেখে আমেরিকার প্রতিটা নিরাপত্তা-বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত রানার শত্রু হয়ে পড়েছিল, মরতে বসেছিল ও। ষড়যন্ত্রের জাল ছেঁড়া স্রেফ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনই ওর সাহায্যে এগিয়ে আসে এই এরিক। নিজের চাকরি, এমনকী জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে রানাকে সাহায্য করে সে... কোনোরকম প্রতিদানের আশা না করে। ওর কারণেই শেষ পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সমর্থ হয় রানা, শত্রুদের বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নিতে পারে। এমন একজন বন্ধুকে অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই।

'সরি,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল রানা। 'মুখ ফসকে বলে ফেলেছি কথাটা। কিছু মনে করো না।'

'ইটস্ ওকে,' বলল এরিক। 'কী গোপন রাখতে হবে, সেটা বলুন। অবৈধ কিছু?'

'তা না, শুনলেই বুঝবে। আর হ্যাঁ, আমার ব্যাপারে

যে-গুজবটা শুনেছ, সেটাকে সত্যি দেখাতে হবে। মানে, আজ... এখানে আমাকে দেখোনি তুমি। আমাদের মধ্যে কোনও কথাও হয়নি। তুমি যদূর জানো, আমি মারা গেছি। ঠিক আছে?’

‘পরীক্ষার। আপনার বাকি চার এজেন্টের খবর কী? ওরাও কি গা-ঢাকা দিয়ে আছে?’

‘উঁহু, ওদেরকে দেখতে চাইলে সত্যিই দৈবদৃষ্টি প্রয়োজন হবে তোমার।’

‘মারা গেছে?’ ভুরু কৌচকাল এরিক।

‘খুন হয়েছে,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা। ‘নৃশংসভাবে।’

‘বলেন কী!’ আঁতকে উঠল এরিক। ‘চিনি ওদের?’

‘হ্যাঁ। মনসুরের টিম।’

‘গুড গড! ওদের সঙ্গে তো কয়েকবারই দেখা হয়েছে আমার। খুবই ভাল ছিল ওরা সবাই... দক্ষ, দুঃসাহসী। আর আপনার ক্লায়েন্ট? সে-ও মারা পড়েছে নাকি?’

‘সমস্যাটা ওকে নিয়েই,’ তিক্ত গলায় বলল রানা। ‘ওর জন্যেই খুন হয়েছে সবাই।’

‘মানে!’ এরিক বুঝতে পারছে না।

‘লোকটা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মারুফকে কিচেন নাইফ দিয়ে, আর মনসুরকে গুলি করে খুন করেছে। ওর কারণে রকেট বিস্ফোরণে উড়ে গেছে রফিক আর শাহরিয়ার। আমাকেও আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল শয়তানটা।’

‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না,’ এরিক বিভ্রান্ত। ‘মনসুরের টিম সম্পর্কে জানা আছে আমার—ওরা তো স্পেশাল প্রোটেকটিভ কেস হ্যাণ্ডেল করে। আপনি বলতে চাইছেন, যাকে প্রোটেকশন দেয়া হচ্ছিল, সেই ক্লায়েন্টই ওদেরকে খুন করেছে?’

‘একজ্যাস্টিলি।’

‘কিন্তু কেন?’

‘আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর কাছে। তাই গোপনে নিজের শত্রুদেরকে খবর দিয়ে, একটা অ্যাসল্ট টিম আনায় সে। সেফ-সাইটের উপর যখন হামলা চলছিল, সেই ফাঁকে খুন-খারাপি করে নিরাপদে সটকে পড়েছে। আমার ধারণা, হামলাতে সে নিজেও মারা পড়েছে বলে প্রচার করার জন্য কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।’

‘এ-ধরনের লোকের জন্য নরকে আলাদা জায়গা বরাদ্দ করা আছে,’ রাগী গলায় বলল এরিক। ‘হারামজাদার নামটা জানতে পারি?’

‘ড. আন্দালিব সিদ্দিকী।’

‘নাম শুনিনি কখনও।’

‘অবাক হবার কিছু নেই। তোমাদের সরকারের হয়ে গবেষণার কাজ করত সিদ্দিকী... গোপন গবেষণা! তাকে সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হত।’

‘হুম! কোন ডিপার্টমেন্টের হয়ে কাজ করত, এটা জানেন?’

‘শিয়োর না। তবে ও বলেছে, পালিয়ে আসবার আগে ডি.ই.এ.-র হয়ে এলিস্থিয়ার নামে একটা বায়ো-ল্যাবে গবেষণা করছিল—ওষুধের মাধ্যমে মাদকাসক্তি সারাবার জন্যে। কিন্তু প্রজেক্টটা ব্যাকফায়ার করে—এমন একটা ওষুধ ও আবিষ্কার করে বসে, যেটা তাৎক্ষণিকভাবে যে-কাউকে অ্যাডিক্টেড করে তুলতে পারে। খুবই পাওয়ারফুল ড্রাগ।’

ভুরু কঁচকাল এরিক। ‘আমি ডি.ই.এ.-র সঙ্গে প্রায়ই কাজ করি; এ-ধরনের কোনও ঘটনা শুনিনি তো!’

‘ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে,’ রানা বলল। ‘কিন্তু যেভাবেই হোক, খবরটা চলে গেছে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিণ্ডয়েল সান্টানার কাছে। নতুন ড্রাগটার জন্য সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালায় সে। ডি.ই.এ. কিংবা আমেরিকান সরকারের কাউকে

বিশ্বাস করতে পারছিল না সিদ্দিকী, তাই আমাদের কাছে এসেছিল প্রোটেকশনের জন্য...’

‘জাস্ট আ মিনিট, মি. রানা,’ বাধা দিয়ে বলল এরিক ‘সান্টানার ব্যাপারে জানি আমি—দু’মাস আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে খুন হয়েছে। ওর পুরো কার্টেলেরই এখন ছন্নছাড়া অবস্থা, কারও পিছনে লাগবার সময় নেই ওদের। আপনার ওই সিদ্দিকী একটা ফাঁপা গল্প গিলিয়েছে আপনাকে।’

রানা থমকে গেল—তথ্যটা একেবারেই নতুন। জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি শিয়োর?’

‘হানড্রেড পার্সেন্ট, এতে কোনও ভুল নেই। কলাম্বিয়ায় আমাদের আগরকাভার এজেন্টরা লার্শের ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া আপনি বলছেন অ্যাসল্ট টিমের কথা। সান্টানার ওই কোমরভাঙা আউটফিটের পক্ষে আমেরিকায় কোনও অ্যাসল্ট টিম পাঠানো সম্ভব নয়।’

‘ওটা আরেকটা পক্ষ বলে সন্দেহ করছি আমি,’ রানা বলল। ‘স্পেশাল ফোর্সের মত আচরণ করছিল ওরা।’

‘আমেরিকান?’ এরিকের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না,’ এরিক বোকা বনে গেছে। ‘এসবের মধ্যে আমাদের মিলিটারি কেন জড়িত হবে?’

‘ওয়েল এরিক,’ বলল রানা। ‘সেটা জানার জন্যই তোমার সাহায্য চাই আমি।’

দু’দিন পর। বিকেল বেলা।

একটা শপিং মলের সামনে গাড়ি থামাল সোহানা। ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ করল না, শুধু আইডলে রাখল—বিপদ দেখা দিলে মুহূর্তেই সরে পড়তে পারবে। গাড়ি থেকে নেমে মলের বাইরের

পে-ফোনের দিকে এগোল রানা, স্লটে পয়সা ফেলে নির্ধারিত নাম্বারে ডায়াল করল।

তিনবার রিং হতেই রিসিভ করা হলো কলটা। ওপাশে শোনা গেল এরিকের পরিচিত কণ্ঠ, ‘হ্যালো?’

‘পিকিং ডাক রেসটুরেন্ট থেকে বলছি, সার,’ চিনা উচ্চারণে বলল রানা। ‘আপনি কি একশো ছাব্বিশ ডলারের একটা হোম-ডেলিভারির জন্য অর্ডার দিয়েছেন?’

‘মাথা খারাপ?’ বিরক্ত গলায় বলল এরিক। ‘তোমাদের ওসব চাইনিজ খাবার একেবারেই সহ্য হয় না আমার। কী সব মশলা দাও, রীতিমত বুক জ্বলে।’

‘সরি, সার,’ বলল রানা। পূর্ব-নির্ধারিত কোড বিনিময় হয়ে গেছে, এবার কাজের কথা পাড়ল ও। স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ‘খবর কী?’

‘অনেক খোঁজখবর নিয়েছি। কিন্তু আপনার ওই ড. সিদ্দিকী, কিংবা ডি.ই.এ.-র হয়ে তার ড্রাগ-রিসার্চ সম্পর্কে কোনও সত্যতা পাইনি। সত্যি কথা বলতে কী, এ-ধরনের রিসার্চ-ওয়ার্ক ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আওতায় পড়ে না। ওসবের দায়িত্ব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ হেলথের।’

‘ওখানে খোঁজ নিতে বলছ?’

‘উঁহু, খোঁজ আমি নিয়ে ফেলেছি। ফলাফল—লবডঙ্কা!’

‘তা হলে? কোনও সাজেশন আছে তোমার?’

‘গো টু দ্য সোর্স, মি. রানা। ড. সিদ্দিকীর ল্যাবে খোঁজ নিন।’

‘এলিক্সিয়ার বায়ো-ল্যাব? কাল সারাদিন আমি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে কাটিয়েছি। বইপত্র বা ইন্টারনেট... কোথাও ল্যাবটার নামগন্ধ খুঁজে পাইনি।’

‘আমি অন্যভাবে খুঁজেছি,’ এরিক বলল। ‘পেয়েও গেছি। তবে ল্যাবটা আসলে কী ধরনের কাজ করে, সেটা জানতে

পারিনি ।’

‘কোথায় ওটা?’

‘ভার্জিনিয়ায় । বেইলি’জ রিজ নামে একটা জায়গায় ।’

‘পুরো ঠিকানা বলো ।’

বলল এরিক । শেষে যোগ করল, ‘সরি, এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারলাম না ।’

‘যা করেছে, যথেষ্ট,’ রানা বলল । ‘ধন্যবাদ । তোমার জন্য চাইনিজ খাবারটা পাঠিয়ে দেব ।’

‘মাফ করুন, গুরু । বুক জ্বলার কথাটা বানিয়ে বলিনি । আসলেই সহ্য হয় না ।’

‘কী আর করা! ঠিক আছে, কাল আবার কথা হবে । ঠিক এই সময়ে । আশা করি ভেরিফিকেশনের জন্য তখন নতুন কিছু তথ্য দিতে পারব ।’

‘আমি অপেক্ষা করব ।’

‘বাই ।’ ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এল গাড়িতে ।

‘কিছু জানতে পারলে?’ জিজ্ঞেস করল সোহানা ।

‘হ্যাঁ,’ তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা । ‘এরিক যখন কথা বলছিল, তখন কেউ একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিল ওর মাথায় । জলদি গাড়ি ছাড়ো, আমাদের খোঁজে খুব শীঘ্রি অন্তত এক ডজন লোক চলে আসবে এখানটায়!’

ছয়

‘আমাদের মধ্যে একটা প্রি-অ্যারেঞ্জড কোড আছে,’ রানা বলল। ‘টেলিফোনে খোলাখুলিভাবে কথা বলা কতটা নিরাপদ, সেটা জানার জন্য ফোনের শুরুতে চাইনিজ খাবার নিয়ে আলোচনা করি আমরা। যদি চাইনিজ খেতে আপত্তি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে—সব ঠিকঠাক আছে। আর যদি কোথাও সমস্যা থাকে, আমাদের মধ্যে কেউ বিপদে থাকি... তা হলে রাজি হই না, বুক জ্বলার অজুহাত দেখাই।’

দ্রুতগতিতে ছুটছে টরাস, পিছনে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে রানা। বোঝার চেষ্টা করছে, কেউ অনুসরণ করছে কি না। তবে এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আভাস পাওয়া যায়নি।

সোহানা জিজ্ঞেস করল, ‘কী বলেছে এরিক?’

‘সিদ্ধিকীর ল্যাবের লোকেশন দিল। ভুয়া হবারই সম্ভাবনা বেশি। আমার ধারণা, ওটা একটা ফাঁদ।’

‘জোর করে বলানো হয়েছে, তাই না?’

‘কোনও সন্দেহ নেই,’ চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠেছে রানার। এরিকের মত অকৃত্রিম বন্ধু বিপদে পড়েছে... ওর-ই কারণে। ‘ওকে সাহায্য করতে হবে আমাদের।’

‘রানা,’ ইতস্তত করে বলল সোহানা। ‘তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ফোনটুকুর পর ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওকে এবার ওরা...’

‘না,’ দৃঢ় গলায় বলল রানা। ‘আমাকে বাগে পাবার আগ পর্যন্ত ওকে প্রয়োজন হবে ওদের। সেজন্যেই একটা কৌশল খাটিয়েছি—এরিককে বলেছি, আগামীকাল আবার ফোন করব আমি... একই সময়ে। ফাঁদটা কাজ না-ও করতে পারে, কাজেই আমাকে পাবার জন্য এরিককে এখন বাঁচিয়ে রাখবে ওরা... অন্তত আগামীকাল পর্যন্ত।’

‘এর তিতর ওকে আমরা উদ্ধার করব?’

‘দ্যাটস্ দ্য প্ল্যান,’ মাথা ঝাঁকাল রানা।

হঠাৎ করেই চেহারাটা মলিন হয়ে গেল সোহানার। পরিবর্তনটা চোখে পড়বার মত। নার্সাস তক্তিতে প্যাণ্টে হাত মুহল ও, তালুদুটো ঘেমে উঠেছে। নীচের ঠোঁটটাও জিত দিয়ে তেজাল একবার। তুরু কুঁচকে ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা। জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’

‘কই... কিছু না তো,’ এড়িয়ে যেতে চাইল সোহানা।

‘কিছু একটা তো বটেই,’ রানা বলল। ‘আমার কাছে নুন্সিগো না, সোহানা। কী হয়েছে, বলে বলো।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। রানার দিকে তাকাল এক পলক, তারপর আবার রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ‘আমার ভয় করছে, রানা।’

‘স্বাভাবিক,’ রানা বলল। ‘শত্রু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমাদের। এরিককে কারা আটকে রেখেছে, ওকে উদ্ধার করতে গেলে কী ধরনের বিপদ মোকাবেলা হবে—কিছুই জানি না। অনিশ্চয়তা মানুষের মনে ভয়ের জন্ম দেয়।’

‘এ-ভয়টা আরও সিরিয়াস,’ রানা। ‘সেদিন অন্তরার বাড়িতে যে একম ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক সে-একম ভয় পাচ্ছি এখন আবার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে...’

দৃষ্টিভ্রা ভর করল রানার তিতরে। মাকে কদিন বেশ

স্বাভাবিক দেখাছিল সোহানাকে, তবে এর মধ্যে তেমন কোনও বিপদ মোকাবেলা করতে হয়নি ওদের। আজ একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির আভাস পাওয়ামাত্র আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ও—ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বিসিআই-এর একজন অভিজ্ঞ এজেন্টের সঙ্গে আচরণটা একেবারেই খাপ খায় না। সেদিন ভেবেছিল, সমস্যাটা সাময়িক; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধারণাট ভুল।

‘কী হয়েছে তোমার, সোহানা?’ নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

‘আমি জানি না, রানা,’ সোহানা মাথা দোলাল। ‘অন্তরাঃ বাড়িতে কিছু একটা ঘটে গেছে আমার ভিতর। ওর লাশ, আগুন গোলাগুলি... সবকিছু এমনভাবে মনের পর্দায় গঁথে গেছে যে, চোখ বুজলেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো দেখতে পাই। মন কু-ডাক ডাকতে শুরু করে, বিচারবুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না। সাহস-আত্মবিশ্বাস... সব নড়বড়ে করে ফেলে। এই যে, এখন আবার এরিককে উদ্ধার করার কথা বললে... ওটা শুনতেই আবার নার্ভাস ফিল করছি আমি।’

‘শান্ত হও। সেদিন সত্যিই মস্ত বিপদে পড়েছিলাম আমরা, তাতেই হয়তো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছ... আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে।’

‘এসব আমার জন্য নতুন কিছু নয়, তুমি সেটা ভাল করেই জানো। আমি কখনও বিপদে নিয়ন্ত্রণ হারাই না। ওভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। সেদিন কেন এমন হলো, সেটা বলতে পারো?’

ধারণা করতে পারছে রানা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। যতই ট্রেনিং দেয়া হোক, প্রত্যেক মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। ভাবতে ভাল লাগছে না, কিন্তু হয়তো এটাই তিক্ত

সত্য—সোহানা সেই সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। বিপদের আভাস পেতেই স্নায়ুর বিশ্বাসঘাতকতা সেটাই প্রমাণ করে। মানেরটা পরিষ্কার—ওর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে, স্পাইয়ের বিপজ্জনক পেশা আর ধরে রাখা সম্ভব নয় সোহানার পক্ষে।

‘আমার মনে হয়, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন,’ গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল রানা। ‘এরিকের ওখানে তোমার না-গেলেও চলবে। আমি একাই সামলে নেব ব্যাপারটা।’

‘না!’ দৃঢ় গলায় বলল সোহানা। ‘যত ভয়ই করুক, তোমাকে আমি একা যেতে দেব না, রানা। একজন এফবিআই এজেন্টকে আটকে রাখার মত দুঃসাহস যাদের আছে, তারা সাধারণ কেউ না। একা গেলে নির্ঘাত তুমি বিপদে পড়বে।’

‘কিন্তু...’

‘কোনও কিন্তু নয়। সমস্যাটা আমার, সেজন্যে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। তা ছাড়া হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ব্যাপারটার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। বিপদকে মোকাবেলা করতে হবে আমাকে, একমাত্র ওভাবেই আবার সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।’

‘কাজটা সহজ নয়, সোহানা। লড়াইয়ের মাঝখানে তুমি অচল হয়ে পড়লে ঝামেলা বাড়বে আমার। শুধু এরিককে নয়, তোমাকেও উদ্ধার করে আনতে হবে।’

জোর করে একটু হাসল সোহানা। ‘ভয় পেয়ো না, অন্তত তোমার ঘাড়ের বোঝা হব না—এটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বুঝতে পারছে—সোহানাকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজ বাড়ল ওর।

‘কেউ কি ফলো করছে আমাদের?’ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা ঘুরিয়ে পিছে তাকাল রানা। ‘না।’

‘ওড । কোথায় যাব তা হলে?’

‘মিউনিসিপ্যাল পার্ক । এরিকের বাসাটা পাশেই । ওখানেই
ওকে বন্দি করে রেখেছে ওরা ।’

‘রিস্কি স্টেপ—একজন একবিআই এজেন্টকে তার বাড়িতেই
আটকে রাখা । তুমি শিয়োর?’

‘বাসায় ফোন করেছিলাম ওকে, রিসিত তো করল । ওখানেই
আছে ।’

‘কলটা ফরোয়ার্ড করে রাখা হতে পারে ।’

‘আমার তা মনে হয় না ।’ এরিক একা মানুষ, বউ মারা যাবার
পর আর বিয়ে-শাদী করেনি । সামাজিকতাও করে না খুব একটা ।
বাসাতে ওকে আটকে রাখলে তেমন অসুবিধে নেই, ওষু অফিসে
একটা খবর পাঠাতে হবে যে, ও অসুস্থ । তা হলেই আর কেউ
মাথা ঘামাবে না । আমি শিয়োর—ও বাড়িতেই আছে ।’

সন্ধ্যা নেমে এসেছে । পার্কিং গ্যারাজে গাড়ি রেখে মিউনিসিপ্যাল
পার্কে ঢুকল রানা-সোহানা, নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়ায়ে ধরে চলে
গেল উদ্ভবদিকের সীমানায় । গাছগাছালির ছায়ায় পৌঁছে খামল
ওরা, সাবধানে উঁকি দিল । ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে
আছে একটা ‘বহতল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, ওটার দিকে নজর
ওদের ।

‘ছ’তলা,’ বলল রানা । ‘ডানদিকে চার নাম্বার ইউনিটটা
এরিকের ।’

ওদিকে তাকাল সোহানা । বলল, ‘একটা মাত্র জানালার
আলো দেখতে পাচ্ছি ।’

‘ওটা লিভিংরুম,’ রানা জানাল । ‘পার্কের দৃশ্য দেখতে পছন্দ
করে এরিক ।’

‘আজ দেখছে না । জানালার পর্দা টানা । পাশে আরেকটা

জানালা আছে অবশ্য...

‘বেডরুম। তবে আলো জ্বলছে না।’

‘ওটারও পর্দা টানা। আর কোনও বেডরুম আছে?’

‘না, ওই একটাই। গেস্টরুমও নেই।’

‘রুমগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট বলতে পারবে?’

‘হ্যাঁ, একবার গেছি ওখানে,’ রানা বলল। ‘মেইন ডোর পেরুলেই একটা করিডোর—চলে গেছে একেবারে ভিতর পর্যন্ত। করিডোরের শেষ মাথায় একটা আর্চওয়ে আছে—বামদিকে ছোট্ট কিচেন, ডানদিকটায় লিভিংরুম। বেডরুমের দরজা লিভিংরুমের বামদিকের দেয়ালে।’

‘বাথরুম?’

‘বেডরুমের ভিতরে, আউটার সাইডে।’

‘হুম, লুকানোর খুব বেশি জায়গা নেই তা হলে।’

‘ঠিক ধরেছ।’

পর্দার আড়ালে নড়াচড়া দেখতে পেল রানা, একটা ছায়া সরে গেল যেন।

‘ক’জন থাকতে পারে ওখানে?’ আনমনে প্রশ্ন ছুঁড়ল সোহানা।

‘কমপক্ষে দু’জন,’ রানা বলল। ‘যাতে পালা করে একজন পাহারা দিতে আর অন্যজন ঘুমাতে পারে।’

‘বেশিও তো হতে পারে!’

‘সর্বোচ্চ তিনজন,’ প্রফেশনাল দৃষ্টিতে বিচার করল রানা। ‘অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট, খুব বেশি মানুষ থাকলে পড়শিরা টের পেয়ে যাবে।’

‘হুঁ। এরিককে কোথায় রেখেছে, সেটা বুঝতে পারলে সুবিধে হত।’

‘আমি হলে লিভিংরুমে রাখতাম—চেয়ারে হাত-পা বেঁধে,’ এগল রানা। ‘বেডরুমটা তা হলে নিজের মত পেতাম, পালা করে

ঘুমানোয় সুবিধে হত ।’

‘ধরে নিচ্ছি, ওরাও তা-ই করেছে,’ বলল সোহানা, তারপর তাঁকাল রানার দিকে । ‘একটা প্ল্যান দরকার আমাদের—কীভাবে এরিককে বের করে আনবে বলে ভাবছ তুমি?’

রানা জবাব দেবার আগেই এক দম্পতিকে বিল্ডিংয়ের দিকে এগোতে দেখা গেল । ভিতরে ঢুকে লবিতে চলে গেল তারা, রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলল । লোকটা ইন্টারকমের রিসিভার তুলে ডায়াল করল, সম্ভবত অনুমতি নিচ্ছে । একটু পরেই সম্ভষ্ট হলো সে, কাউন্টারের তলায় হাত দিয়ে একটা বোতাম চাপল, বিল্ডিং টোকর ইনার-ডোর খুলে গেল তাতে । পাশাপাশি দুটো এলিভেটর দেখা গেল দরজার ওপাশে, রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকে চলে গেল দম্পতি, পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল কাঁচের দরজাটা ।

লবিতে টোকর দরজাটাও কাঁচের, ওটার ভিতর দিয়ে পুরো প্রক্ৰিয়াটাই প্রত্যক্ষ করল ওরা । সোহানা ভুরু কুঁচকে বলল, ‘বের হওয়া তো পরের কথা, বিল্ডিং টোকাটাই তো বিরাট ঝঙ্কি মনে হচ্ছে । অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয় না রিসেপশনিস্ট ।’

‘হ্যাঁ, সমস্যাই বটে,’ বলল রানা । মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে ওর । ‘বিকল্প রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদেরকে ।’

‘ইমার্জেন্সি একজিটের কথা ভাবছ?’

মাথা ঝাঁকাল রানা । ‘আইন অনুসারে প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের পিছনে একটা থাকার কথা । তালা দেয়া থাকে, তবে খুলতে অসুবিধে হবে না । ওটাই ব্যবহার করতে পারব আমরা ।’

‘ব্যস্ত এলাকা,’ চিন্তিত গলায় বলল সোহানা । ‘তালা ভাঙতে গেলে লোকে দেখে ফেলবে ।’

‘ঠিক বলেছ, অন্য কোনও কায়দা বের করতে হবে তা হলে,’

একটু ভাবল রানা। ‘অভিনয় কেমন পারো?’

‘মন্দ না। কোর্সে সেকেণ্ড হায়েস্ট মার্ক পেয়েছিলাম।’

‘ভাল। মোড়ে একটা দোকান দেখতে পাচ্ছি। চলো, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।’

‘তুমি সিগারেট ছাড়োনি?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোহানা।

‘ধরি-ছাড়ি... এভাবেই চলছে। তবে আজকেরটা স্রেফ মিশনের স্বার্থে। তোমাকেও টানতে হবে।’

‘আমি নন-স্মোকার,’ মনে করিয়ে দিল সোহানা।

‘কিছু করার নেই,’ রানা হাসল। ‘আধঘণ্টার জন্য তোমাকে ধূমপায়ী-সমাজে যোগ দিতে হবে।’

বিল্ডিংয়ের সামনে, এন্ট্র্যান্সের ঠিক উল্টোপাশে, পার্কের সীমানায় একটা বেঞ্চ আছে। ওটায় গিয়ে বসল রানা-সোহানা, সদ্য-কেনা সিগারেটের প্যাকেট খুলল। একটা বাড়িয়ে ধরে রানা বলল, ‘নাও।’

‘সত্যি সত্যি সিগারেট খাব?’ সোহানার কণ্ঠে অস্বস্তি।

‘খাওয়ার দরকার নেই, টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ো শুধু, ভিতরে নিয়ো না।’

‘দরকার আছে কোনও?’

‘অবশ্যই!’ সোহানার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল রানা, নিজেও একটা ধরাল। ‘বিল্ডিংয়ের সামনে কিছুক্ষণ থাকতে হবে, এটা আমাদের কাভার। দেখে মনে হবে, কারও বাসায় বেড়াতে এসেছি আমরা; ওখানে সিগারেট খাওয়া যাচ্ছে না বলে নীচে নেমে এসেছি।’

সিগারেটে একটা টান দিয়েই খক খক করে কেশে উঠল সোহানা। ‘কী বিচ্ছিরি স্বাদ!’

‘সাবধান! আনাড়ির মত কোরো না, লোকে সন্দেহ করে।’

বসবে।’

‘কিন্তু এভাবে অপেক্ষা করে ছাই কী লাভ হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।’

‘অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে।’

পাঁচ মিনিট কাটল। পথ-চলতি মানুষজনের কথোপকথনের দিকে কান পেতে রেখেছে রানা। ‘অফিস নিয়ে আলোচনা করছে কেউ কেউ, কারও চিন্তাভাবনা আবার খাওয়াদাওয়া নিয়ে, কেউ বা ব্যস্ত ছুটি কাটাবার প্ল্যান নিয়ে, মহিলারা আলোচনা করছে লেটেস্ট ফ্যাশন নিয়ে... তবে এসবের কোনোটাতেই আগ্রহ পেল না ও।

হাতে আগুনের ছাঁকা লাগতেই সিগারেটের গোড়াটা ফেলে দিল রানা। প্যাকেট খুলে নতুন একটা ধরাল, সোহানার দিকেও বাড়িয়ে ধরল আরেকটা।

‘অসুস্থ হয়ে যাব,’ অনুযোগ করল সোহানা।

‘আমি নিরুপায়,’ রানা বলল। ‘আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে।’

কয়েক মিনিট পরেই দুটো ট্যাক্সি এসে থামল বিল্ডিংয়ের সামনে, চমৎকার সান্ধ্য-পোশাক পরা চারজন নারী-পুরুষ নামল ওগুলো থেকে। একজনের হাতে একটা উপহারের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে।

হাতঘড়ি দেখল একটি মেয়ে। ত্রস্ত গলায় বলল, ‘ওহ্ গড! আটটা তো বেজে গেল প্রায়। লরা বলেছে, আটটা-পাঁচে শেষ হবে সিনেমা; তারপর জেরিকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসবে ও। আমাদের হাতে একদম সময় নেই।’

‘ডিনারে যাবে না ওরা?’ জিজ্ঞেস করল এক পুরুষ।

‘উঁহ্, শরীর খারাপের অজুহাত দেখাবে লরা। জলদি চলো, আমাদের চাবি দিয়ে রেখেছে ও, অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ওঁৎ পেতে

বসে থাকতে হবে। জেরি ঢোকামাত্র চমকে দেব একেবারে।’

নবিতে ঢুকে পড়ল ছোট্ট দলটা, রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে চলে গেল এলিভেটরের দিকে। গম্ভীর হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রানা।

‘ওই জেরির জন্মদিন বোধহয়,’ সোহানা বলল। ‘সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছে ওরা... আমেরিকানদের ঐতিহ্য।’

‘হুঁ,’ আনমনে বলল রানা। কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ও, এলিভেটরে ঢুকতে দেখল চার অতিথিকে, ইঞ্জিকটরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল এবার। এতদূর থেকে নম্বর পড়া যায় না, তাই আলোটা ক’বার ফ্ল্যাশ করে, সেটা হিসেব করল। উনিশ তলায় গিয়ে থামল এলিভেটর—ওখানেই সম্ভবত জেরির অ্যাপার্টমেন্ট।

সিগারেট শেষ হতেই একটা পিৎজা-ভ্যান নজরে পড়ল রানার, বিল্ডিংয়ের ডেলিভারি-জোনে এসে পার্ক করেছে। উঠে দাঁড়াল ও, সোহানাকে বলল, ‘এসো, খাবারটা কোথায় যাচ্ছে—জানতে হবে।’

রাস্তা পেরুল ওরা, ডেলিভারি-ম্যানের পথরোধ করে দাঁড়াল এন্ট্র্যান্সের মুখে।

‘এক্সকিউজ মি!’ বলল রানা। ‘এগুলো সম্ভবত আমাদের জন্যে। অর্ডার দিয়ে নীচে এসেছি সিগারেট খেতে। অ্যাপার্টমেন্ট সিক্স-টু-এইট,’ এরিকের অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ওটা।

ভুরু কোঁচকাল ডেলিভারি-ম্যান। ‘দুঃখিত। এগুলো আপনার নয়। অন্য অ্যাপার্টমেন্টের।’

চেহরায় হতাশা ফোটাল রানা। ‘নিশ্চয়ই সাততলার ওই বজ্জাত ছোকরাগুলোর। পার্টি দিচ্ছে বোধহয় ওরা। এত শব্দ করছে যে, ছ’তলাতেও টেকার উপায় নেই।’

‘জী না,’ চেহারা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ডেলিভারি-ম্যানের। পিৎজার প্যাকেটের উপর লাগানো নোট

দেখল। ‘এগুলো যাবে উনিশ তলায়... ওয়ান-নাইন-ওয়ান-ওয়ানে।’

‘অ!’ পিছিয়ে গেল রানা। ‘দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আসলে বেশ খিদে পেয়েছে কি না, তাই পিৎজা দেখেই মনে হলো আমাদেরটা হবে।’

‘ইটস্ ওকে,’ হাসল ডেলিভারি-ম্যান। ‘আপনাদেরটাও তাড়াতাড়ি এসে যাবে। জাস্ট রিল্যাক্স।’ দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে পড়ল সে।

এন্ট্রান্স ছেড়ে একটু দূরে সরে এল রানা। সোহানা জিজ্ঞেস করল, ‘কী করছ, জানতে পারি? তোমার কেন মনে হলো, ওগুলো এরিকের অ্যাপার্টমেন্টে যাবে?’

‘মানব-চরিত্রের কারণে,’ আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। ‘পাক্সা প্রফেশনালরাও মাঝে-মাঝে এ-ধরনের ভুল করে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাউকে পাহারা দেয়া সহজ কাজ নয়—ক্লান্তি আসে, খিদে পায়। সিকিউরিটির কাজে যারা ব্যস্ত থাকে, তাদের রান্না করে খাওয়ার মত সময় বা ধৈর্য... কোনোটাই থাকে না। প্রায়ই দেখা যায়, বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে খাবার আনায় তারা।’

‘বুঝলাম, কিন্তু এখনই যে ওদের খাবার আসবে—সেটা জানছ কীভাবে?’

হাতঘড়ি দেখাল রানা। ‘ডিনার টাইম। এখন ওদের খাওয়ার সময়।’

‘বুঝলাম, কিন্তু এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? রিসেপশনিস্ট লোকটা সন্দেহ করে বসতে পারে।’

‘ও আমাদের দেখতে পাবে না। দরজা থেকে দূরে দাঁড়াব আমরা। তা ছাড়া বাইরের চেয়ে লবিটা বেশি আলোকিত। দরজার কাঁচে ভিতরের আলোটা প্রতিফলিত হচ্ছে—আয়নার মত

‘হয়ে গেছে এখন ওটা। দরজা বরাবর আমরা একটু দূরে দাঁড়ালেই ওর চোখে অদৃশ্য হয়ে যাব।’

‘কিন্তু একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে!’ আঙুল তুলে এন্ট্র্যান্সের উপর লাগানো ক্যামেরা দেখাল সোহানা।

‘দেখেছি,’ রানা বলল। ‘খুবই লো-গ্রেড জিনিস। ফিক্সড অ্যাপারেটাস, ঘুরতে পারে না। লাইন অভ সাইট শুধু দরজা বরাবর সামনের দিকে। পাশ থেকে আমরা দেয়াল ঘেঁষে গেলেই ওটায় আর দেখা যাবে না।’

‘বিল্ডিংটার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট তো দেখছি খুবই ঠুনকো,’ মন্তব্য করল সোহানা। ‘ক্যামেরাটা থেকেও নেই। একজন মাত্র রিসেপশনিস্ট, আলাদা গার্ড নেই। ওকে কারু করে ভিতরে ঢোকা তো কোনও ব্যাপারই নয়।’

‘মন্দ লোকের জন্য,’ যোগ করল রানা। ‘আমরা ওভাবে ঢুকব না। তবে সিকিউরিটির যে যেন-তেন অবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। এরিককে বলতে হবে, আগামীতে যেন আরও সিকিউর্ড কোনও বাসায় ওঠে।’

‘এমনভাবে বলছ যেন ওকে উদ্ধার করে আনাটা কোনও ব্যাপারই না!’

‘কঠিন ভাবলেই কঠিন। সহজ ভাবলে সহজ।’

‘শুনে খুশি হলাম।’

আরেকটা ভ্যান এসে থামল ডেলিভারি জোনে। এটা পিৎজা হাট-এর। রানা এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সোহানা থামাল ওকে। বলল, ‘এবার আম্মাকে সামলাতে দাও।’

মাঝারি সাইজের দুটো পিৎজার বাক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে ডেলিভারি-ম্যান, তার সামনে গিয়ে ভুবনমোহিনী হাসি দিল ও। বলল, ‘হাই! কষ্ট করে আর উপরে যেতে হবে না, আমিই নিয়ে যেতে পারব। সিগারেট টানতে এসেছিলাম কি না! এগুলো

নিশ্চয়ই ছ'শ আটাশ নম্বরের?’

হঠাৎ করে সামনে একজন অপরিচিতকে দেখে খতমত খেয়ে গেছে তরুণ ডেলিভারি-ম্যান। প্রশ্নটা শুনে একটু আমতা-আমতা করল সে, তারপর প্যাকেটে লাগানো ডেলিভারি স্লিপ দেখে বলল, ‘জী, এগুলো আপনারই। সিক্স-টু-এইট।’

‘ওহ থ্যাঙ্কস! খিদেয় মারা যাচ্ছিলাম। ঠিকমত এনেছেন তো?’

‘জী, ম্যা'ম। দুটো মিডিয়াম—একটা পেপারোনি আর ব্ল্যাক অলিভের; অন্যটা ডিলাক্স।’

‘চমৎকার। বিল কত এসেছে?’

বলল তরুণ। পার্স খুলে টাকা বের করে দিল সোহানা, মোটা একটা বখশিশ-ও দিল সঙ্গে। বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল তরুণের। ‘থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যা'ম। থ্যাঙ্ক ইউ!’ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল সে।

বাক্সদুটো নিয়ে রানার কাছে ফিরে এল সোহানা। বলল, ‘দুটো মিডিয়াম পিৎজা... মানে দুজন গার্ড।’

‘অথবা একজন দয়াপরবশ গার্ড, বন্দির ভালমন্দের দিকে যার কড়া নজর,’ হালকা সুরে বলল রানা। ‘গাঁটের পয়সা খরচ করে খাবার খাওয়ায়।’

‘দুনিয়া এখনও এতটা ভাল হয়ে যায়নি,’ শ্বেষ প্রকাশ পেল সোহানার গলায়।

‘তা অবশ্য ঠিক।’

‘ভাল খবর হচ্ছে, ওদেরকে চমকে দেয়া যাবে। ঘরে বসে খাবারের অর্ডার দিচ্ছে, তার মানে বিপদের কোনও আশঙ্কাই করছে না ওরা।’

‘ওভার-কনফিডেন্ট, ওয়্যারহাউসের সেই টিমটার মত,’ মন্তব্য করল রানা। ‘আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।’

‘কীভাবে এগোতে চাও?’

‘পার্ক গিয়ে পিৎজাদুটো দান করে দেব কাউকে। আমার শুধু বাস্কট দুটো দরকার। একটার তলা, আর অন্যটার উপরের অংশটা ছিঁড়ে ফেললে মাঝখানে আমার কেভলার ভেস্টটার জায়গা হয়ে যাবে।’

‘ভেস্ট কেন?’

‘তোমার জন্য। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।’

‘শুধু আমি পরব? আর তুমি? তোমার শরীর কি বুলেটপ্রুফ?’

‘শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে না তো!’ চাপা গলায় ধমকাল রানা।
‘দ্য ডিসিশান ইজ ফাইনাল।’

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সোহানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, ‘ঠিক আছে, চলো।’

সাত

লবির দরজায় লাগানো ঘণ্টা টুনটুন করে বাজতেই মুখ তুলে তাকাল রিসেপশনিস্ট। সুন্দরী এক তরুণী দরজা খুলে ধরেছে, বাদামি চামড়ার সুদর্শন এক যুবক হাতে দুটো পিৎজার বাস্কট নিয়ে ঢুকছে ভিতরে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে—এমন চমৎকার জুটি সচরাচর চোখে পড়ে না।

‘হাই!’ কাছে এসে বলল রানা। ‘আমরা উনিশ তলায় জেরির সারপ্রাইয পার্টিতে এসেছি।’

মুচকি হাসল রিসেপশনিস্ট। ‘পিৎজা এনেছেন কেন? একটু

আগেই তো অর্ডার দিয়ে পার্টির জন্য একগাদা পিৎজা আনিয়েছে ওরা ।’

সোহানা বিরক্ত হবার অভিনয় করল । রানাকে অনুযোগের সুরে বলল, ‘তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম শ্যাম্পেন নিতে! তুমি কক্ষনো আমার কথা শোনো না ।’

‘মরেছি!’ বলল রানা, করুণ দৃষ্টিতে তাকাল রিসেপশনিস্টের দিকে । ‘কী করলেন, ভাই? বল্লে দিতে গেলেন কেন? ধাতানি খেতে খেতে জান খারাপ হয়ে যাবে এখন আমার ।’

হেসে ফেলল লোকটা । ‘যান উপরে, পার্টিতে অ্যাটেণ্ড করুন । সবাইকে বলবেন, হই-চই যেন কম করে । আশপাশের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যেন নালিশ শুনতে না হয় ।’

‘বলব ।’

কাউন্টারের তলার বোতাম চেপে ইনার ডোর খুলে দিল রিসেপশনিস্ট । তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলিভেটরে গিয়ে উঠল রানা-সোহানা ।

‘আগে উনিশ তলার বাটন চাপো,’ সঙ্গিনীকে বলল রানা । ‘রিসেপশনিস্ট লোকটা এলিভেটরের কাউন্টারে নজর রাখতে পারে, ওর মনে সন্দেহ জাগাতে চাই না ।’

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা পালন করল সোহানা । প্রথমে উনিশ তলায় নিয়ে গেল এলিভেটর, তারপর আবার নেমে এল ছ’তলায় । চওড়া করিডোরে পা রাখতেই আড়চোখে সঙ্গিনীকে কাঁপতে দেখল রানা । কাঁপুনিটা তীব্র নয়, নিজেকে বেশ ভালই নিয়ন্ত্রণ করেছে সোহানা, তারপরও রানার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা ।

‘অসুবিধে হচ্ছে?’ মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা । ‘ভয় করলে বলো, এখনও সময় আছে । আমি একাই সামলাতে পারব ব্যাপারটা ।’

অসুবিধে অবশ্যই হচ্ছে সোহানার। লক্ষ্যের কাছাকাছ পৌছে গেছে ওরা, কয়েকটা দরজা পরেই রয়েছে শত্রুপক্ষ... সংঘাতের সময় ঘনি়ে এসেছে। সাধারণত এ-সময়টায় উত্তেজনা অনুভব করে ও, শরীরে অ্যাড্রেনালিনের বাড়তি প্রবাহ প্রতিটা পেশি আর স্নায়ুকে করে ফেলে টান টান। অথচ আজ সে-সবের কিছুই ঘটছে না, বুক খামচে ধরছে কী যেন। আতঙ্কটার কাছে একবার আত্মসমর্পণ করতে চাইল, ভাবল ফিরে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্যবোধ আর অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বুকের গহীনে। এভাবে পিঠ ফেরানোর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

দাঁতে দাঁত পিষে সোহানা বলল, ‘আমাকে নিয়ে ভেবো না, কী করতে হবে, তা-ই বলো।’

চোখের সন্দেহটা দূর হলো না রানার। বলল, ‘আমার কাছে লুকিয়ো না, সোহানা। অ্যাকশনের সময় তুমি অচল হয়ে পড়লে সমস্যা আছে—শ্রেফ খুন হয়ে যাবে। সত্যি করে বলো, পারবে কাজটা করতে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। ‘দুর্বল লাগছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাকে বাদ দিয়ে এগোতে বলছি। আই ওয়ান্ট টু হেল্প, তবে সরাসরি ফাইট করতে না হলে ভাল হয়।’

‘হুম, তা হলে তোমার মূল কাজ অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলানো। বাকিটা আমার, তুমি ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে?’

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। ‘কিন্তু ওরা যদি দরজা পুরোপুরি না খোলে? হয়তো শুধু ছিটকিনি নামাবে, চেইন সরাবে না।’

‘চ্যাংড়া কোনও ডেলিভারি-বয় এলে তা-ই করত,’ বলল রানা। ‘কিন্তু নিশ্চিত থাকো, তোমার মত সুন্দরী ডেলিভারি-গার্ল এই জনমে দেখেনি ওরা। দরজা তো পুরো খুলবেই, খাতির জমাবারও চেষ্টা করবে। ওদেরকে উৎসাহিত করা দরকার। এক

কাজ করো, ব্লাউজের ওপরের তিনটে বোতাম খুলে ফেলো।’

‘কী বলছ এসব অসভ্যের মত!’

‘অসভ্যতা নয়, প্রফেশনাল অ্যাডভাইস।’ রানা হাসল। ‘নিজে খুলতে পারবে, নাকি আমি সাহায্য করব?’

চোখ পাকাল সোহানা। ‘মারব এক কিল!’

চটপট বোতাম-তিনটে খুলে ফেলল ও। উকি দিতে শুরু করল সুডৌল বুকের উপরিভাগ আর মাঝের গহীন গিরিখাদ... দর্মবন্ধ করা দৃশ্য। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল রানা, তাতে কামনার কোনও ছাপ ফুটল না, রইল শুধু নীরব স্তুতি।

‘আই, হ্যাংলার মত তাকিয়ে রইলে কেন? সত্যি সত্যি কিল মারব কিন্তু!’ ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে পিৎজার বাক্সদুটো কেড়ে নিল সোহানা। ‘চলো!’ হুকুম দিল ও।

এরিকের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছুল দুজনে। সোহানা দাঁড়াল দরজা বরাবর, পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা—হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। করিডোরটা শূন্য, কেউ এসে বাগড়া দেবার ভয় নেই। পজিশন নিয়ে দেয়ালে কান ঠেকাল রানা, ভিতর থেকে টেলিভিশনের আবছা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারমানে ব্যাটারী কেয়ারলেস, বিপদের আশঙ্কা করছে না। দক্ষ পাহারাদারেরা ঘরের ভিতরটা নিঃশব্দ রাখে, যাতে বাইরের যে-কোনও শব্দ শুনতে পায়, সে-অনুসারে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। কিন্তু এরা ওসব দিকে নজর দিচ্ছে না। ভালই হলো ওদের জন্য। ইশারা করল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানা বেল বাজাল।

প্রথমবার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তাই আবার বেল চাপল সোহানা। এবার থেমে গেল টিভির আওয়াজ, ভলিউম কমানো হয়েছে... কিংবা হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে টিভিটা। কাঠের মেঝেতে পায়ের আওয়াজ হলো, পিপহোলের সামনে

একটু ঝুঁকে দাঁড়াল ও—আবেদনময়ী ভঙ্গিতে, যাতে ভিতর থেকে ওকে ভালমত দেখা যায়।

পিপহোলে ছায়া পড়ল, কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল। একটুখানি ফাঁক হলো পাল্লাটা, চেইন লাগানো রয়েছে এখনও। সাদা চামড়ার একটা মুখ উঁকি দিল ফাঁকা দিয়ে।

‘ইয়েস?’

পিংজা বক্সের উপরে সাঁটা চিরকুটটা দেখল সোহানা। বলল, ‘আপনাদের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দুটো মিডিয়াম—একটা পেপারোনি আর ব্ল্যাক অলিভের; অন্যটা ডিলাক্স।’

‘আগে কখনও তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না,’ সন্দেহ ফুটল লোকটার কণ্ঠে, বাচনভঙ্গিতে ইয়োরোপিয়ান টান স্পষ্ট। ‘সাধারণত দুটো ছেলে পালা করে আসে ডেলিভারি দিতে।’

‘আর বলবেন না!’ গলায় তিক্ততা ফোটাল সোহানা। ‘দুই হারামজাদাই আজকে গায়েব হয়ে গেছে, বলে কিনা অসুখ! আমার তো মনে হয়, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ডেটিঙে গেছে। আমার হাজব্যাণ্ড আর আমি হচ্ছি দোকানের মালিক, অথচ দেখুন, অর্ডার নিয়ে আমাদেরকেই ছোট্টাছুটি করতে হচ্ছে...’

হাসল-লোকটা, চেহারা থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। বলল, ‘বুঝেছি, আর বলতে হবে না। দাম কত হয়েছে?’

চিরকুটটা খুলে ফাঁকার দিকে বাড়িয়ে ধরল সোহানা। সেটা নিয়ে লোকটা বলল, ‘জাস্ট আ মিনিট।’

বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ঝনাৎঝন শুনে বোঝা গেল, চেইনটা খোলা হচ্ছে। পুরো দরজা খুলে পিংজা নেবে লোকটা এখুনি। চট করে বসে পড়ল রানা, নিচু হয়ে চলে এল দরজা আর সোহানার মাঝামাঝি; বসে থাকায় ওকে পিপহোল দিয়ে দেখা যাবে না।

দরজা খুলে যেতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, ভাঁজ করা স্প্রিংয়ের মত ছিটকে গেল, মাথা নিচু করে কাঁধ দিয়ে সজোরে আঘাত করল প্রতিপক্ষের পেটে। হুঁক করে সমস্ত দম বেরিয়ে গেল লোকটার, অকস্মাৎ আক্রমণের ধাক্কা সহিতে পারল না। উড়ে গিয়ে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল ইনার করিডোরের মেঝেতে।

সোজা হয়ে পিস্তল তুলল রানা, তাক করল ভূপাতিত শত্রুর দিকে। লোকটাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না—কয়েক দিন আগেই দেখেছে একে... ড. সিদ্ধিকীকে নিয়ে পালাবার সময়, শপিং মলের বাইরে। এ সেই টাকমাথা ড্রাইভার। লোকটা অবশ্য ওকে চেনার কোনও চেষ্টা করল না, অসুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল সে, কোটের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্র বের করে আনার চেষ্টা করছে।

ছুটে গিয়ে ব্যাটার থুতনির নীচে একটা পেনাল্টি কিক মারল রানা। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, গুঙিয়ে উঠে মেঝেতে নিখর হয়ে গেল টাকমাথা। এক পলকের জন্য পিছনে তাকিয়ে ইশারা করল রানা। সোহানা ওর কথামত পিৎজার বাক্স তুলে ধরে রেখেছিল বুক ঢেকে, যাতে গোলাগুলি হলে কেভলার ভেস্টের আড়াল পায়; এবার বাক্স ফেলে দিল ও, নিতম্বের উপরে বেল্টে গোঁজা নিজের সিগ-সাওয়ার বের করল, তাক করল টেকো ড্রাইভারের দিকে—কাভার দেবার জন্য।

রানা অবশ্য ইশারা দিয়েই ছুটতে শুরু করেছে করিডোর ধরে। লিভিংরুমের এন্ট্র্যান্সে পৌঁছে ডাইভ দিল ও, মেঝেতে এক গড়ান দিয়ে চলে গেল কামরার প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। সোজা হলো এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, ক্লাসিক ফায়ারিং পজিশনে পিস্তল ধরা হাতটা প্রসারিত করে রেখেছে।

একজন মাত্র প্রহরী রয়েছে কামরাটায়—চল্লিশের কোঠায়,

পৌছা এক গাঁট্টাগোটা গৌফঅলা পালোয়ান, বসে আছে টিভির সামনে একটা সিঙ্গেল সোফায়। রানার উদ্যত সিগ-সাওয়ার দেখে চমকে উঠল সে, চকিত দৃষ্টি বোলাল সামনের কফি-টেবিলের উপর—ওখানে তার নিজের অস্ত্রটা রাখা। হাত বাড়াবার পায়তারা করছিল, কিন্তু জমে গেল রানার শীতল কণ্ঠ শুনে।

‘হাতটা যেমন আছে, তেমনই থাক, মিস্টার। নইলে খামোকা প্রাণটা খোয়াবে।’

লিভিংরুমের আর্চওয়েতে সোহানাকে উদয় হতে দেখে তিক্ততা ফুটল লোকটার চেহারায়ে। বুঝতে পারছে, কোনও সুযোগ নেই তার; একজন হলে নাইয় কথা ছিল, কিন্তু দুজন সশস্ত্র মানুষকে কিছুতেই মোকাবেলা করতে পারবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিল সে, হাতদুটো তুলে ধরল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

এবার রুমের বাকি অংশের উপর নজর বোলাল রানা। এরিককে দেখা গেল বাম দিকের কোণে—মুখে কাপড় গাঁজা... একটা চেয়ারে বসিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখের একটা অংশ ঢেকে রয়েছে শুকিয়ে ওঠা রক্তে, উন্মুক্ত চামড়ায় কালসিটেও পড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। রানাকে দেখে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, কিন্তু ওকে নিয়ে ব্যস্ততা দেখাল না অভিজ্ঞ বিসিআই এজেন্ট। আগে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে বুঝে নিতে হবে।

কফি-টেবিল থেকে প্রথমে পিস্তলটা তুলে নিল ও, কাছে গিয়ে ঘাড়ের উপর সিগ-সাওয়ারের বাটের বাড়ি দিয়ে বেইশ করে ফেলল গৌফঅলা লোকটাকে। এরপর বেডরুমে হানা দিল। কামরাটা অন্ধকার, জানালা গলে আবছা আলো আসছে শুধু। ওর মধ্যোই পুরো ঘর তল্লাশি করল ও—আসবাবপত্রের ফাঁক, ক্লজিটের ভিতরদিক, বিছানার তলা... সব দেখল। সবশেষে

দেখল বাথরুমটা। নিশ্চিত হলো, অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই।

‘অল ক্লিয়ার,’ বেডরুম থেকে বেরিয়ে সোহানাকে বলল রানা। ‘মেইন ডোর বন্ধ করেছ?’

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

‘টাকলুকে সার্চ করে এসো, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র লুকানো থাকতে পারে ওর। জ্ঞান ফেরার পর ব্যাটা আবার যেন ঝামেলা পাকাতে না পারে!’

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সোহানা। রানা এগিয়ে গেল গৌফঅলার দিকে, মেঝেতে পড়ে আছে সে। দক্ষ হাতে তল্লাশি চালাল ও, কিন্তু কিছু পেল না লোকটার শরীরে। কফি-টেবিলে রাখা পিস্তলটাই এর একমাত্র সম্বল ছিল।

সোহানা ফিরে এল। হাতে একটা ছোট পিস্তল আর ভাঁজ করা ছোরা। বলল, ‘এ-দুটো পেয়েছি।’

‘গুড,’ বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে এরিকের বাঁধন খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, ‘কী অবস্থা তোমার?’

‘দেখতেই তো পাচ্ছেন,’ কবজি ডলতে ডলতে বলল এরিক। ‘একটা দাঁত ভেঙেছে।’ ফোলা বাম গালে হাত বোলাল ও। ‘বুকের দু-একটা হাড়েও চিড় ধরেছে বোধহয়। শ্বাস নিতে গেলেই ব্যথা পাচ্ছি।’

পাশে পড়ে থাকা একটা টিস্যু বক্স চোখে পড়ল রানার, ওটা থেকে কয়েকটা টিস্যু বের করে তুলে দিল এরিকের হাতে। ‘জোরে কেশে এখানে খুতু ফেলো। তা হলে বুঝব ক্ষয়ক্ষতি কতখানি হয়েছে।’

কাশতে গিয়েই মুখ কুঁচকে ফেলল এরিক। ‘উফ্ফ, ব্যথা পাচ্ছি খুব।’

‘থেমো না,’ রানা বলল। ‘আমাকে থুতুটা দেখতে হবে।’

বুক চেপে ধরে কাশল এরিক, একদলা থুতু ফেলল হাতে ধরা

টিস্যুতে। সেটা দেখে স্বস্তি পেল রানা। বলল, ‘রক্ত বেরুচ্ছে না। তারমানে ইন্টারনাল ইনজুরি নেই কোনও। ওঠো, সোফায় শুতে হবে তোমাকে।’ সোহানা, তুমি ওকে একটু দেখবে? আমি বদমাশদুটোর হাত-পা বেঁধে ফেলছি।’

এফবিআই এজেন্টের পায়ের কাছে পড়ে থাকা দড়ির গোছা তুলে নিয়ে ও সরে যেতেই সোহানা এগিয়ে এল। ইতোপূর্বে রানার সৌজন্যে একবার দেখা হয়েছে দুজনের, পরিচয় হয়েছে। এরিক একটু হাসার চেষ্টা করল, ‘হাই, কেমন আছেন?’

‘ভদ্রতা দেখাবার সুযোগ অনেক পাবেন,’ সোহানা বলল। ‘উঠুন এখন।’

ওর সাহায্য নিয়ে ভর দিয়ে সোফা পর্যন্ত গেল এরিক, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শার্ট খুলে ওর বুক আর পেট পরখ করে দেখল সোহানা।

‘ফোলা-টোলা দেখছি না,’ বলল ও। ‘অস্বাভাবিক কোনও ব্যথা অনুভব করছেন?’

‘সারা শরীর টনটন করছে, আর আপনি কিনা বলছেন...’

‘অস্বাভাবিক ব্যথার কথা বলছি। কোনটা স্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই জানেন? জীবনে এই প্রথম মার খাননি নিশ্চয়ই?’

‘বুঝেছি। না, ম্যা’ম... ব্যথা যা পাচ্ছি, সবই স্বাভাবিক। মানে... এভাবে মার খাওয়াকে যদি স্বাভাবিক বলেন আর কী...’

হেসে ফেলল সোহানা। ‘আপনার ঘরে ফার্স্ট এইড কিট আছে?’

‘হ্যাঁ। বাথরুমে, সিন্ধের নীচে কাবার্ডে।’

ছোট বক্সটা নিয়ে যখন সোহানা ফিরে এল, তখন রানার কাজ শেষ হয়েছে। অচেতন দুই দুর্বৃত্তকে বাঁধা শেষ করে এরিকের পাশে এসে বসেছে। সোফার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল সোহানা, ফার্স্ট এইড কিট খুলল। ভিতরটা নানান ধরনের

ওখুধ আর চিকিৎসা সরঞ্জামে ভর্তি—সাধারণ কিটে এত কিছু থাকে না।

‘হুঁ,’ বলল সোহানা। ‘আপনি দেখছি খুব সাবধানী লোক, এরিক। যে-কোনও ইনজুরি সামলাবার মত প্রস্তুতি রেখেছেন!’

‘মি. রানার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে তৈরি থাকি,’ বলল এরিক। ‘ওঁর বন্ধুত্ব একটা ইনজুরিয়াস জিনিস। শুনেছেন হয়তো, ওঁকে সাহায্য করতে গিয়ে মস্ত বিপদে পড়েছিলাম। লুইযিয়ানার জলাভূমিতে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল একদল খুনি।’

‘ঠিকই বলেছেন,’ হাসল সোহানা। ব্যাণ্ডেজে জীবাণুনাশক ঢেলে এরিকের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল ও। কাটা-ছেঁড়ায় জ্বালা-পোড়া শুরু হলো, মুখ কুঁচকে ফেলল এফবিআই এজেন্ট।

‘নড়বেন না,’ সোহানা বলল। ‘ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন, অন্য কিছুতেই মনোযোগ দিন।’

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল এরিক। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমার ওয়ার্নিংটা বুঝতে পেরেছিলেন তা হলে?’

‘বোঝার জন্যই তো কোড, তা-ই না?’ রানা বলল। ‘চমৎকার দেখিয়েছ। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাউকে সতর্ক করে দেয়া সহজ কাজ নয়। ওরা বুঝে ফেললে তোমাকে খুনও করতে পারত।’

‘মরলে মরতাম। তা-ও আপনাকে ফাঁদের ভিতর পাঠাতাম না।’

‘আমি জানি। কিন্তু কীভাবে কী ঘটল, সেটা বলো।’

‘ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলাম। ডি.ই.এ.-তে আমার পরিচিত যারা আছে, তারা কিছুই বলতে পারল না...’

‘দাঁড়াও একটু,’ রানা বাধা দিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় গলা শুকিয়ে গেছে এরিকের, ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছে

কণ্ঠ । ‘আমি পানি নিয়ে আসছি ।’

পুরো এক গ্লাস পানি ঢকঢক করে খেয়ে কিছুটা সুস্থির হলো এরিক, তারপর আবার খেই ধরল । ‘...আমার কন্ট্যাক্টরা কোনও খবর দিতে পারল না । তাই ব্যুরোর কম্পিউটার ডেটাবেজ ব্যবহার করলাম, কিন্তু ওখানেও কোনও তথ্য নেই আপনার ওই বিজ্ঞানীর বিষয়ে ।’

‘কিছুই পাওনি?’

‘নাহ্ । কখনও ছিল, তা-ও মনে হয় না । সম্ভবত ইচ্ছে করেই এফবিআই ডেটাবেজে ভদ্রলোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । সিদ্ধান্তটা খুব উঁচু মহল ছাড়া আর কারও পক্ষে নেয়া সম্ভব নয় । একটু নাড়াচাড়া করব ভেবেছিলাম বিষয়টা নিয়ে, কিন্তু তার আগেই এই হারামজাদাদের হাতে পড়ে গেলাম ।’ মেঝেতে পড়ে থাকা গোঁফঅলা দুর্বৃত্তকে দেখাল এরিক ।

রানার কপালে দ্রুত দৃষ্টি দেখা দিল । ‘তোমার ব্যাপারে এরা জানল কী করে?’

‘ব্যুরোতে ওদের লোক থাকতে পারে, আবার কম্পিউটার হ্যাক করলেও জানা সম্ভব—ফেডারেল ডেটাবেজে কে ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে । এনিওয়ে... যেভাবেই হোক, আমার খবর পেয়েছে ওরা, জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । অফিস শেষে বাড়ি ফেরার জন্য যখন পার্কিং লটে গেলাম, ওখানে অপেক্ষা করছিল ওরা । পিছন থেকে একজন আমার নাম ধরে ডাকল, উল্টো ঘুরতে না ঘুরতেই ঝট করে একটা ভ্যান এসে থামল পাশে । তিনজন লোক জাপটে ধরে আমাকে তুলে নিল ভিতরে, মাথায় একটা কালো কাপড়ের ব্যাগ পরিয়ে দিল ।’

দম ফুরিয়ে গেছে এরিকের, থেমে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকল ।

‘ওম,’ হিসেব করল রানা। ‘একজন পিছন থেকে ডেকেছে, ৩০জন তুলে নিয়েছে ভ্যানে, আর একজন নিশ্চয়ই ড্রাইভ করছিল। পাঁচজনের টিম ছিল তা হলে?’

‘উঁহু, ছয়,’ বলল এরিক। ‘আরেকজন আছে ওদের সঙ্গে, ছয় নম্বর লোকটাই ওদের লিডার। নিজের নাম বলে ডেমিয়েন। ছদ্মনাম হবারই সম্ভাবনা বেশি।’ সোহানার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। ‘এক্সকিউজ মি, আপনার কি খারাপ লাগছে?’

চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সোহানার, অনেক কষ্টে এতক্ষণ ভয়টাকে চেপে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ করে স্নায়ু বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। উঠে দাঁড়াল ও, কাঁপা গলায় বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, আমি একটু মুখ ধুয়ে আসি।’

বেডরুমের দিকে চলে গেল সোহানা। বিস্মিত গলায় এরিক বলল, ‘কী হলো ওঁর? নার্ভাস মনে হচ্ছে... আগেরবার যখন দেখেছিলাম, তখন কিন্তু খুব শক্ত মেয়ে মনে হচ্ছিল।’

‘ও কিছু না,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘এরপর কী ঘটল, সেটা বলো।’

‘অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে এল ওরা, রিসেপশনে কেউ সন্দেহ করেনি—বন্ধু সেজে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে এসেছে, আমার গাড়িটাও নিয়ে এসেছে সঙ্গে। সারাক্ষণ আমার পিঠে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিল, যাতে ওদের অভিনয়ে তাল দিয়ে যাই। যা হোক, বাসায় এনেই আমাকে টরচার করতে শুরু করল—একটাই প্রশ্ন, কেন ড. সিদ্ধিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি আমি। মার খেতে খেতে এক পর্যায়ে আর টিকতে পারলাম না, সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে ওদেরকে বললাম যে—আমি নই, আসলে সিদ্ধিকীকে খুঁজছে আমার এক বন্ধু; সিদ্ধিকীর সিকিউরিটি ডিটেইলে কাজ করত সে। কথাটা শুনে ব্যাটারী খুব আগ্রহী হয়ে উঠল, আমার সেই বন্ধুকে বাগে পাবার জন্য পাগলা কুকুর হয়ে

গেল ।’

‘হুম, ওদের ধারণা—সিদ্ধিকীর সিকিউরিটি ডিটেইলে কাজ করে থাকলে নিশ্চয়ই অনেক নতুন ইনফরমেশন আছে তোমার বন্ধুর কাছে,’ রানা বলল। ‘এই বন্ধু হয়তো আইডিয়া দিতে পারবে, সিদ্ধিকী কোথায় গেছে।’

‘কারেন্ট। কিন্তু আমি ওদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আপনিও বিজ্ঞানীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ওরা যা জানে, তার চেয়ে বেশি কিছু আপনি জানেন না।’

‘কিন্তু সেটা ওঁরা বিশ্বাস করেনি, তাই না?’

‘ঠিক ধরেছেন। আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ভুল ইনফরমেশন দিতে বাধ্য করেছে। বলতে বলেছে যে, সিদ্ধিকীর ল্যাব ভার্জিনিয়ার বেইলি’জ রিজে।’

‘হ’জনের মধ্যে মাত্র দুজন এখানে,’ রানা বলল। ‘বাকি চারজন নিশ্চয়ই ওখানে গেছে আমার জন্যে ফাঁদ পাততে?’

মাথা ঝাঁকাল এরিক।

সোহানা ফিরে এসেছে। ফাঁদের ব্যাপারটা শুনতে পেয়েছে ও, সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলল, ‘তুমি তো যাওনি ওখানে, এখন কী ঘটবে?’

‘এখানে ফিরে আসবে ওরা। আমার আবার ফোন করবার কথা, সেটার জন্য অপেক্ষা করবে, নতুন করে ফাঁদ পাততে চাইবে।’

‘কিন্তু আমরা ওদের আগেই পৌঁছে গেছি এখানে।’

‘হ্যাঁ,’ ভয়ঙ্কর একটা হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। ‘সে-কারণেই ফাঁদটা ওরা নয়, আমরা পাতব!’

আট

পরদিন।

ইন্টারকমে রিং বাজতে শুনে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর আস্তে করে তুলল রিসিভারটা, কানে ঠেকাল। ‘ইয়েস?’

রিসেপশনিস্টের গলা শোনা গেল ওপাশ থেকে। ‘মি. ডেমিয়েন এসেছেন, সার। সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক।’

‘পাঠিয়ে দাও।’

‘জী সার।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেডরুম থেকে লিভিংরুমে ফিরে এল রানা। এরিক আর সোহানা বসে আছে সোফায়, ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দুজন এসেছে। বাকি দুজন নিশ্চয়ই রয়ে গেছে বেইলি’জ রিজে।’

‘গুড,’ এরিক বলল। ‘আমাদের পাল্লা ভারী থাকছে তা হলে।’ স্বস্তি ফুটেছে ওর গলায়। চারজন সশস্ত্র শত্রুকে এই বন্ধ জায়গায় কীভাবে মোকাবেলা করবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। অফিসে খবর দিয়ে কয়েকজন এফবিআই এজেন্টকে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু রানা রাজি হয়নি। ব্যুরোতে এদের চর থাকতে পারে, হয়তো খবর পেয়ে যাবে। তা ছাড়া পুরো ব্যাপারটা নিজের মত করে সামাল দিতে চায় ও, আমেরিকান কোনও সংস্থা নাক গলাক তা চায় না।

ঘড়ি দেখল সোহানা—বেলা বারোটা পেরিয়েছে কয়েক মিনিট আগে। বলল, ‘তাড়াতাড়িই তো ফিরেছে দেখছি। আমি ভেবেছিলাম আরও দেরি করবে।’

‘ডেমিয়েনের আর তর সইছে না আর কী!’ মুচকি হাসল রানা। ‘সারারাত বেইলি’জ রিজ়ে বসে থাকতে হয়েছে তাকে, ঘুমাতেও নিশ্চয়ই পারেনি। মেজাজ খিঁচড়ে থাকার কথা। এরিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার খায়েশ জেগেছে নিঃসন্দেহে। হয়তো সন্দেহ জেগেছে, আমাকে কোনওভাবে সতর্ক করে দিয়েছে ও। সেজন্যেই আমাকে পাওয়া যায়নি ওখানে।’ একটু থামল ও, মুখ ঘোরাল। ‘কী, অতিথি আপ্যায়নের জন্য তৈরি আছ তোমরা?’

কথাটা দুই বন্দিকে উদ্দেশ্য করে বলা। দুটো চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে টাকমাথা আর গৌফঅলাকে—অনেক আগেই জ্ঞান ফিরেছে ওদের। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে দুজনকে, কিন্তু কিছুই জানা যায়নি। এরা ভাড়াটে গুণ্গ, ডেমিয়েনের হয়ে শুধু অর্ডার ফলো করছে; ড. সিদ্দিকীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি।

রাতে দুবার অবশ্য ফোন করেছিল এদের নেতা, বেইলি’জ রিজ় থেকে রাগত স্বরে অ্যাপার্টমেন্টের পরিস্থিতি জানতে চাইছিল। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিতে বাধ্য করা হয়েছে বন্দীদের, প্রাণভয়ে সব ঠিক আছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে ওরা।

রানার প্রশ্ন শুনে চুপ করে রইল দুই দুর্বৃত্ত। টেকো লোকটার কাছে গিয়ে পিস্তলের খোঁচা মারল রানা। ‘কী বলেছি, শুনতে পাওনি? তোমাদের বসকে রিসিভ করতে রেডি আছ?’

ভয়াব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টাকমাথা।

‘গুড,’ রানা বলল। ‘ঠিক আছে, তা হলে কাজে নামা যাক।

সোহানা-এরিক, কী করতে হবে মনে আছে তো?’

‘হ্যাঁ,’ সায় দিল দুজনেই। উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে।

‘আমি বাইরে যাচ্ছি,’ বলে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা। ইমার্জেন্সি স্টেয়ারওয়েলের দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকবে ও—করিডোর থেকে দেখা যাবে না। ডেমিয়েন আর তার সঙ্গী ঢুকলে পিছন থেকে হামলা করবে, রানা-এরিক থাকবে সামনে। দু’দিক থেকে শত্রুদেরকে আটকাবে ওরা।

বাঁধন খুলে টেকো লোকটাকে দাঁড় করাল রানা। নির্দেশ দিল, ‘হাঁটো। সাবধান, চালাকি করতে যেয়ো না। আমি পিছনে আছি, ঘাপলা হলে কিন্তু লাইন অভ ফায়ারে তুমিই সবার আগে থাকছ।’

মাথা নাড়ল টাকমাথা, আদেশ অমান্য করবার ইচ্ছে নেই। মরতে চায় না অকালে। প্যাসেজ ধরে দরজার দিকে চলে গেল সে। এরিক গেল কিচেনে, ফ্রিজের আড়ালে পজিশন নিল। রানা থাকল আর্চওয়ের পিছনে, মাথা সামান্য বের করে নজর রাখছে এন্ট্রান্সের দিকে। পুরো ব্যাপারটা আগেই রিহার্সাল দিয়ে রেখেছে ওরা, আশা করা যায় বিনা রক্তপাতে আটকানো যাবে শত্রুদেরকে।

সময় গড়াতে শুরু করল। দশ সেকেন্ড... বিশ... ত্রিশ... চল্লিশ... পঞ্চাশ... এক মিনিট... দু’মিনিট...। এরিক উসখুস করছে, কিন্তু রানা স্থির রইল। এলিভেটরটা পুরনো, উপরে ওঠে খুব আস্তে। তা ছাড়া লোকদুটো নিশ্চয়ই চারপাশে নজর রেখে ধীরে ধীরে আসছে। দেরিটা অস্বাভাবিক নয়।

তিন মিনিটের মাথায় দরজায় টোকা পড়ল। ঠক্, ঠক্—দু’বার। একটু বিরতি নিয়ে পর পর আরও তিনবার। দুর্বৃত্তদের মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত কোড ওটা। পিছন ফিরে একটু তাকাল টাকমাথা, ইশারায় তাকে দরজা খোলার অনুমতি দিল রানা। ছিটকিনি আর চেইন নামাল সে, খুলে ধরল পাল্লাটা।

‘খবর আছে কোনও?’ খঁকিয়ে উঠল নবাগত একজন।

‘না,’ বলল টেকো লোকটা। ‘ফোন আসেনি আর।’ উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে, দুই নবাগত যেন তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়—ওভাবেই তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘটলও তা-ই। পিছু পিছু এগোতে শুরু করল ডেমিয়েন আর তার সঙ্গী।

আর্চওয়ে ছেড়ে পিছিয়ে গেল রানা, লিভিংরুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজার কাছে উদয় হলো তিন দুর্বৃত্ত, টাকমাথা শুয়ে পড়ল ঝট্ করে। দুই নবাগত চমকে উঠল রানাকে দেখে, ওর তাক করা সিগ-সাওয়ার দেখে যন্ত্রচালিতের মত হাত ঢুকিয়ে ফেলল কোটের ভিতরে। অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে।

‘ওভাবেই জমে যাও, বাছারা!’ গমগম করে উঠল এরিকের কণ্ঠ। ‘যদি ক্রসফায়ারে কচুকাটা হতে না চাও আর কী!’

ঘাড় ফিরিয়ে কিচেনে দাঁড়ানো এফবিআই এজেন্টকে দেখতে পেল দুই দুর্বৃত্ত—ফ্রিজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ও, পিস্তল হাতে কাভার করেছে ওদেরকে পাশ থেকে। এক পা পিছিয়ে গেল লোকদুটো নিজের অজান্তেই।

‘লাভ নেই,’ রানা বলল। ‘পিছনেও তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।’

সোহানা এসে পড়েছে, মেইন ডোরে দাঁড়িয়ে আরেকটা অস্ত্র তাক করেছে রেখেছে ও। খ্যাপাটে চেহারা করল একজন। বলল, ‘হচ্ছেটা কী এসব?’

‘দেখতেই পাবে,’ রানা নির্বিকার। ‘সামনে এসো, তারপর সুবোধ বালকের মত শুয়ে পড়ো মেঝেতে। হাতদুটো যেন মাথার পিছনে থাকে।’

পালা করে তাক হয়ে থাকা তিনটে অস্ত্রের দিকে তাকাল লোকদুটো, তারপর হার মানল। লিভিংরুমে ঢুকে কার্পেটমোড়া

মেঝেতে শুয়ে পড়ল। কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে এল এরিক, দক্ষ হাতে তল্লাশি করল শত্রুদের শরীর। দুটো নাইন মিলিমিটার ব্রাউনিং পিস্তল বেরুল ওদের কাছ থেকে, সঙ্গে স্পেয়ার-ম্যাগাজিন আর ভাঁজ করা পকেট-নাইফও আছে। নিয়ে নিল সব। সোহানা ভিতরে ঢুকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা আটকে দিল, তারপর চলে এল লিভিংরুমে।

‘অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আর কেউ আছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘তোমাকে পিস্তল হাতে দেখতে পেয়েছে?’

সোহানা মাথা নাড়ল। ‘না। এদের সঙ্গে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন এলিভেটরে। ওপাশের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন বোধহয়। উনি ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে এরা, এখন করিডোর ফাঁকা।’

‘হুম!’

‘তুমিই তা হলে সেই লোক?’ মেঝে থেকে মাথা তুলে বলল দুই নবাগতের একজন। মাঝারি উচ্চতা, তীক্ষ্ণ চেহারা, মাথার চুল মিলিটারি ছাঁটে কাটা। কথা বলছে নিরুদ্ভিগ্ন ভঙ্গিতে। হাবভাবে নেতৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। ‘গলা চিনতে পারছি আমি। মি. বডিগার্ড... ঠিক বলেছি?’

রানাও চিনতে পারল। ড. সিদ্ধিকীকে নিয়ে পালাবার সময় টাকমাথা ড্রাইভারের ফোনে কথা হয়েছিল এ-লোকটারই সঙ্গে। ও বলল, ‘আবার ভুল করলে। আমি বডিগার্ড নই। তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই কথা বলেছিলে। তুমি তো সেই উজবুকটা... তাই না?’

খেপল না লোকটা। বলল, ‘হ্যাঁ, ভালই বোকা বানিয়েছ আমাকে। ফোনে যে ট্রান্সমিটার আছে, সেটা বুঝে ফেলেছিলে, না? কয়েক ঘণ্টা বেকুবের মত ঘুরেছি আমরা, পরে দেখলাম—ফোনটা একটা ট্রাকের পিছনে পড়ে আছে।’ টেকো

লোকটার মত এ-ও ইয়োরোপীয় উচ্চারণে কথা বলছে।

‘ভাল করেছে,’ টিটকিরি মারল রানা। ‘তোমরা যে অপদার্থ, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছ।’ এরিকের দিকে তাকাল ও। ‘এই গরুদুটোকে বেঁধে ফেলো তো, কোথাও যেন ঘাস খেতে চলে না যায়।’

দুই নবাগতের অস্ত্রগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখল ও। পিস্তলদুটো চমৎকার, তবে ওর নজর কাড়ল দুর্বৃত্তদের নেতার পকেট-নাইফটা। সাধারণ ছুরি নয়, সেরা কারিগরের তৈরি উৎকৃষ্ট মানের জিনিস। ব্র্যাণ্ড খোদাই করা আছে গায়ে: আর্নেস্ট এমারসন। ফলাটা আট ইঞ্চি লম্বা, নন-রিফ্লেকটিভ ইস্পাতে তৈরি, এপোস্ট্রি হাতলটা খাঁজ কাটা—ঘাম, পানি বা রক্ত... যা-ই লাগুক, মুঠোতে পিছলাবে না। ক্লোজ-কোয়ার্টার কমব্যুটের জন্য বানানো প্রফেশনালের অস্ত্র, নবীশের জন্য নয়। ওর নিজের কাছেও একই রকম আরেকটা এমারসন-নাইফ আছে। এই ছুরিটা দেখেই রানা বুঝল, মালিক সাধারণ গুণ্ডা-বদমাশ নয়।

ফলাটা ভাঁজ করে রেখে ওটা পকেটে গুঁজল ও। তাকিয়ে দেখল, টাকমাথা লোকটাকেসহ এরিক নতুন দুই দুর্বৃত্তকে বাঁধা শেষ করেছে। এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে বসল রানা—মুখোমুখি, নেতা লোকটার দৃষ্টিসীমার ভিতরে।

‘গুনলাম, ডেমিয়েন নাম নিয়েছ?’ বলল রানা। ‘কারণটা কী?’

‘ছোটবেলা থেকে খুব ভাল লাগত নামটা,’ হালকা গলায় বলল ডেমিয়েন। ‘খুব ইচ্ছে ছিল, লোকে আমাকে এ-নামে ডাকুক।’

‘তাই নাকি?’ রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। ‘ড. সিদ্দিকী সম্পর্কে বলো আমাকে। কেন তার পিছনে লেগেছ তোমরা?’

জবাব দিল না ডেমিয়েন, নিঃশব্দে হাসল।

‘প্রশ্নের জবাব দাও, ডেমিয়েন। এরিক কিন্তু ছটফট করছে,

‘‘‘‘‘ একটা করে তোমার শরীরের হাড়িগুলো গুঁড়ো করতে
‘‘‘‘‘ ও ।’

‘আমার একটা দাঁত ভেঙেছে ওরা,’ অভিযোগের সুরে বলল
এরিক । ‘শুধু হাড়ি গুঁড়ো করে আশ মিটবে না । কানদুটোও
কেটে নিতে চাই ।’

হাসি নিভল না চতুর লোকটার । বলল, ‘ভয় দেখিয়ে কোনও
লাভ নেই, মি. বডিগার্ড । যাঁ খুশি করতে পারেন ।’

‘আবার আমাকে অপমান করছ তুমি,’ রানা বলল । ‘আমি
বডিগার্ড নই । হবার প্রশ্নও ওঠে না । ড. সিদ্দিকী আমার প্রিয়
কয়েকজন মানুষকে খুন করে পালিয়েছে । তোমাদের মত আমিও
তাকে খুঁজছি । পরস্পরের সঙ্গে লড়াই না করে এসো বরং
সমঝোতা করি—কে কতটা কী জানি, খুলে বলি । তা হলে
দু’পক্ষেরই লাভ হবে । লোকটাকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে ।’
টোপ দিল ও ।

লাভ হলো না । ডেমিয়েন বলল, ‘দুর্গমিত, প্রস্তাবটা গ্রহণ
করতে পারছি না । ভদ্রলোককে আমরাও চাই বটে, কিন্তু তোমার
আর আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ।’

‘তাতে অসুবিধে নেই,’ রানা হাল ছাড়ছে না । ‘একটা
বোঝাপড়া করে নিতে পারব আমরা ।’

‘অসম্ভব! তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও রকম বোঝাপড়া
হবে না ।’

‘আগেই শেষ কথা জানিয়ে দাও কেন?’ বিভ্রান্ত করবার
ভঙ্গিতে হাসল রানা । ‘আলোচনার টেবিলে তো বসি!’

‘আমি মেঝেতে!’

‘বসার ব্যবস্থা করছি এখন,’ টান দিয়ে ডেমিয়েনকে ওঠাল
রানা । সোফায় নিয়ে বসাল । ‘কী, আরাম পাচ্ছ তো? হাতের
বাঁধনও খুলে দিচ্ছি ।’ ছুরি বের করে দড়ি কেটে দিল ও । মুখে

হাসি ধরে রেখেছে। ‘এবার কেমন লাগছে?’

ডেমিয়েনের চোখে বিভ্রান্তি দেখা দিল। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না সে। সত্যিই কি এরা তার সঙ্গে সমঝোতা করতে চাইছে নাকি?

‘আলোচনার পূর্ব-শর্ত হিসেবে আর কিছু চাও?’ হাসিমুখে প্রশ্ন করল রানা। প্রতিপক্ষ নিশ্চুপ দেখে নিজেই আবার বলল, ‘বুঝতে পেরেছি। কফি দরকার, তাই না? আসলেই... গল্প জুড়বার জন্য গরম গরম কফির কোনও তুলনা হয় না। এরিক, ভাল কফি আছে নাকি কিচেনে?’

‘আছে মানে! একেবারে অরিজিন্যাল মোকা জাভা আছে!’ এরিক উল্লসিত গলায় জবাব দিল।

‘একসেলেন্ট! আমাদের অতিথিকে খাওয়াবে নাকি একটু?’

‘অবশ্যই!’

‘কড়া করে বানিয়ে কিন্তু!’ চোখ টিপল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিচেনে চলে গেল এরিক।

এদিক-ওদিক চাইল ডেমিয়েন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। একবার ভাবল, হাত খোলা যখন, লড়াই করে পালাবার চেষ্টা করবে কি না। পরমুহূর্তে দমে গেল। হাসিঠাট্টা করলেও রানার হাতে সিগ-সাওয়ারটা ঠিকই ধরা আছে। একটু দূর থেকে সুন্দরী মেয়েটাও তাক করে রেখেছে পিস্তল। সোহানার উপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য ‘স্থির’ হলো তার দৃষ্টি—বিসদৃশ কী যেন ঠেকছে চোখে। কপালে ঘাম জমেছে মেয়েটির, হাতও কাঁপছে অল্প অল্প। চকিতের জন্য একটু হাসি খেলা করে গেল ডেমিয়েনের ঠোঁটে, বুঝতে পেরেছে রহস্যটা। আবার চুহারা স্বাভাবিক করে সোফায় হেলান দিল সে। দেখা যাক, এরা কী করে।

‘বেশ, বেশ,’ পরিবর্তনটা লক্ষ করে বলল রানা। ‘তোমার মুড় বদলে যাচ্ছে দেখি। আলোচনায় বসতে রাজি আছ তা হলে?’

‘এখনও কিছু বলতে পারছি না,’ মুচকি হাসল ডেমিয়েন।
‘কফিটা আসুক। সেই সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে চাও,
সেটাও শুনি।’

‘প্রথমে তোমার আসল পরিচয়টা জানতে চাই। না, না,
ঠিকুজি-কোষ্ঠীর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই আমার। তুমি কার
হয়ে কাজ করছ, সেটা বলো আগে।’

‘কেন, সিদ্ধিকী সেটা বলেনি তোমাকে?’

‘আমাকে রূপকথা শুনিয়েছে লোকটা,’ বলল রানা।
‘ডি.ই.এ.-র হয়ে নাকি গবেষণা করত। দুর্ঘটনাক্রমে একটা খুব
পাওয়ারফুল ড্রাগ আবিষ্কার করে বসেছে, সেটা পাবার জন্য
উতলা হয়ে উঠেছে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সান্টানা।
তোমরা নাকি তার লোক। তবে আমি জানতে পেরেছি, লোকটা
ডি.ই.এ.-র হয়েও কাজ করছিল না, আর সান্টানাও বেশ কিছুদিন
আগেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তারমানে তোমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন
কোনও কারণে সিদ্ধিকীর পিছে লেগেছ... সম্পূর্ণ অন্য কারও
হয়ে। কে সেটা? ইয়োরোপিয়ান কোনও সরকার... নাকি
টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন?’

‘এ-প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।’

‘হুম, বলবে না? তা হলে তো কফির জন্য অপেক্ষা করতেই
হচ্ছে।’

‘কী কফি বানাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে শুরু করব?’

‘দেখতেই পাবে।’

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল এরিক, হাতে স্বচ্ছ একটা
কফি-মগ। থিকথিক করছে ভিতরটা। সামান্য পানিতে অন্তত
দু’প্যাকেট কফি মিশিয়েছে ও। ধূমায়িত মগটা সোফার সামনের
সেন্টার-টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ক্রুঁচকে মগের দিকে তাকাল ডেমিয়েন। আবার বিভ্রান্ত

হয়ে গেছে। হতভম্বের মত বলল, ‘এটা কী?’

‘তোমার কফি,’ রানা হাসল। ‘শরীরে গেলেই দেখবে গড়গড় করে শুধু কথা বেরুচ্ছে তোমার মুখ দিয়ে।’

‘মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?’ খ্যাপাটে গলায় বলল ডেমিয়েন। ‘ওটা আমি খাব? খেয়ে কথা বলব? ওই জিনিস পেটে গেলে একটা বস্তু-ই শুধু গড়গড় করে মুখ দিয়ে বেরুতে পারে—বমি!’

‘ছি! ছি! খাবে কেন?’ কপট সুরে বলল রানা। ‘খাবার কথা তো বলিনি। তা ছাড়া নিশ্চিত থাকো, বমিও হবে না তোমার।’

সোফার পাশ থেকে ফাস্ট এইড কিটটা বের করে আনল ও। ভিতর থেকে তুলে নিল একটা সিরিঞ্জ।

ডেমিয়েনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

কফির থিকথিকে মিশ্রণে সিরিঞ্জের মাথা ডোবাল রানা, প্লাজ্জার টেনে টিউব ভরে ফেলল ওটা দিয়ে। ডাক্তারদের ভঙ্গি নকল করল ও, ভরা টিউবটা খাড়া করে বের করে ফেলল বাড়তি বাতাস। মুখে শিস দিয়ে চলেছে।

‘থামো,’ ঘাবড়ে যাওয়া সুরে বলল ডেমিয়েন। ‘তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি ভাবছ না...’

বাধা পেল সে, এরিক এগিয়ে এসে টান দিয়ে তার শার্টটা নামিয়ে ফেলল। বোতাম ছিঁড়ে বুক পর্যন্ত গেল শার্ট, রিঙের মত আটকে ফেলল ডেমিয়েনকে। শিস দিতে দিতে উন্মুক্ত ঘাড়ের উপর সিরিঞ্জটা নিয়ে এল রানা, ডগাটা ঠেকাল জাগিউলার ভেইনে।

‘যিশুর দোহাই!’ চোঁচিয়ে উঠল দুর্বৃত্ত-নেতা। ‘থামো বলছি!’

‘চোপ!’ ধমক দিল এরিক। ‘নোংরা জিন্স দিয়ে যিশুর নাম নিবি না।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ তাড়াতাড়ি বলল ডেমিয়েন।

‘যিশুকে ডাকব না। থামো এবার। পাগল হয়ে যাওনি নিশ্চয়ই?
ও-জিনিস...’

‘শ্শ্শ!’ ঠোঁটে আঙুল চাপল রানা। ‘কথা বোলো না। চোখ বন্ধ করে শুধু উপভোগ করতে থাকো। আমি তোমার রক্ত-চলাচল বাড়িয়ে দেব, মগজে আগুন জ্বেলে দেব। হার্টবিট যখন একশো আশি ছাড়িয়ে যাবে, কে জানে, তুমি হয়তো উড়তেও শুরু করবে...’

‘না!’ ঝটকা দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ডেমিয়েন। পা বাঁধা, শরীরের উর্ধ্বাংশ আটকা পড়ে আছে শার্টের মধ্যে... তাই পুরোপুরি সফল হলো না প্রয়াসটা। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল সে, ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল সেন্টার-টেবিলটা।

‘আহ্!’ বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। ‘ব্যাটা দেখছি বড্ড বেরসিক। মজা পেতে চায় না। এরিক, ধরো ওকে।’

ডেমিয়েনের গায়ের উপর চড়ে বসল এফবিআই এজেন্ট, মাথা কাত করে চেপে ধরল মেঝেতে—নড়াচড়ার আর উপায় রইল না বেচারার। ঘাড়ের শিরাটা একেবারে অরক্ষিত হয়ে গেছে। শান্ত ভঙ্গিতে এগোল রানা, সিরিঞ্জের সুইটা আবার ঠেকাল ওখানে।

‘প্লিজ!’ অনুনয় করল ডেমিয়েন। ‘থামো তোমরা।’

‘কীসের থামাথামি?’ হাসল রানা। ‘শরীরের মেটাবলিজম বাড়বে তোমার। টেম্পারেচার এমন জায়গায় পৌঁছুবে, যাতে শুকনো কাঠির মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে। দেখার মত একটা দৃশ্য হবে বটে!’

‘কিন্তু... কিন্তু...’ কোলা ব্যাঙের স্বর বেরুল ডেমিয়েনের গলা দিয়ে, ‘আমি মরে গেলে কিছুই জানতে পারবে না তোমরা।’

‘সত্যি বলতে কী,’ শীতল গলায় বলল রানা, ‘জানবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি আমি। তোমার উপর ঘেন্না ধরে গেছে। মাথাযও

আগুন জ্বলছে। যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি, আর না। আমার বন্ধুরা খুন হয়েছে, সিদ্ধিকী আমাকে ব্যবহার করেছে, মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে, তোমরা এরিকের উপর পর্যন্ত নির্যাতন চালিয়েছ... এরপর আর কাউকে দয়া দেখানো সাজে না আমার। সবাইকে শাস্তি দেব আমি... সবাইকে! সুযোগ দেবার পরও তুমি যখন আমার কথা শুনছ না, গুরুটা তা হলে তোমাকে দিয়েই হোক।’

সুইটা শিরায় বেঁধাল রানা, এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল সেখান দিয়ে। কেঁপে উঠল ডেমিয়েন। ভয়ার্ত গলায় বলল, ‘বলছি... বলছি আমি সব। ড্রাগ-অ্যাডিকশনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়া। ড. সিদ্ধিকী আসলে মিলিটারির হয়ে কাজ করত...’

‘সেটা আমিও জানি,’ বলল রানা। ‘আমি বিশদ তথ্য চাই।’

‘ওটা একটা গোপন ডিপার্টমেন্ট... স্পেশাল-ওয়েপন ডেভেলপমেন্টের কাজ করে।’ জিভ দিয়ে ঠোট ভেজালো ডেমিয়েন। ‘আ... আমার কাশি আসছে।’

‘চেপে রাখো, কাশলে কিন্তু সুইটা পুরো ঢুকে যাবে। আগে কথা শেষ করো। কাদের ডিপার্টমেন্ট ওটা?’

‘ডিফেন্সের-ই। কিন্তু কাগজে-কলমে কোথাও অস্তিত্ব পাবেন না।’ ভয়ের চোটে সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে দুর্বৃত্ত-নেতা। তুমি থেকে আপনি-তে চলে গেছে রানার সম্মান। ‘ওটা ওদের সাব-সেকশনেরও সাব-সেকশন। স্বাধীনভাবে কাজ করে, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত জবাবদিহি করে না। পেন্টাগনের হাতে-গোনা কয়েকজন শুধু জানে ওটার কথা।’

ছায়া-সংগঠন, বুঝতে পারছে রানা। এ-ধরনের বহু সংগঠন রয়েছে আমেরিকান সরকারের। এরাই পঞ্চাশের দশকে ওয়াশিংটনে এলএসডি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিল, সত্তরের দশকে ইউটা-তে করেছিল নার্ভ-গ্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ও জিজ্ঞেস করল, ‘ড. সিদ্ধিকীর কথা বলো, ওখানে কী নিয়ে গবেষণা

করছিল সে?’

‘ভয়...’ কাঁপতে কাঁপতে বলল ডেমিয়েন। ‘মানুষের ভয় নিয়ে গবেষণা করছিল সিদ্ধিকী।’

নয়

অবিশ্বাস্য কথাটা কয়েক মুহূর্ত ভাসল বাতাসে, রানা অর্থাৎ ঠিকমত অনুধাবন করতে পারল না। যেন নিশ্চিত হবার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কী বললে? ভয়?’

‘ঠিকই শুনেছেন,’ ডেমিয়েন বলল। ‘ড. সিদ্ধিকীর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ভয়... আতঙ্ক।’

আচমকা কথাটা মাথায় ঢুকল রানার। হাতের তালু ঘেমে গেল ওর, ভয়াবহ একটা আশঙ্কা গ্রাস করতে চাইছে অন্তরাত্মাকে। ডেমিয়েনকে বলল, ‘ব্যাখ্যা করো।’

‘বায়ো-কেমিক্যাল একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চালাচ্ছিল ড. সিদ্ধিকী। উদ্দেশ্য—যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন-বাহিনীর প্রতিপক্ষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা... কৃত্রিমভাবে। ওফ, আমার ঘাড়! আপনি সুঁইয়ে চাপ দিচ্ছেন!’

‘শুধু তো চাপ দিচ্ছি, কথা থামালে পুরো কফিটাই পুশ করে দেব। গান গাইতে থাকো!’

‘হ্যাঁ... হ্যাঁ... বলছি। একটা সিনথেটিক হরমোন আবিষ্কার করেছে ড. সিদ্ধিকী—ওটা শরীরের সংস্পর্শে এলে এত বেশি পরিমাণে অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ ঘটায় যে, আতঙ্কে পাগল হয়ে

যায় মানুষ... তাৎক্ষণিকভাবে ।’

নিউ জার্সির হাইড-আউটে হামলাকারীরা কীভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ল রানার। আতঙ্কে মাথাই যেন কাজ করছিল না লোকগুলোর। নিশ্চয়ই ওই হরমোন দিয়ে ওদেরকে কারু করেছে সিদ্দিকী। কিন্তু হরমোনটা কীভাবে ছড়াল সে? দেখা গেল না কেন? ডেমিয়েনের পরের কথায় জবাব পাওয়া গেল প্রশ্নটার।

‘আবিষ্কারটায় খুব খুশি হয় সিদ্দিকীর কন্ট্রোলাররা। কিন্তু সমস্যা হলো, হরমোন জিনিসটা ইনজেক্ট করা ছাড়া কাজ করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে তো আর শত্রুপক্ষের সবার গায়ে ইনজেকশন দেয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যারও সমাধান বের করে সিদ্দিকী, ওটাকে বায়বীয় করে ফেলতে সমর্থ হয়। মানে, হরমোনটা হয়ে যায় এক ধরনের গ্যাস। ব্যস, এবার ওটাকে শুধু ক্যানিস্টারে ভরে বোমার মত ফাটিয়ে দিলেই হলো। চোখের পলকে শত্রুরা আতঙ্কে কুঁকড়ে যাবে, অকেজো হয়ে যাবে—আবিষ্কারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?’

আড়চোখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। ওর অস্বাভাবিক ভীতির কারণটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। অন্তরার বাড়ির বেজমেন্টে সিদ্দিকী একটা গ্যাস-সিলিণ্ডার ফাটিয়েছিল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই শ্বাস টেনে গ্যাসটা শরীরের ভিতর নিয়েছিল সোহানা। তাঁর পর থেকেই বিপদের মুখোমুখি হলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে স্বেচারি, অ্যাড্রেনালিনের বাড়তি নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই আশঙ্কাটা একবার খেলেছিল ওর মনে।

‘আবিষ্কারের পর আসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা,’ বলে চলেছে ডেমিয়েন। ‘প্রথমে ছোট-খাট জীবজন্তুর উপর গ্যাসটা প্রয়োগ করল সিদ্দিকী। হুঁদুর পাগলামি শুরু করল, কুকুর-বেড়াল পরস্পরের ভয়ে গুটি-সুটি মেরে খাঁচার কোণায় পড়ে থাকল; এক পাল ভেড়ার উপর গ্যাসটা দিতেই ওগুলো দৌড়াদৌড়ি শুরু

করল, দেয়ালে মাথা ঠুকে মারা গেল কয়েকটা। সোজা কথায়, অ্যানিমেল টেস্টিঙে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হলো গ্যাসটা।’ একটু থামল ডেমিয়েন। অনুনয়ের সুরে বলল, ‘সিরিঞ্জটা একটু সরাবেন? আমি তো সবই বলছি।’

‘কথা শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে। থেমো না, এরপর কী ঘটল?’

‘বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরবর্তী ধাপ—হিউম্যান টেস্টিং,’ সিরিঞ্জটার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে বলল ডেমিয়েন। ‘রাস্তাঘাটে চলতে থাকা গ্যাং-ভায়োলেস দমনে ব্যবহার করা হলো গ্যাসটা। দেখা গেল, ছোট্ট একটা ক্যানিস্টার ফাটালেই খেপে ওঠা মব্ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।’

‘কিন্তু যে-ফাটাচ্ছে, সে নিজেও আক্রান্ত হচ্ছে না? সেটা ঠেকানো হচ্ছে কীভাবে?’

‘একটা নিউট্রালাইজার আছে, ড. সিদ্দিকী ওটাও আবিষ্কার করেছে। নিউট্রালাইজার নিলে ফিয়ার-গ্যাস আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না,’ ব্যাখ্যা করল ডেমিয়েন। তারপর আবার খেই ধরল আগের কথার। ‘এনিওয়ে, ছোট পরীক্ষাগুলো সফল হওয়ায় এরপর বড় একটা পরীক্ষা করা হলো। কিছুদিন আগে মিসৌরির সেইন্ট লুইয়ে বিশাল এক রিস্কোভ দেখা দিয়েছিল, শুনেছেন হয়তো। ওটা ট্যাকেল করা হয় ফিয়ার-গ্যাসের মাধ্যমে।’

‘কীভাবে?’ জিজ্ঞেস করল এরিক।

‘বিশেষ একদল দাঙ্গা-পুলিশ গিয়েছিল ওখানে, খবরে দেখেছেন হয়তো। ওদের টিয়ার-গ্যাসের সঙ্গে গোপনে মিশিয়ে দেয়া হয় ফিয়ার-গ্যাস। নিউট্রালাইজার দেয়া হয় ব্রিডিং অ্যাপারেটাসে। তারপর নামানো হয় দাঙ্গা দমনে। এরপর কী ঘটেছে, নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন? হাজার হাজার মানুষ... মাত্র’

দেড়শো দাঙ্গা-পুলিশের সামনে টিকতেই পারেনি। ভয়ে-আতঙ্কে আধমরা হয়ে যায় সবাই, পালিয়ে যায় মিছিল-টিছিল বাদ দিয়ে।’

‘অমন ভয়ানক একটা গ্যাস ব্যবহার করা হলো, অথচ মাস-প্যানিক দেখা দেয়নি কেন?’

‘লো-গ্রেডের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল,’ বলল ডেমিয়েন। ‘বিস্মৃদ্ধ জনতা যদি ভয়ের চোটে মরতে শুরু করত, তা হলে বিরাট কেলেক্কারি বেধে যেত। তাই ঝুঁকি নেয়নি ওরা। তবে কেলেক্কারি শেষ পর্যন্ত হয়েই গেছে, সেটাই পুরো ব্যাপারটাকে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।’

‘হেঁয়ালি কোরো না,’ থমথমে গলায় বলল রানা। ‘পরিস্কার করে বলো সব।’

‘বলছি,’ ডেমিয়েন আবার ঠোট ভেজালো। ‘সেইন্ট লুইয়ে লো-গ্রেড গ্যাস ব্যবহার সত্ত্বেও সাফল্য পাওয়ায় আনন্দে আটখানা হয়ে গেল ড. সিদ্দিকীর কন্ট্রোলাররা। অফিশিয়ালি আবিষ্কারটার রিপোর্ট সরকারের কাছে দেবার আগে শেষ একটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা... সৈনিকদের উপরে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নয়, অভিজ্ঞ সৈন্যরাই থাকবে—যারা প্রেশার বা ভয়ের কারণে নতি স্বীকার করে না, লড়াই চালিয়ে যায়। ব্যাটলফিল্ডে গ্যাসের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য তাই বেছে নেয়া হলো আর্মি রেঞ্জারদের একটা ইউনিটকে। গোটা মার্কিন সামরিক বাহিনীতে এরাই সবচেয়ে দক্ষ সৈনিক, জানেন হয়তো। ভয়কে দমন করবার জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয় এদেরকে। তাই এরাই পারফেক্ট গিনিপিগ হয়ে গেল।’

‘ফ্লোরিডার জলাভূমিতে ওদের ট্রেনিং এক্সারসাইজ চলাকালে ছড়িয়ে দেয়া হলো গ্যাসটা। ফলাফলটা হলো ভয়াবহ। আতঙ্কে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল লোকগুলো, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে পরস্পরকে খুন করে ফেলল... একজনও বাঁচল না। কাছাকাছি

১৬৫। একটা দল ছিল, ওদের রাখা হয়েছিল নিউট্রালাইজার-সহ, গাণ্ডে প্রাথমিক রিঅ্যাকশন শেষে অসুস্থ ইউনিটকে উদ্ধার করে আনতে পারে... কিন্তু ওরা কোনও সুযোগই পেল না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেদের খুন করে ফেলেছিল প্রথম দলের সৈনিকরা।

‘এই ঘটনার পর পাল্টে গেল পুরো দৃশ্যপট। পুরো একটা রেঞ্জার ইউনিট এভাবে খুন হয়ে যাওয়া তো আর যা-তা কথা নয়, কোনোভাবেই এতগুলো মানুষের মৃত্যুকে জাস্টিফাই করা সম্ভব নয়। পেণ্টাগনের উঁচু সারির কিছু কর্তা... যাঁরা প্রজেক্টটা সম্পর্কে জানতেন না, তাঁরা হৈচৈ বাধিয়ে দিলেন—পুরো ঘটনার সঠিক তদন্ত, এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বসলেন। সরকার থেকেও সমর্থন দেয়া হলো তাঁদের। এরপরও হয়তো প্রজেক্টের কন্ট্রোলাররা পিছু হটত না, কিন্তু সমস্যা হলো—ফ্লোরিডার এক্সপেরিমেন্টে ফিয়ার-গ্যাসের একটা খুব মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কৃত হওয়ায়। জিনিসটা অস্ত্রধারী মানুষকে হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক বানিয়ে ফেলতে পারে। অর্থটা হলো, যদি কোনোভাবে... এমনকী অ্যাকসিডেন্টালি-ও মিত্রপক্ষের একজন মানুষ ওতে আক্রান্ত হয়, তা হলে সে পুরো বাহিনীর জন্যই বিপদ ডেকে আনবে। বোঝা গেল, এ-ব্যাপারে আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সুযোগ নেই। পেণ্টাগন আর সরকারি বিভিন্ন মহল থেকে রেঞ্জারদের মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পিঠ বাঁচাবার জন্য সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিল কন্ট্রোলাররা, ঠিক করল—পুরো প্রজেক্টটাকে ধামাচাপা দেবে।’

‘আর ড. সিদ্দিকী?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ বিকৃত করল ডেমিয়েন। ‘আমেরিকানরা কীভাবে ধামাচাপা দেয়, জানেন না? সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করে—হোক সেটা

জড় বস্তু, কিংবা জলজ্যান্ত মানুষ!’

‘ড. সিদ্ধিকীকে খুন করতে যাচ্ছিল ওরা?’ রানার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। ‘সেটা কীভাবে হয়? ওঁর মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তো মিলিটারির জন্য বিশাল একটা অ্যাসেট!’

‘পিঠ বাঁচানোর সময় অ্যাসেট-ফ্যাসেট নিয়ে মাথা ঘামায় না আমেরিকানরা,’ বলল ডেমিয়েন। ‘আফটার অল, পুরো প্রজেক্টটার মূল চাবিকাঠিই ছিল সে, কাজেই ওকে তো বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছিল ওরা। সিদ্ধিকীর মত মানুষ বোকা নয়, রেঞ্জারদের মৃত্যু নিয়ে জল ঘোলা হতে দেখেই এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আন্দাজ করে ফেলেছিল। তখনই একটা বিকল্প প্ল্যান আঁটে সে।

‘ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের চর ছিল, তাকে কীভাবে যেন ডিটেস্ট করে ফেলে লোকটা, গোপনে যোগাযোগ করে। একটা প্রস্তাব দেয় সে—ফিয়ার-গ্যাসের ফর্মুলা বিক্রি করবে আমাদের কাছে, বিনিময়ে বাঁচাতে হবে তাকে। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটায় রাজি হই আমরা, সুইস ব্যাঙ্কে লোকটার চাহিদা মোতাবেক টাকা জমা করি, তারপর একটা অপারেশন চালাই ওকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিদ্ধিকী আমাদের সঙ্গে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা করে। লড়াইয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়ে দেয় সে, দুই পক্ষকে পাগল করে দিয়ে ফাঁকতালে কেটে পড়ে...’

‘হুম, ব্যাটা দেখছি জাত-মীরজাফর!’ মন্তব্য করল রানা।

‘কিন্তু পালাল কেন সে?’ বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল এরিক। ‘টাকা পেয়েছে, এরা ওকে উদ্ধারও করতে গিয়েছিল, তারপরও বেঙ্গমানী করল কেন?’

‘কারণ, লোকটা বুঝতে পেরেছে তার আবিষ্কারের মূল্য কতখানি,’ এতক্ষণে ড. সিদ্ধিকীর সাইকোলজি বুঝতে শুরু

করেছে রানা। ‘এরা ওকে উদ্ধার করত ঠিকই, কিন্তু ফর্মুলাটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুনও করে ফেলত; যাতে ওটা আর কেউ না পায়। গোটা ব্যাপারটা ওর চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যেতেই পাশার ছক পাল্টে ফেলেছে সে, ঠিক করেছে: আবিষ্কারটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে। সিদ্ধিকী উধাও হয়ে যেতে চায়, এরিক। অদৃশ্য হয়ে ফর্মুলাটা বিভিন্ন পার্টির কাছে বিক্রি করতে চায়। বিনিময়ে অজস্র টাকা আর অপারিসীম ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবে সে—দ্যাটস্ হিজ আলটিমেট গোল।’

‘সিদ্ধিকীর কন্ট্রোলাররাও জানে সেটা,’ ডেমিয়েন যোগ করল। ‘সেজন্যেই ওকে খুন করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে। আমাদেরকেও তাই মরিয়া হতে হয়েছে... যেভাবে হোক, আমেরিকানদের আগে ওকে হাতে পেতে হবে। এজেন্ট স্টার্ন এফবিআই-য়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে...’

‘কারা তোমরা?’

‘ওটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই,’ গলায় দৃঢ়তা ফোটাল ডেমিয়েন। ‘এতক্ষণ এত কথা বলেছি, তার ফলে কারও কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। তারমানে এই নয় যে, নিজেদের সংগঠনের পরিচয়ও বলে দেব। আমি একজন আদর্শবাদী লোক, দরকার হলে মরব, তা-ও আদর্শের সঙ্গে বেঙ্গমানী করতে পারব না...’

‘কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি একজন টেরোরিস্ট!’ রানা বিদ্রূপ করল।

‘যা খুশি ভাবতে পারেন, কিন্তু আমাদের সত্যিকার পরিচয় আপনি কোনোদিনই জানতে পারবেন না।’

‘তোমার মত মাথামোটাদের পরিচয় জানার কোনও আগ্রহ বোধ করছি না,’ সিরিঞ্জ সরিয়ে টান দিয়ে ডেমিয়েনকে দাঁড় করাল রানা। ‘তারচেয়ে বরং কচলে তোমার রস বের করবার জন্য বেশি

আগ্রহী আমি। কিছুটা তো বের হয়েইছে, বাকিটা বের করব জায়গামত নিয়ে।’

‘জায়গামত! কোথায়?’ বোকা বোকা কণ্ঠে প্রশ্ন করল টেরোরিস্ট।

‘এখুনি দেখতে পাবে,’ এরিকের দিকে তাকাল রানা। ‘তুমি এবার অফিসে খবর দিতে পারো।’ ডেমিয়েনের তিন সঙ্গীকে দেখাল ও। ‘ওদেরকে অ্যারেস্ট করো, কিন্তু পালের গোদাটাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।’

‘কোথাও যাব না আমি!’ প্রতিবাদ করল ডেমিয়েন। করুণ দৃষ্টিতে তাকাল এরিকের দিকে। ‘রাজি হবেন না, প্লিজ! আপনার এই বন্ধু পাগল, আমাকে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলবে।’

একটু গম্ভীর হলো এরিক, তারপর ফিরল রানার দিকে। ‘আপনার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই।’ বলে সোহানার দিকে তাকাল রানা। ‘এদেরকে কাভার দাও।’

এরিকের পিছু পিছু বেডরুমে গেল ও।

দরজা ভেজিয়ে এফবিআই এজেন্ট বলল, ‘আপনার মতলবটা কী, জানতে পারি?’

‘লোকটাকে আমার দরকার। সিদ্ধিকীর ল্যাব চেনে ও, ওখানে গেলে শয়তান বিজ্ঞানীটার ব্যাপারে কোনও না কোনও ক্লু পাব বলে মনে হচ্ছে।’

‘তা হয় না, মি. রানা। ডেমিয়েন এখন এফবিআই-য়ের বন্দি, ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।’

‘বন্দি! আমি তো হ্যাণ্ডকাফ পরাতে দেখলাম না।’ হালকা গলায় বলল রানা।

‘আমাকে দশ সেকেণ্ড সময় দিলেই ওটা দেখিয়ে দিতে পারি,’ এরিক ঠাট্টা করছে না।

‘সময়টা দু’ঘণ্টা হলে কেমন হয়?’

‘মানে?’ এরিক ভুরু কৌচকাল।

‘ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো ব্যাপারটা,’ রানা বলল। ‘তোমাদের কাস্টডিতে চলে গেলে আইনমারফিক কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করবে ব্যাটা। তখন আর কোনও চাপ অনুভব করবে না, কাজেই মুখেও খিল আঁটবে।’

‘একজন এফবিআই এজেন্টকে কিডন্যাপ করেছে ও—ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ। কেউ কোনও দয়া দেখাবে না। ওর পেট থেকে সমস্ত কথা বের করে ছাড়ব আমরা।’

‘তোমাদের সমস্ত ইন্টারোগেশন টেকনিক সম্পর্কে জানা আছে আমার, এরিক। কাজ হয় না তা বলব না, তবে প্রচুর সময় লাগে। অত দেরি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, গন্ধ মিলিয়ে যাবার আগেই সিদ্ধিকীর ট্রেইল খুঁজে পেতে হবে আমাকে। তার জন্য এ-মুহূর্তে ডেমিয়েনই আমার একমাত্র সম্বল। আই নিড হিম।’

‘দুঃখিত, মি. রানা। আমি নিরুপায়। ওর মত একটা টেরোরিস্টকে যেতে দিলে আমি বিপদে পড়ব।’

‘আমিও নিরুপায়, এরিক। তুমি রাজি না হলে আমাকে জোর খাটাতে হবে।’

‘আপনি এত খেপেছেন কেন, বলুন তো?’ বিরক্ত গলায় বলল এরিক। ‘ড. সিদ্ধিকীর খোঁজই তো দরকার, তাই না? আমাকে হ্যাণ্ডেল করতে দিন ব্যাপারটা, লোকটার লোকেশন বের করে আমি খবর দেব আপনাকে।’

‘তা হয় না,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পরিস্থিতি খুব গুরুতর; যত দ্রুত সম্ভব, বিজ্ঞানীটাকে খুঁজে পেতে হবে আমাকে।’

‘গুরুতর পরিস্থিতি মানে? কী হয়েছে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘সোহানা... ওকে অন্তরার বাড়িতে ফিয়ার-গ্যাসের একটা ডোজ দিয়েছে সিদ্দিকী। দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে জানি না, কিন্তু ভয়ানক কিছু ঘটবার আগে শুধু সিদ্দিকীকে নয়, সিদ্দিকীর ওই নিউট্রোলাইজারটাও পেতে হবে আমাকে।’

‘হায় যিশু!’ প্রায় হাহাকার করে উঠল এরিক। ‘আ... আমার জানা ছিল না, মি. রানা। সত্যি আমি দুঃখিত... ডেমিয়েনকে নিতে চাইছেন তো? নিন, এখুনি নিয়ে যান। এদিকটা নিয়ে ভাববেন না, আমি সামলে নেব যেভাবে পারি।’

‘নিজের ঘাড়ে দোষ নেবার দরকার নেই,’ রানা বলল। ‘দু’ঘণ্টা অপেক্ষা করো, আমাকে একটু লিড-টাইম দাও, তারপর অফিসে বলে দিয়ো, আমি এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি ওকে তোমার কাছ থেকে...’

‘আহ, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে,’ বাধা দিয়ে বলল এরিক। ‘আমি আছি না! আপনি যান এখুনি।’

দরজার কাছে গিয়ে থামল রানা, উল্টো ঘুরল। ‘থ্যাঙ্ক ইউ, এরিক। তুমি আসলেই একজন খাঁটি লোক, এবং... খাঁটি বন্ধু। আমাকে আবারও ঋণী করে ফেললে...’

‘থামুন তো!’ কপট রাগ দেখাল এরিক। ‘এমনি এমনি সাহায্য করছি ভাবছেন? আপনাকে ঋণী করতে পারলে লাভ আছে, বিপদে-আপদে খুব কাজে দেয়!’

হাসল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিভিংরুমে। উদাত্ত গলায় বলল, ‘চলো ডেমিয়েন, আমরা একটু সাইট-সিয়িঙে বেরুব। দর্শনীয় একটা জায়গায় তুমি নিয়ে যাবে আমাদেরকে।’

‘ওহ্ গড!’ গুঙিয়ে উঠল টেরোরিস্ট।

টরাসের সামনে, সোহানার পাশে প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসানো হয়েছে ডেমিয়েনকে। রানা বসেছে ঠিক তার পিছনে—কোলের উপর, একটা খবরের কাগজের তলায় রেখেছে সিগ-সাওয়ারটা। বন্দি লোকটা চালাকি করতে গেলেই গুলি করবে। বেইলি'জ রিজে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে টেরোরিস্ট। জানিয়েছে, ফাঁদের টোপটা একেবারে ভুয়া ছিল না; ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর গবেষণাগারটা আসলেই ওখানে।

বিকেল চারটে বাজে। ওয়াশিংটন ছেড়ে একশ' মাইল পশ্চিমে এসে পড়েছে ওরা। সামনে ভার্জিনিয়া সীমান্তের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি। ছোট-খাট বেশ কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদী জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। এলাকাটা কৃষিপ্রধান।

একে এলাকায় মানুষজন কম, তারওপর পড়ন্ত বেলা... রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। যাত্রাটা একঘেয়েভাবে কাটছে। গাড়ি বড় একটা ঢাল পেরিয়ে আসতেই ঘড়ি দেখল রানা, তারপর ডেমিয়েনকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূর?'

'এই তো, পাঁচ মিনিটের পথ। একটু পরেই পৌঁছে যাব।'

'সকালে যে-দুজনকে রেখে গেছ, ওরা আবার অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে নেই তো?'

‘কী যে বলেন!’ আহত কণ্ঠে বলল ডেমিয়েন। ‘আপনার সামনেই না ফোন করে ওদেরকে চলে যেতে বললাম। সঙ্কেতও দিইনি। ওদেরকে বসিয়ে রেখে খামোকা গুলি খাব নাকি?’

রাস্তার পাশে লাগানো একটা সাইনবোর্ড পেরুল টরাস। ওটায় বেইলি’জ রিজের নাম লেখা। সোহানা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, ‘শহরটা কোথায়? বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না।’

‘বেইলি’জ রিজ কোনও শহর নয়,’ উত্তর দিল ডেমিয়েন।

‘তা হলে?’

‘ঐতিহাসিক একটা সাইট, ওখানে আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় একটা বিখ্যাত লড়াই হয়েছিল।’

একটু পরেই পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা, নীচে সমতল উপত্যকা চোখে পড়ছে। সামনেই রয়েছে হিস্টোরিকাল সোসাইটির লাগানো একটা বিশাল বিলবোর্ড। ওটার পাশে গাড়ি থামাল সোহানা।

বিলবোর্ডে ম্যাপ রয়েছে, তাতে লাল-নীল বিন্দু আর তীরচিহ্ন দিয়ে কনফেডারেট ও ইউনিয়ন সোলজারদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তলার বসানো হিস্টোরিকাল নোট পড়ে জানা গেল, দু’পক্ষের তুমুল লড়াইয়ে এখানকার একটা খামার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—ওটার মালিক ছিল স্যামুয়েল বেইলি নামে এক আইরিশ ইমিগ্র্যান্ট। অতর্কিত হামলায় বেচারার স্ত্রী-কন্যা মারা যায়। এতে খেপে যায় লোকটা, নিহত এক ইউনিয়ন সোলজারের ইউনিফর্ম আর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। হারের মুখে পড়া ইউনিয়ন বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় সে, খামারের পার্শ্ববর্তী পাহাড়সারির মাঝ দিয়ে কৌশলে একটা আক্রমণ হেনে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ফেলে। সেই স্মৃতির সম্মানে জায়গাটার নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। বেইলি অবশ্য ওসব দেখে যেতে পারেনি, ক্যাপ্টেন হিসেবে ইউনিয়নে কমিশন দেয়া

হয়েছিল তাকে। একটার পর একটা যুদ্ধ করে গেছে, শেষে মারা গেছে ডিপথেরিয়ায়। নিজের খামার বা স্ত্রী-কন্যার কবরের কাছে ফিরে আসা হয়নি আর কোনোদিন।

করুণ কাহিনি, মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষকে কীভাবে বদলে ফেলে, কীভাবে প্রিয়জনকে কেড়ে নেয়—তার জলজ্যান্ত নমুনা বেইলির গল্পটা। নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তারপর ডেমিয়েনকে জিজ্ঞেস করল, ‘এবার কোন্‌দিকে?’

‘এসে গেছি,’ বলল টেরোরিস্ট। ‘একটু সামনে এগোলেই কতগুলো চওড়া ফাটল দেখতে পাবেন... রাস্তার মত... নীচের উপত্যকায় নামা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে নামতে হবে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি সামনে বাড়াল সোহানা। প্রথম ফাটলের পাশে পৌঁছুতেই রানা নির্দেশ দিল, ‘মোড় নাও।’

‘এটা না,’ তাড়াতাড়ি বলল ডেমিয়েন। ‘পরেরটা।’

‘আমরা এটা দিয়েই নামব,’ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ডেমিয়েন। কারণটা বুঝতে পারছে—ওকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করছে না রানা। ধরেই নিচ্ছে, দ্বিতীয় ফাটলটায় ফাঁদ পাতা আছে। সেজন্য ওপথে যাচ্ছে না।

ফাটলের মুখে গাড়ি দাঁড় করাল সোহানা, নেমে গিয়ে দেখল সামনেটা। বড় একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে রয়েছে ফাটলের মুখটা, ভাল করে তাকাতেই ওখানে একটা নিচু কাঠের গেট চোখে পড়ল। পুরনো, কালের প্রবাহে বিবর্ণ হয়ে গেছে পেইন্ট। কোনও তালা চোখে পড়ল না, শুধু একটা বড় ছিটকিনি দিয়ে আটকানো হয়েছে গেট। ওটা খুলে ফেলল সোহানা, ধাক্কা দিয়ে পাল্লা সরাল। ওপাশে নানা রকম আগাছায় ছাওয়া গিরিসঙ্কট—পথটা অব্যবহৃত।

‘আগে সাইটে নামবার জন্য ভাল রাস্তা ছিল না,’ ডেমিয়েন

ব্যাখ্যা করল। ‘সবগুলো ফাটল দিয়ে ওঠানামা করত লোকে। কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ফাটলটার ভিতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে—ওটাই সবচেয়ে চওড়া ফাটল। গাড়ি নিয়ে যেতে সুবিধা, তাই বলছিলাম ওখান দিয়ে যাবার কথা।’

‘হুম,’ রানা বলল। ‘গতকাল নিশ্চয়ই ওটার মুখেই আমাদের জন্য ফাঁদ পেতেছিলে?’

‘কী! ইয়ে... হ্যা...’ মুখ কালো হয়ে গেল ডেমিয়েনের।

‘নাইস ট্রাই, ডেমিয়েন!’ ইচ্ছে করেই পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অন-অফ করল রানা।

‘না, না!’ আঁতকে উঠল টেরোরিস্ট। ‘বিশ্বাস করুন, আমার কোনও বদমতলব নেই। ওখানে তো আমার লোকেরা এখন নেই! ওরা চলে গেছে!’

‘না-ও তো গিয়ে থাকতে পারে। একটা চান্স নিয়ে দেখতে চেয়েছ, তাই না?’

‘না, না...’

‘চুপ!’ চাপা স্বরে ধমক দিল রানা। ‘আর কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না। যথাসময়ে এই চালাকির জন্য শাস্তি পাবে তুমি।’

কথাটা শুনে কুঁকড়ে গেল ডেমিয়েন।

সোহানা ফিরে এসেছে। ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, ‘সামনেটা ক্রিয়ার মনে হচ্ছে। এগোব?’

‘এগোও,’ রানা মাথা ঝাঁকাল। ‘তবে বেশিদূর না। একটু ভিতরে গিয়েই পার্ক করো। আমরা হেঁটে নামব।’

সরু গিরিসঙ্কটের এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে নামতে শুরু করল টরাস—আগাছার দঙ্গল পিষ্ট করে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পর ব্রেক কষল সোহানা, বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে পড়েছে গিরিসঙ্কটের; রাস্তা এবং নীচের উপত্যকা—দুটোরই দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

‘ঠিক আছে?’ জানতে চাইল ও।

‘একদম পারফেক্ট,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। সিগ-সাওয়ার দিয়ে খোঁচা দিল বন্দির পিঠে। ‘নামো।’

ডেমিয়েনকে সামনে রেখে পিছু পিছু নামতে শুরু করল রানা-সোহানা। ঢালু পথ ধরে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল গিরিসঙ্কট থেকে, উপত্যকার মেঝেতে। খুব একটা বড় নয় উপত্যকাটা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সবদিক আধ-মাইলের মত হবে। চারপাশের পাহাড়শ্রেণীর গোড়া উঁচু উঁচু গাছ আর গোড়ালি-সমান ঘাসে ছাওয়া, এ-ছাড়া মাঝখানের পুরো জায়গাই রুক্ষ-অনুর্বর। এক মুঠো সবুজ নেই কোথাও। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে, এমন খটখটে জমি কখনও খামার করবার জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। কে জানে, হয়তো বা স্যামুয়েল বেইলির আমলে সুজলা-সুফলা ছিল এই জমি, অনাদরে এ-দশা হয়েছে আজ। এখন অবশ্য জায়গাটা দেখে ওসব ভাবা কঠিন। অতীতের চিহ্ন বহন করে একটা ভাঙাচোরা ফার্মহাউস শুধু দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানটায়—প্রেতাত্মার মত। দেয়াল পুড়ে কালো হয়ে আছে—এ কি সেই গৃহযুদ্ধের নিদর্শন, নাকি পরের কোনও অগ্নিকাণ্ড, তা বলা মুশকিল।

গাছের ছায়ায় একসারি পিকনিক বেঞ্চ দেখতে পেল ওরা, সেই সঙ্গে একটা সাইনবোর্ড: ওয়েলকাম টু বেইলি’জ রিজ। ঐতিহাসিক গুরুত্বের স্বীকৃতি বলতে এটুকুই। পাহাড়ের উপরে বিলবোর্ড, আর এখানে এই সাইনবোর্ড ও দর্শনার্থীদের বসবার জন্য বেঞ্চ। চরম সরকারি অবহেলার দৃষ্টান্ত। রানা অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছে না, ওর দৃষ্টি পিকনিক-বেঞ্চগুলোর দিকে। সিগারেটের পোড়া অবশিষ্টাংশ আর ফেলে দেয়া চকচকে ড্রিঙ্কসের ক্যান দেখতে পাচ্ছে পাশে। ডেমিয়েনের লোকেরা ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য, এখন অবশ্য তাদের চিহ্নও দেখা

যাচ্ছে না। হয়তো সত্যি চলে গেছে।

‘ল্যাব কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল সোহানা। ‘আমি তো স্রেফ একটা পোড়া ফার্মহাউস ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’

‘ওখানেই... মাটির নীচে,’ জানাল ডেমিয়েন। ‘গোপন গবেষণা কখনও সবাইকে দেখিয়ে-শুনিয়ে হয় না।’

‘এগোও,’ নির্দেশ দিল রানা।

ঘাসে ঢাকা অংশটা পেরিয়ে ফার্মহাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করল ডেমিয়েন, সোহানা-সহ তাকে অনুসরণ করল ও। সিগ-সাওয়ারটা এখন কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে, ওখান থেকেই তাক করে রেখেছে বন্দির দিকে—শয়তানির সুযোগ দিতে চায় না। কেন যেন একটা অস্বস্তি ভর করেছে উপত্যকায় নামার সঙ্গে সঙ্গে।

‘গোপন ল্যাবরেটরি বসানোর জন্য এমন একটা ঐতিহাসিক সাইট খুব অদ্ভুত জায়গা না?’ বলল সোহানা। ‘দর্শনার্থীর আনা-গোনা থাকে এসব জায়গায়, গোমর ফাঁস হয়ে যাবার ভয় থাকে।’

‘এত কাঁচা কাজ করেনি ওরা,’ বলল ডেমিয়েন। ‘ভালমত দেখে-শুনেই বেছেছে জায়গাটা। ওয়াশিংটনের কাছাকাছি এমন নির্জন জায়গা আর কোথাও পাবেন না। তা ছাড়া নামেই এটা পুরাকীর্তি, দর্শক-টর্শক খুব একটা আসে না। অল্প-স্বল্প যা আসত, তা-ও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রিনোভেশনের অজুহাত দেখিয়ে। ভাল রাস্তাটা দিয়ে এলে দেখতে পেতেন নোটিশটা।’

‘সংস্কার অবশ্য আসলেই দরকার,’ পোড়া ফার্মহাউসের উপর নজর রেখে মন্তব্য করল সোহানা। ‘সেই কবে গৃহযুদ্ধ হয়েছে, এখনও এমন একটা পুরাকীর্তিকে পোড়া অবস্থায় ফেলে রাখা অন্যায়।’

‘এটা বেইলির ফার্মহাউস ভাবছেন নাকি?’ একটু হাসল

ডেমিয়েন। ‘ওটা তো কবেই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে! সেই ১৮৬৪ সালে!’

‘তা হলে এটা কোথেকে এল? ডিজাইন দেখে তো সেই তখনকারই মনে হচ্ছে।’

‘যুদ্ধশেষে জায়গাটা কিনে নেয় এক ব্যবসায়ী—সরকারের কাছে যুদ্ধের সময় অস্ত্র আর গোলাবারুদ বেচে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল লোকটা। বেইলির ফার্মহাউসের জায়গায় নতুন আরেকটা ফার্মহাউস তৈরি করে সে—আরও সুন্দর, আরও আলিশান করে। তবে বেশিদিন এখানে থাকা হয়নি তার, কুষ্ঠরোগে ঝুঁকে ঝুঁকে মারা গেছে বাড়িতে ওঠার তিন বছরের মাথায়। বিপত্তীক ছিল বেচারী, ছেলে-পুলেও ছিল না। সংক্রমণের ভয়ে চাকর-বাকর সব পালিয়ে গিয়েছিল, একদম একা হয়ে গিয়েছিল সে শেষ দিনগুলোয়। ওর মৃত্যুর পর একটা কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল বেইলির জমি ঘিরে। হাজার হোক, ওখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রোগ মিলিয়ে অনেক মানুষ মরেছে। ফলে কেউই ওই জমি কিনতে রাজি হলো না। ব্যবসায়ীর কোনও উত্তরাধিকারীও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ওটা সরকারের খাতায় চলে গেল। জায়গাটা ম্যানেজ করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি সিদ্ধিকীর কন্ট্রোলারদের।’

‘তুমি দেখছি এখানকার ইতিহাস খুব ভাল করে জানো!’
বিস্মিত গলায় বলল রানা।

‘জব রিকোয়ারমেন্ট,’ ভাবলেশহীন গলায় বলল ডেমিয়েন। ‘অ্যাসল্টে নামার আগে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে হয়—ভূগোল থেকে শুরু করে ইতিহাস পর্যন্ত।’

‘অ্যাসল্ট... এখানেই হামলা করা হয়েছিল ড. সিদ্ধিকীকে উদ্ধার করবার জন্যে? তুমিও ছিলে অপারেশনটাতে?’

মাথা ঝাঁকাল ডেমিয়েন। ‘সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, না

দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। অপারেশনটা আসলে খুব একটা কঠিন ছিল না। ফার্মহাউসটায় থাকত সিদ্ধিকী, ওকে পাহারা দিত মাত্র পাঁচজন মেরিন। লোকটাকে নিয়ে কট্রোলাররা খুব একটা চিন্তিত ছিল না, আমি হলেও চিন্তা করতাম না। অমন গো-বেচারার, মোটাসোটা একটা লোককে সামলাবার জন্য পাঁচজনই অনেক। আর আমাদের দলে ছিল বিশজন, ওদেরকে এক আঘাতেই কাবু করে ফেলতাম।

‘গোলমাল হয়ে গেল অ্যালার্ম বেজে ওঠায়—ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক, কারণ হামলা চালাবার আগে সব ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম একেজো করে দিয়েছিলাম আমরা। কোন্‌খান দিয়ে যে আরেকটা রয়ে গেল, সেটা টেরই পাইনি। যা হোক, অ্যালার্ম বাজতেই সতর্ক হয়ে গেল মেরিনরা, আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারলাম না। দু’পক্ষের ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। এর ভিতরই দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকলাম আমরা, আর তার ঠিক কয়েক মিনিট পরই পুরো বাড়িতে আগুন ধরে গেল। শুধু তা-ই নয়, আগুন ধরতে না ধরতে আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল দু’পক্ষই। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, শত্রু-মিত্র বাহুবিচার না করে খুন করতে শুরু করল একে-অন্যকে। আগুন বা গুলিতে যারা মরল না, তারা মরল তীব্র আতঙ্কে... হার্টফেল করে!’

‘তুমি বাঁচলে কী করে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সৌভাগ্যক্রমে ব্যাকআপ টিমে ছিলাম আমি, আরও চারজন-সহ। বাড়ির ভিতরে ঢুকিনি আমরা, তাই বেঁচে গেছি। কিন্তু ওখানে চলতে থাকা তাগুব দেখে আসল ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের। পুরো ব্যাপারটাই সাজিয়েছে সিদ্ধিকী—অ্যালার্ম বাজিয়েছে, বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে, ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়েছে। উদ্ধার হতে চায়নি লোকটা, পালাতে চেয়েছে। ডাইভারশন সৃষ্টি করেছে সেজন্যেই। ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা

বনে গিয়েছিলাম আমরা, ওই ফাঁকে কেটে পড়েছে বদমাশটা। ওই ঘটনার পর কন্ট্রোলাররা ওকে খুন করবার জন্য পাগল হয়ে গেছে, আমরাও চেষ্টা করছি তাকে বাগে পাবার জন্য। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে হারামজাদা, কিন্তু ফর্মুলা দেয়নি। উল্টো আমাদের লোকজনকেই কোরবানির খাসি বানিয়েছে...’

এবার রানা বুঝতে পারছে, কেন রানা এজেন্সির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ড. সিদ্দিকীর। আমেরিকান মিলিটারি, আর এদের মত টেরোরিস্ট গ্রুপ পিছনে লাগলে তার মত একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা স্রেফ অসম্ভব। একমাত্র নিখুঁত রিলোকেশনের মাধ্যমেই বাঁচতে পারে সে, আর সেটা নিশ্চিত করা সম্ভব রিলোকেশনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে। লোকটার প্ল্যানিং দেখলে অবাক হতে হয়, ঝোঁকের বশে কিছু করেনি সে। সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ছক সাজিয়েছে, সেটাকে কাজে পরিণত করেছে নিপুণভাবে। যতই ভাবছে, ততই মাথায় আগুন জ্বলছে রানার। সাহায্য চাইবার আগেই লোকটা ওকে আর ওর সঙ্গী-সাথীদের খুন করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল বুঝতে পেরে।

‘ল্যাবটা এখনও আছে কি না, জানো?’ কোনোমতে রাগ দমিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

‘ল্যাব আছে, তবে ল্যাবের ভিতরে কিছু নেই। আমেরিকানরা সমস্ত লাশ আর লড়াইয়ের আলামত পরিষ্কার করবার পর আমি একবার ঢুঁ মেরেছি ওখানে। ফর্মুলাটা সিদ্দিকীর কাছে। অন্যান্য যত ইকুইপমেন্ট আর কাগজপত্র ছিল, সব সরিয়ে ফেলেছে কন্ট্রোলাররা। আপনি ওখানে লোকটার ব্যাপারে কোনও ক্লু পাবেন না। আপনার বান্ধবীকেও বাঁচাবার মত কিছু নেই ওখানে।’

‘খামো!’ গর্জে উঠল রানা। ‘কী বললে তুমি?’

ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ডেমিয়েন, মুখে একটা কপট হাসি ফুটে রয়েছে। বলল, ‘আমি বোকা নই, মিস্টার। আপনার বান্ধবীর অবস্থা দেখে ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সিম্পটমগুলো সিরিয়াস আকার ধারণ করেনি বটে, তবে ওগুলো ফিয়ার-গ্যাসেরই উপসর্গ। আপনার জায়গায় আমি হলে ওঁর হাতে কোনও অস্ত্র দিতাম না।’

সোহানার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সিদ্ধিকীর আবিষ্কারের কাহিনি শুনে ও-ও অনেক আগে বুঝতে পেরেছে সমস্যাটা, কিন্তু ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে সামনে না আসায় নিজেকে সামলে রেখেছিল। এখন সে-পর্দা সরে গেছে।

ওর দিকে একবার তাকাল রানা, দৃষ্টিতে অভয় দেয়ার চেষ্টা। এরপর চোখ ফেরাল বন্দির দিকে। ‘ঝেড়ে কাশো, ডেমিয়েন। ফিয়ার-গ্যাসের প্রভাব এবং প্রতিষেধক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি।’

‘তা হলে ঠিক সন্দেহই করেছি?’ হাসল টেরোরিস্ট। ‘সরি, মিস্টার। এই গ্যাসের কোনও চিকিৎসা নেই। আপনি আপনার বান্ধবীর আশা ছেড়ে দিতে পারেন।’

‘আমি সেটা বিশ্বাস করি না,’ রানা-মাথা নাড়ল। ‘গ্যাসটার কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ আছে আমার। তোমার ভাষ্যমতে ওটায় আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যায় মানুষ, খুনোখুনি শুরু করে, হার্টফেল করেও মারা যায়। কিন্তু আমার বান্ধবীর বেলায় তেমন কিছু ঘটেনি। প্রায় দু’সপ্তাহ আগে সিদ্ধিকীর সঙ্গে এনকাউন্টার হয়েছে আমাদের, এখনও তো স্বাভাবিক আছে ও। হ্যাঁ, একটু ভয় পাচ্ছে, নার্ভাস বোধ করছে... এমনটা হতেই পারে।’

‘দু’সপ্তাহ!’ ভুরু কঁচকাল ডেমিয়েন। ‘হুম, একটু অস্বাভাবিক তো বটেই। তবে গ্যাস যদি লো-গ্রেডের হয়, সেই সঙ্গে কম

পারমাণে টেনে থাকেন, তা হলে এমনটা হতে পারে।’

‘সেইন্ট লুইয়ের এক্সপেরিমেন্টের মত?’

‘ওটা ছিল নন-লেথাল ডোজ। হরমোনের কনসেন্ট্রেশন রেট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের চাইতেও কম। ওটা মানুষের শরীর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মল-মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে আতঙ্কটা হয় সাময়িক, জীবন-সংশয়ীও নয়। কিন্তু আপনাকে বা আপনার বান্ধবীকে তো এত দয়া দেখানোর কথা নয় লোকটার।’

‘তা হলে লো-গ্রেড গ্যাস ব্যবহার করবে কেন?’

‘ইচ্ছে করে হয়তো করেনি। আইডিয়াল ল্যাবরেটরি কণ্ঠশন না পেলে সর্বোচ্চ মাত্রার গ্যাস বানানো সম্ভব নয়, তা ছাড়া যে-সব কেমিক্যাল দিয়ে ওটা তৈরি হয়, সেগুলোর গুণগত মানেরও একটা ব্যাপার আছে। হয়তো কোয়ালিটি মেইনটেন করতে পারেনি সিদ্ধিকী।’

যুক্তি আছে ডেমিয়েনের কথায়। ভেবে দেখল রানা, সেফ-সাইটে ড. সিদ্ধিকীর কাছে আগে-বানানো ফিয়ার-গ্যাস ছিল না, অন্তরার বাড়িতে যাবার আগে বানিয়েছে ওটা। কেমিক্যাল কিনতে হয়েছে স্থানীয় দোকান থেকে, ল্যাবরেটরিও পায়নি বানাবার জন্য। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবেই সম্ভবত লো-গ্রেড গ্যাস বানাতে হয়েছে তাকে।

আশার আলো দেখতে পেল রানা, সোহানার দিকে তাকাল উজ্জ্বল চোখে। ‘তার মানে তোমার ট্রিটমেন্ট হতে পারে, সোহানা। আমাদের শুধু নিউট্রালাইজারটা দরকার।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ ওর আশাতে পানি ঢেলে দিল ডেমিয়েন। ‘নিউট্রালাইজারটা তৈরি হয়েছে গ্যাসের সংস্পর্শে যাবার আগে ব্যবহার করবার জন্য। ওটা দিয়ে যে ইনফেক্টেড মানুষকে সারানো যাবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই।’

‘তা হলে রেঞ্জার টিমটাকে কীভাবে বাঁচাত ওরা?’

‘তখন গ্যাসটার ভয়ঙ্কর প্রভাব সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না, মিস্টার। ওদেরকে বাঁচাবার আসলে কোনও উপায়ই ছিল না। শোনো, এসব আমি ভয় দেখাবার জন্য বলছি না। আমাদেরকে একটা লিখিত ব্রিফ পাঠিয়েছিল সিদ্দিকী, ওটাতে বলা আছে—লেথাল ডোজের আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। যত সামান্যই তার শরীরে যাক না কেন, সেটা নার্ভকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেবেই।’

‘ওটাকে ধ্রুব সত্য ভাবার কোনও কারণ নেই। সিদ্দিকী তার আবিষ্কার বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল। তোমাদের আগ্রহ জাগাবার জন্য অনেক কিছুই সে বাড়িয়ে লিখতে পারে।’

‘খামোকা নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছ, মিস্টার। আমার পরামর্শ হলো, এখনি তোমার বান্ধবীকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। হয়তো ডাক্তাররা চেষ্টা করলে কিছু করতে পারবে ওর জন্যে...’

‘তোমার উপদেশ চাইনি আমি,’ পিস্তল নাড়ল রানা। ‘পথ দেখাও। ল্যাবটা তন্ন তন্ন করে খুঁজব আমি। কন্ট্রোলাররা হয়তো সবকিছু সরাতে পারেনি। ল্যাবের ভিতরে কোথাও নিউট্রাইলাজার বা গ্যাসের ফর্মুলা, কিংবা কোনও নমুনা লুকানো থাকতে পারে।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল ডেমিয়েন। হাঁটতে শুরু করল ফার্মহাউসের দিকে। বেশি সময় লাগল না ওখানে পৌঁছতে। বাড়িতে ঢুকল না টেরোরিস্ট, পোড়া ভবনটাকে পাশ কাটিয়ে পিছনের আঙিনায় নিয়ে গেল রানা আর সোহানাকে, ওখানে আগুনে পোড়া একটা আস্তাবল দেখা গেল।

‘এটার তলাতে ল্যাব,’ কংক্রিটের মেঝেতে পা ঠুকল ডেমিয়েন। ‘এন্ট্রান্সটা ওই যে।’ আঙুল তুলে হ্যাচের মত একটা স্ল্যাব দেখাল।

চারপাশে নজর বোলাল রানা। আগুনে বাড়ির চেয়ে আস্তাবলের বেশি ক্ষতি হয়েছে—ছাদ-টাদ আর অবশিষ্ট নেই, প্রায় কয়লা হয়ে যাওয়া কাঠের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে। একটু খটকা লাগল ওর—বাড়ি আর আস্তাবলের মাঝখানে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরত্ব। একই সঙ্গে দু'জায়গায় আগুন লাগাল কীভাবে ড. সিদ্দিকী? প্রশ্নটা ডেমিয়েনকে করতেই হাসল।

‘সিদ্দিকী শুধু বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে,’ বলল সে। ‘এটায় লাগিয়েছে কন্ট্রোলারদের ক্লিনআপ টিম—সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করবার জন্য। ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে বোঝানো হয়েছে যে, দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে বাড়ি-আস্তাবল... সব পুড়ে গেছে।’

‘হুম, ভালই গল্প ফেঁদেছে।’

‘ওদের কাজে কোনও খুঁত পাবেন না...’

কথা শেষ হলো না ডেমিয়েনের, বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজের সঙ্গে আচমকা তাকে ঝাঁকি খেতে দেখল ওরা। রানা-সোহানার বিস্ফারিত চোখের সামনে খুলির একটা অংশ উড়ে গেল তার, মগজ-রক্ত ছিটকাল ফুলঝুরির মত। কাটা কলাগাছের মত কংক্রিটের উপর আছড়ে পড়ল দেহটা।

নার্ভ দুর্বল, ভয়ে চিৎকার করে উঠল সোহানা। রানাও থমকে গেল, তবে সেটা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য। স্বভাবজাত রিফ্লেক্সের বশে নড়ে উঠল ও, পরমুহূর্তেই সোহানাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁপ দিল মেঝেতে। তখুনি পিছনে আবার গুলির শব্দ হলো, ওদের শরীর থেকে মাত্র এক হাত দূরে ধুলো ওড়াল ব্যর্থ বুলেট।

সোহানাকে নিয়ে ক্রল করে এগোতে শুরু করল রানা, কাভার পেতে হবে। তবে সেটা আদৌ সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অগ্নিদগ্ধ আস্তাবলের ভিতরে নিরেট আড়াল বলতে কিছুই অস্তিত্ব নেই।

আবার গুলি হলো, ওদের মাথার মাত্র দু'ফুট দূরে কংক্রিটে আঘাত করল বুলেট। রানা বুঝতে পারল, লুকাবার চেষ্টা করে

লাভ নেই, পাল্টা আঘাতই একমাত্র উপায়। হামাগুড়ি বন্ধ করে চিত হলো ও, কোমর থেকে শরীরের উর্ধ্বাংশ একটু উঁচু করল, অদৃশ্য আততায়ীর পজিশন বুঝতে চায়। কিন্তু যা দেখল, সেটা পাথরের মত স্থবির করে ফেলল ওকে।

পোড়া ফার্মহাউসটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কয়লা হয়ে যাওয়া তক্তা ঘষা খাচ্ছে, নড়ছে, সরে যাচ্ছে নিজ নিজ জায়গা থেকে। সরে যাচ্ছে ভস্মীভূত সমস্ত জঞ্জাল—ছাই, ধুলোবালি আর ময়লার আড়াল থেকে উদয় হচ্ছে একটার পর একটা মনুষ্য-আকৃতি। সবার পরনে অ্যাসল্ট গিয়ার, শরীর আর মুখ ঢাকা নিখুঁত ক্যামোফ্লাজে। হাতে ধরা অটোমেটিক ওয়েপনগুলো স্থির, নিষ্কম্প... বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওগুলোর মালিকেরা দক্ষ, পোড়-খাওয়া যোদ্ধা।

নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হলো রানার কাছে, এই পরাশক্তির সামনে সিগ-সাওয়ার হাতে মাত্র দুজন মানুষ কিছুই নয়। প্রবল ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যাবে ওদের ঠুনকো প্রতিরোধ। কয়েক সেকেন্ড পরে ঝড়-ই এল। হারিকেনের তীব্রতা নিয়ে রাশ রাশ বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল অ্যাসল্ট টিমের সৈনিকরা, সেগুলো ছুটে এল পোড়া আস্তাবলের মেঝেতে পড়ে থাকা অসহায় দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে।

এগারো

উপুড় হয়ে সোহানাকে জাপটে ধরল রানা, নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে ওকে রক্ষা করতে চাইছে। অটোমেটিক ওয়েপনের গর্জনে

কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরই ওরা বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করল, একটা বুলেটও গায়ে লাগছে না ওদের, সবগুলো কংক্রিটের মেঝেতে মাথা কুটে মরছে। একটাই কাজ হচ্ছে গুলিবর্ষণে—দুই বিসিআই এজেন্ট বাধ্য হচ্ছে মেঝেতে পিন-গাঁথা প্রজাপতির মত পড়ে থাকতে; নড়লেই খুন হয়ে যাবে।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে চলল এই তাণ্ডব, তারপর থেমে গেল। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র তিন মিনিট। মুহূর্মুহঃ নিনাদের পর আচমকা নেমে আসা নীরবতা যেন থামিয়ে দিয়েছে সময়কে। রানার কানে অবশ্য এখনও প্রতিধ্বনি করে চলেছে প্রবল গুলিবর্ষণের রেশ, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঝনঝনানি-টা কাটাবার চেষ্টা করল ও। ঘোর-টা কেটে যেতেই উঠে বসল, দেখাদেখি সোহানাও।

আস্তাবলের কাছাকাছি বেশ ক'জন সৈনিককে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা, হাতের অস্ত্র তাক করে রেখেছে দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে। এগোচ্ছে সতর্ক পদক্ষেপে। হাবভাবে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। নিখুঁত অ্যাসল্ট ট্যাকটিক্স ব্যবহার করছে এরা। একদল কাভারিং ফায়ার করে আটকে রেখেছিল টার্গেটকে, সেই ফাঁকে বাকিরা চলে এসেছে কাছাকাছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোকে দেখল রানা। ওদের ক্যামোফ্লাজ, গিয়ার—সবই উন্নত মানের, হাতের অস্ত্রগুলো এমপি-৫ সাবমেশিনগান। আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সবাই স্পেশাল-অপ্সের ট্রেনিং পাওয়া... এরাই সম্ভবত হামলা চালিয়েছিল সেফ-সাইটে।

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল সোহানা। শান্ত স্বরে রানা বলল, 'রিল্যাক্স। আমাদের খুন করতে চাইলে এতক্ষণে করে ফেলতে পারত।'।

ঠিক দশ গজ দূরে পৌঁছে থামল সৈনিকরা, ইশারায় হ্যাণ্ডস্

আপ হয়ে দাঁড়াতে বলল ওদেরকে। আদেশটা পালন করল রানা-সোহানা, আপাতত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পরমুহূর্তে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। চোখ ফেরাতেই উপত্যকার এক প্রান্তের গাছগাছালির আড়াল থেকে একটা গাড়িকে উদয় হতে দেখল, পিছনে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে ফার্মহাউসের দিকে। দূরত্ব একটু কমে আসতেই গাড়িটার মডেল চিনতে পারল রানা—ফোর-হুইল-ড্রাইভ এস.ইউ.ভি.—ফোর্ড এক্সপ্লোরার। মিলিটারি ভেহিকেল। সূর্যের কড়া আলোর কারণে উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে বসা মানুষদু'জনকেও দেখা গেল। চওড়া কাঁধঅলা এক ড্রাইভার, তার সঙ্গে রয়েছে বছর ত্রিশেকের এক যুবতী।

একেবারে আস্তাবলের সামনে এসে থামল গাড়িটা, দরজা খুলে মাটিতে পা রাখল যুবতী। এবার তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। মুখটা ডিম্বাকৃতি, চোয়াল সুগঠিত। চেহারা মন্দ নয়, সুন্দরী-ই বলা যেত, কিন্তু সমস্যা হলো নীল রঙের চোখদুটো। কোনও মেয়ের দৃষ্টি এমন মায়া-মমতাহীন হতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। মেয়েটি বেশ লম্বা, চামড়া রোদে-পোড়া, মুখে মেকআপ নেয়নি। অ্যাথলিটদের মত ছোট সোনালি চুল—ঝুঁটি বাঁধা সম্ভব নয় বলে পিছনদিকে আঁচড়ে রাখা হয়েছে। মোটা কার্পড়ের শার্ট, ম্যাচিং জ্যাকেট, খাকি প্যান্ট আর বুট পরে রয়েছে সে। পোশাক, সেই সঙ্গে চলন-বলনে সামরিক ছাপ স্পষ্ট।

মেয়েটির পিছু পিছু ড্রাইভারও নেমেছে গাড়ি থেকে। আকার-আয়তনে কুস্তিগীর বলা চলে তাকে। লোকটার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল যুবতী, 'সার্চ করো এদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল কুস্তিগীর, সশস্ত্র সৈনিকরা তাকে

কাভার দিচ্ছে। সময় নিয়ে রানা-সোহানার দেহতল্লাশি করল লোকটা, ইচ্ছে করেই শরীরের এখানে-ওখানে থাবা দিল, বিশেষ করে সোহানার গায়ে। বদমাশটার বিকৃত রুচি দেখে দাঁতে দাঁত পিষল রানা, যথাসময়ে উপযুক্ত শাস্তি দেবে ও শয়তানটাকে।

দুই বন্দির কাছ থেকে পিস্তলদুটো উদ্ধার করল কুস্তিগীর, নিজের ঢোলা প্যাণ্টের পকেটে রাখার আগে একটু পরখ করে দেখল। সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটল চোখে। ওস্তাদ লোক, সিগ-সাওয়ার দুটোর বিশেষত্ব ধরতে পেরেছে। বন্দিদের কাছ থেকে স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর সেলফোন নিয়ে নিল সে, রানার গোড়ালির উপরে বাঁধা এমারসন-নাইফটাও তার পকেটস্থ হলো একটু পর। সবশেষে দুই বিসিআই এজেন্টের কাছ থেকে ওয়ালেট আর গাড়ির চাবি নিল লোকটা, সেগুলো তুলে দিল নেত্রীর হাতে।

ওয়ালেট খুলে রানার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখল যুবতী, তারপর চোখ তুলে প্রশ্ন করল, ‘নাম কী তোমাদের?’

‘মাসুদ কায়সার,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা।

‘কেয়া কায়সার,’ পিছু পিছু যোগ করল সোহানা।

মৃদু হাসল যুবতী। বলল, ‘ভুয়া নাম, তাই না?’

‘কেন, ড্রাইভিং লাইসেন্সে কি অন্য কিছু লেখা আছে নাকি?’ হালকা সুরে বলল রানা।

‘তা নেই,’ বলল যুবতী। ‘নাম মিলেছে। আমি শিয়োর, খোঁজ নিতে গেলে পারফেক্ট একটা ব্যাকগ্রাউণ্ডও পাওয়া যাবে এই নামের দুজন মানুষের। না পাওয়া যাওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।’

‘তাই নাকি? কেন?’

‘কারণ মি. মাসুদ রানা এবং মিস সোহানা চৌধুরী নামসর্বস্ব পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না,’ মুখের হাসি বিস্তৃত হলো যুবতীর। ‘ইউ সি, আমরা খোঁজখবর নিয়েই মাঠে নামি।’

বিভ্রান্ত হবার অভিনয় করল রানা। ‘কীসের কথা বলছেন,

বুঝতে পারছি না...’

‘কাম অন, রানা! শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না। আমরা সব জানি। জানি কীভাবে নিউয়ার্ক থেকে ড. আন্দালিব সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে এনেছ, কীভাবে তাকে তোমার এজেন্সির সেফ-সাইটে নিয়ে গেছ...’

‘জাস্ট আ মিনিট,’ বাধা দিল রানা। ‘এই আন্দালিব সিদ্দিকী-টা আবার কে?’

মুখের হাসি নিভে গেল যুবতীর, চেহারা য় বিরক্তি ফুটল। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে রানার তলপেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল লোকটা।

চোখে আঁধার দেখল রানা, নিঃশ্বাস আটকে আসছে ব্যথার তীব্রতায়। একে কুস্তিগীর ভাবা ঠিক হয়নি, ব্যাটা আসলে একটা চ্যাম্পিয়ন বক্সার... মাইক টাইসন আর মোহাম্মদ আলী ক্যালিবারের! নিজের অজান্তেই কুঁজো হয়ে গেল ও, ভারসাম্য হারিয়ে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

‘শুধু ঘুসি দিয়ে মানুষ খুন করতে জানে অ্যান্ড্রি,’ সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল যুবতী। ‘তাই ভাল হয় যদি ওকে কোনও অজুহাত না দাও। লুকাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তা ছাড়া... লুকাবার কিছু নেই-ও। তোমরা ড. সিদ্দিকীর ল্যাব দেখতে এসেছ তো? কোনও অসুবিধে নেই, এসো... আমিই দেখাচ্ছি।’

প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিমোট বের করে বোতাম চাপল সে। সঙ্গে সঙ্গে মোটর চলার চাপা গুমগুম শব্দ শোনা গেল, দুটো হাইড্রলিক পোল ঠেলে ধরল মেঝের আলগা স্ল্যাবটাকে, ট্র্যাপডোরের মত খুলে গেল ওটা। উন্মুক্ত হয়ে গেল একটা সিঁড়ি, ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচের অন্ধকারের দিকে। ল্যাবের প্রবেশপথ।

ব্যথাটা সয়ে নিল রানা, উঠে দাঁড়াল। অভিনয়ের ইতি

ঘটিয়েছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, ‘হঠাৎ আমাদের খায়েশ মেটাতে উৎসাহী হলে কেন, জানতে পারি?’

‘মিটুক না তোমাদের কৌতূহল! তাতে যদি ভালয় ভালয় মুখটা খোলো... অ্যান্থনিকে আর খাটতে হয় না তা হলে।’

‘অশেষ দয়া তোমার! দয়াটা আগে দেখালে কী ক্ষতি হতো?’ ডেমিয়েনের লাশটা দেখাল ও। ‘বেচারাকে খুন করে ফেললে... দরকার ছিল কোনও?’

‘আগাছা,’ লাশটার দিকে হেলাফেলার দৃষ্টিতে তাকাল যুবতী। ‘বাঁচিয়ে রাখার কোনও কারণ দেখতে পাইনি।’

‘হুম, আমরা তা হলে ফলবতী বৃক্ষ?’

‘তার চেয়েও বেশি। তোমরা হচ্ছেো সোনার খনি।’ সিঁড়িটা দেখাল যুবতী। ‘এবার নামতে শুরু করো। নইলে অ্যান্থনি তোমাদেরকে ভিতরে ছুঁড়ে ফেলবে।’

‘তার কোনও প্রয়োজন নেই,’ রানা বলল। ‘ছোঁড়াছুঁড়ি একেবারেই পছন্দ করি না আমরা।’

সোহানাকে ইশারা করল ও। দুজনে উল্টো ঘুরে এগিয়ে গেল প্রবেশপথের দিকে, নামতে শুরু করল। অস্ত্র হাতে বাকিরা অনুসরণ করল ওদেরকে। সামনের একজন টর্চলাইট জেলে মাথার উপর দিয়ে আলো ফেলে রাখল।

‘এখানে অবশ্য তোমরা কিছুই পাবে না,’ বলল যুবতী, ৬-গর্ভে নামবার টানেলের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কণ্ঠ। ‘আমরা পুরো জায়গাটাই একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছি।’

একটু পরেই সমতল মেঝেতে নেমে এল গোটা দলটা। বাতাস গুমোট হয়ে আছে জায়গাটায়। সৈনিকদের সবাই যার যার ফ্যাশলাইট জ্বালল। রানা-সোহানার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা কংক্রিটের করিডোর, দু’পাশের দেয়ালে পর পর বেশ

কয়েকটা ওপেনিং দেখা যাচ্ছে। দরজা ছিল বোধহয়, খুলে ফেলা হয়েছে। যুবতীর কথায় সেটার প্রমাণ মিলল।

‘কম্পিউটার, সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, ফাইলপত্র... সব ধ্বংস করে ফেলেছি আমরা। সব ধরনের ফার্নিচার সরিয়ে ফেলেছি। হিটিং এবং এয়ার-কন্ডিশনিং সিস্টেম ডিজ-অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। সমস্ত লাইট-ফিটিংস্, বাথরুমের বেসিন-কমোড, মেঝের কার্পেট, ফলস্ সিলিং, দরজা-চৌকাঠ... এমনকী দেয়ালের প্যানেলিং পর্যন্ত খুলে ফেলা হয়েছে।’

আলো ফেলে ছাদটা দেখানো হলো দুই বন্দিকে। অযত্নে-অবহেলায় ছেঁড়া-খোঁড়া ইনসুলেটেড ওয়্যারার ঝুলছে ওখান থেকে। কণ্ঠে আত্মতুষ্টি ফুটিয়ে যুবতী বলল, ‘এরচেয়ে চমৎকার ক্লিনআপ আর কোথাও দেখতে পাবে না তোমরা। এ-জায়গা দেখে এখন আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কী করা হতো এখানে। রাইট?’

‘হুঁ,’ মুখ বাঁকিয়ে বলল রানা। ‘বুঝতে পারছি, ভুল পেশায় এসেছ তোমরা। ঝাড়ুদার, কিংবা মেথর হিসেবে কাজে নামলে অনেক উন্নতি করতে।’

গালে চড় মারার মত অপমান। সবকিছু ভুলে যুবতী চৈঁচিয়ে উঠল, ‘কী বললে?’

উল্টো ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা। শান্ত গলায় বলল, ‘বলছি যে, দুর্নিয়ার সেরা ঝাড়ুদার তোমরা। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এখানে এখনও কী করছ তোমরা? কী পাহারা দিচ্ছ? নিজেদের সেরা শিল্পকর্ম?’

আবারও চৈঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল যুবতী, কোনোমতে নিজেকে সামলাল। বুঝতে পারছে, অধীনস্থদের সামনে এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারানো ঠিক নয়। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে সে বলল, ‘আমরা এখানে কিছু পাহারা দিচ্ছিলাম না, গর্দভ! তোমাদের জন্য

থেকে করছিলাম!’

‘শুনে খুব খুশি হলাম, নিজেদেরকে ভিআইপি মনে হচ্ছে,’ রানা খেপিয়ে চলেছে প্রতিপক্ষকে।

‘ভিআইপি? ঠিক আছে, ভিআইপি-র খাতিরই করা হবে তোমাদের।’

‘খুব ভাল। তবে খাতির-যত্ন শুরু হবার আগে আমাদের আলাপ-পরিচয়টা ভালমত হয়ে যাওয়া উচিত নয়? তোমার নামটা কী?’

‘আমার নাম জেনে তোমার কাজ নেই।’

‘আছে, আছে,’ হাসল রানা। ‘নাম না জানলে পরে তোমাকে খাতির-যত্নের জন্যে পুরস্কার দেব কীভাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, নাম যদি না-ই বলো, তা হলে আমিই একটা দিয়ে দিই। ব্ল্যাক উইডো... পছন্দ হয়? বেশ মিলেছে কিন্তু! তুমি যেন ঠিক একটা বিষাক্ত মাকড়সা!’

জবাব দিল না যুবতী। কয়েক মুহূর্ত আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানার দিকে। হঠাৎই যেন সেই আগুনে পানি পড়ল। স্মিত হেসে সে বলল, ‘নাইস ট্রাই, রানা। আমাকে আগেই বলা হয়েছে, তুমি কথার মারপ্যাচে ওস্তাদ। আমাকে খেপিয়ে মুখ খোলাতে চাইছিলে, তাই না? ভালই দেখিয়েছ বটে, আমি কিছুটা হলেও ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিলাম।’

‘এর মানে কি আমি তোমাকে ব্ল্যাক উইডো বলে ডাকতে পারি?’ রানা আগের মতই মুখের হাসি ধরে রেখেছে।

‘আই ডোন্ট কেয়ার। যা খুশি বলো। সত্যি বলতে কী, আমি চাই তুমি... তোমরা দুজনেই কথা বলতে থাকো। প্রচুর কথা... ড. সিদ্ধিকীর সম্পর্কে।’

‘সবই বলব, মাই ডিয়ার ব্ল্যাক উইডো! কিন্তু আলাপ-সালাপ কি আর একতরফা হয়? তুমিও কিছু বলো! এই যেমন... আমরা

যে এখানে আসব, সেটা তোমরা কীভাবে জানলে...'

বজ্রারের দিকে তাকাল যুবতী। 'একে একটু সবক দেয়া দরকার, অ্যাছনি। বড্ড বেশি ফালতু কথা বলছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল বিশালদেহী লোকটা। আঘাতটা সামলাবার জন্য পেট শক্ত করে ফেলল রানা, তবে এবার তলপেটে নয়, থুতনিতে ঘুসি বসাল বজ্রার। আবছা আলোয় মুঠিটাকে ঠিকমত ছুটে আসতে দেখল না ও, ফলে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেল মাথাটা, মগজ বাড়ি খেল খুলির গায়ে, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও চিত হয়ে। কয়েক মুহূর্ত সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে রইল রানা, আচ্ছন্ন বোধ করছে। টের পেল, মুখের ভিতরটা ভরে গেছে রক্তে। লাল রঙের একদলা থুতু ফেলল ও, সোজা হয়ে বসে বলল, 'এসবের কোনও অর্থ হয় না। আমার সম্পর্কে যদি সব জেনে থাকো, তা হলে এটাও জানার কথা—টরচার করে আমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করা সম্ভব নয়।'

'ওই কথাটায় আমার বিশ্বাস নেই,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ব্ল্যাক উইডো। 'সবারই একটা ব্রেকিং পয়েন্ট থাকে।' সোহানার দিকে ঘুরে গেল তার দৃষ্টি। 'ফাইলে পড়েছি, তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল। চোখের সামনে মিস সোহানার উপর অত্যাচার চালালে সেটা সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'যা খুশি করতে দাও ওকে, রানা,' বলল সোহানা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। সয়ে নেব। কিন্তু তুমি ওকে কিছু বোলো না।'

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। 'দারুণ ভাষণ! তবে রানা এতে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'সোহানাকে এসবের বাইরে রাখো,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ও কিছু জানে না, শুধু আমাকে সাহায্য করতে এসেছে।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল যুবতী। 'কিন্তু তুমি মুখ না খুললে আমি নিরুপায়। যেভাবে হোক, সিদ্ধিকীকে খুঁজে বের করতে হবে

আমাকে । সেজন্যে যে-কোনও পদক্ষেপ নেব আমি ।’

‘খামোকা আমাকে শত্রু ভাবছ,’ রানা বলল । ‘আমিও সিদ্ধিকীকে খুঁজে বের করতে চাই । ওর সঙ্গে আমারও বোঝাপড়া বাকি আছে ।’

‘ওকে যেভাবে উদ্ধার করে এনেছিলে, তাতে তো দুজনের গলায় গলায় ভাব থাকার কথা,’ বলল ব্ল্যাক উইডো । ‘হঠাৎ বোঝাপড়ার প্রশ্ন আসছে কেন?’

‘আমার সঙ্গে বেঙ্গমানী করেছে ও—আমার বন্ধুদের খুন করেছে, আমাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে!’ কথাটা আংশিক সত্য । রফিক আর শাহরিয়ার মারা গেছে এই যুবতীর দলের অ্যাম্বল্ট টিমের রকেটে । সিদ্ধিকীর উপর ওর যত না ক্রোধ, তার চেয়ে এদের উপরও কোনও অংশে কম নয় । কিন্তু সেটা এখনি বুঝতে দেয়া চলে না । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে এই ব্ল্যাক উইডোকে বোঝাতে হবে, রানা আসলে ওদেরই পক্ষে । সেটা প্রমাণের জন্য জোর গলায় বলল, ‘আমি প্রতিশোধ নিতে চাই!’

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরাও কিছুটা আন্দাজ করেছি... ক্যাটসকিল মাউন্টেন রেঞ্জের ওই বাস্কারে ওর লাশ খুঁজে না পেয়ে,’ বলল ব্ল্যাক উইডো, নিজের অজান্তেই রানার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে শুরু করেছে । ‘আগুনে পোড়া দুটো লাশ পেয়েছি আমরা—একটা ছুরি-বেঁধা, অন্যটা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় । কাজটা সিদ্ধিকী ছাড়া আর কারও হতে পারে না । তাই ধারণা করছি, ওখানকার লোকজনকে খুন করে পালিয়ে গেছে সে । তোমার লাশও ছিল না ওখানে, তাই চোখ রাখছিলাম তোমার বন্ধুবান্ধবের উপর । এজেন্ট এরিক স্টার্ন যে সিদ্ধিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে, সেটা দেখে বুঝলাম—ওর সাহায্য নিচ্ছ তুমি । ওর সঙ্গে বাতচিত করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই কয়েকজন লোক কিডন্যাপ করে বসল ওকে । ইচ্ছে করেই নাক গলাইনি ওর ভিতরে, যাতে

বন্ধুকে উদ্ধার করতে তুমি গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসো।
কিডন্যাপারদেরকে এখানে ফাঁদ পাতে দেখলাম আমরা, তাই
নিজেরাও ওঁৎ পেতে বসে ছিলাম তোমার আসার অপেক্ষায়।
প্ল্যানটা মন্দ হয়নি, কী বলো? ঠিকই ধরা দিয়েছ তুমি।’

‘তোমাদেরকে দেখতে পায়নি ওরা?’

‘উঁহু,’ হাসল ব্ল্যাক উইডো। ‘লিডারটা এক সঙ্গীকে নিয়ে
আজ সকালে চলে যেতেই বাকি দুটোকে অ্যারেস্ট করেছি
আমরা। তারপর ক্যামোফ্লাজ নিয়ে অ্যাসল্ট টিমকে লুকিয়েছি
ফার্মহাউসের ধ্বংসস্থপে।’

‘হুম, ভালই কাজ দেখিয়েছ,’ প্রশংসার সুরে বলল রানা।
‘তবে ওটা পণ্ড্রম হয়েছে। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমারও
উদ্দেশ্য ওই একই—ড. সিদ্ধিকীকে শায়েস্তা করা!’

কথাটায় খুব একটা বিভ্রান্ত হলো না ব্ল্যাক উইডো। গম্ভীর
গলায় বলল, ‘ছেলে-ভুলানো কথা বলে লাভ নেই, রানা।
তোমাকে আরও ঝেড়ে কাশতে হবে। ওই বাস্কারে সিদ্ধিকীকে
নিয়ে কী করছিলে তোমরা?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘ওটা আমাদের সেফ-সাইট। সিদ্ধিকী
উধাও হয়ে যেতে চেয়েছিল। ওখানে ওর আত্মগোপনের প্রস্তুতি
নেয়া হচ্ছিল... সেইসঙ্গে ট্রেইনিং চলছিল ওর।’

‘উধাও!’ ভুরু কোঁচকাল ব্ল্যাক উইডো। ‘কোথায় উধাও
হয়েছে ও?’

‘জানি না,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘কাজটা শেষ করতে পারিনি
আমরা। ট্রেইনিং শেষ হতেই বদমাশটা বেঈমানী করেছে।
তোমাদেরকে ডেকে এনে সেফ-সাইটে হামলা করিয়েছে... আমার
সঙ্গীদের খুন করেছে... তারপর গোলমালের ভিতর পালিয়ে
গেছে।’

‘মেসেজটা সিদ্ধিকীই দিয়েছিল?’ ব্ল্যাক উইডো একটু অবাক

হলো। ‘আমি তো শুনেছি অজ্ঞাতপরিচয় এক ইনফরমার সিদ্ধিকীর খবর জানিয়েছিল...’

‘ও-ই,’ বলল রানা। ‘লোকটা অত্যন্ত ধুরন্ধর। নিখুঁত ছক কেটে পুরো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে।’

‘সে যা-ই হোক,’ কাঁধ ঝাঁকাল যুবতী, ‘নিজ থেকে তো আর গায়েব হওয়া সম্ভব নয় লোকটার পক্ষে। নানা রকম কাগজপত্র প্রয়োজন হয়েছে ওর। সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা সাপ্লাই দিয়েছ?’

‘ব্যাপারটা একটু জটিল,’ বলল রানা। ‘ক্লায়েন্টকে আমরা জোর করে কোনও পরিচয় গছিয়ে দিই না, ওটা সে তার নিজের পছন্দ অনুসারে বেছে নেয়। সেই মোতাবেক আমাদের ফর্জারি এক্সপার্ট কাগজপত্র তৈরি করে। সিদ্ধিকী আগে থেকে পছন্দ-অপছন্দের কথা কিছুই বলেনি আমাদের। ট্রেইনিং শেষ হতেই সবাইকে মেরে সেফ-সাইট থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর গিয়েছিল আমাদের এক্সপার্টের কাছে। ওর কাছ থেকে জোর করে কাগজপত্র নিয়েছে শয়তানটা, তারপর খুন করেছে। আমি কিছু করতে পারিনি। সমস্যাটা বুঝতে পারছ? আমাদের এক্সপার্ট ওকে কী ধরনের ডকুমেন্ট আর ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করে দিয়েছে, সেটা জানবার কোনও উপায় নেই।’

‘তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না,’ থমথমে গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘নিউয়ার্ক থেকে উদ্ধারের পর চারদিন ওই সেফ-সাইটে ছিল সিদ্ধিকী। তুমি বলতে চাইছ, এর মধ্যে একবারও তোমরা আলোচনা করেনি নতুন পরিচয়ের ব্যাপারে? একবারও জানতে চাওনি, লোকটা কোথায় যেতে চায়?’

‘চেয়েছি, কিন্তু কিছুই বলেনি সে।’

‘তুমি মিথ্যে বলছ!’ খঁকিয়ে উঠল যুবতী।

রানা শান্ত রয়েছে। বলল, ‘ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো—সিদ্ধিকী কোথায় গেছে, সেটা যদি জানাই থাকে, তা হলে

আমরা খামোকা বেইলি'জ রিজে আসব কী করতে? হাওয়া খেতে?’

‘সেটা আমারও প্রশ্ন। কী আছে এখানে?’

‘তিলকে তাল ভাবছ তুমি,’ বিরক্ত গলায় বলল রানা। ‘আমরা কিছুই জানি না।’

চেহারায়ে হিংস্রতা ফুটল ব্ল্যাক উইডোর। বলল, ‘সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনও প্রয়োজন নেই আমার কাছে। অ্যাঙ্কনি, মেয়েটাকে গুলি করো।’

বক্সারের চেহারায়ে ভয়ঙ্কর হাসি ফুটল। উরুতে বাঁধা হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, কক করে তাক করল সোহানার দিকে। কপালে ঘাম দেখা দিল রানার—মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না ব্ল্যাক উইডো, সত্যিই গুলি করতে যাচ্ছে সোহানাকে। সোহানা অবশ্য নিষ্কম্প, ভীতিবোধটা উধাও হয়ে গেছে, নাকি চরম সীমায় পৌঁছে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—তা বোঝা যাচ্ছে না। মূর্তি হয়ে আছে ও, যেন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অসহায় বোধ করল রানা, আবছা আলোয় ট্রিগারের উপর চেপে বসা অ্যাঙ্কনির আঙুল সাদা হতে দেখল—এখুনি ফায়ার করবে লোকটা।

‘খামো!’ চোঁচিয়ে উঠল ও।

একটু থমকাল অ্যাঙ্কনি চিৎকারটা কানে যেতে, ঘাড় ফিরিয়ে নেত্রীর দিকে তাকাল নির্দেশনার আশায়।

‘আমি এখনও সিদ্ধান্ত পাল্টাইনি, রানা,’ বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘কিছু বলতে চাইলে তাড়াতাড়ি বলো।’

‘আমাদেরকে খুন করলে মস্ত ভুল করবে তুমি,’ যতটা পারে শান্ত থেকে বলল রানা। ‘কারণ একমাত্র আমরাই তোমাকে সিদ্ধিকীর খোঁজ বের করতে সাহায্য করতে পারি।’

‘কিন্তু তুমি তো বলছ, কিছুই জানো না ওর ব্যাপারে।’

‘তা ঠিক, কিন্তু লোকটার চরিত্র বুঝতে পেরেছি আমি। ওটা বিশ্লেষণ করেই বোঝা সম্ভব, কোথায় লুকিয়েছে ও।’

‘হেঁয়ালি কোরো না। পরিষ্কার করে বলো, কী বলতে চাও।’

রানা ব্যাখ্যা করল, ‘চারদিন ছিল সিদ্ধিকী আমাদের সঙ্গে। তখন ট্রেইনিঙের পাশাপাশি তার সাইকো-অ্যানালাইসিস করেছি আমরা। লোকটা অ্যারোগ্যান্ট... উদ্ধত। নিজেকে সবার চেয়ে চালাক মনে করে। ওর ধারণা, আমরা যেভাবে শিখিয়েছি, তার চেয়েও ভালভাবে উধাও হতে পারবে সে। ইচ্ছেমত নিয়ম ভাঙতে পারবে, এবং সবাইকে তারপরও নিজের মত করে ধোঁকা দিতে পারবে...’

‘কাম টু দ্য পয়েন্ট, রানা!’ ধমক দিল ব্ল্যাক উইডো। ‘তুমি সময় নষ্ট করছ।’

‘আমি বলতে চাইছি, সিদ্ধিকী উধাও হবার সমস্ত নিয়ম মানবে না। লোকটার মধ্যে কিছুটা একগুঁয়ে স্বভাব আছে... ট্রেইনিঙের সময় আমরা লক্ষ করেছি, কিছু কিছু জিনিস সে একেবারেই ছাড়তে রাজি নয়, রাজি নয় কিছু কিছু শখ আর স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে। আমি নিশ্চিত, নতুন পরিচয় নিয়েও ওগুলো বজায় রাখবে সে। কারণ তার ধারণা, এর পরও ওর নাগাল পাবে না কেউ... নিজেকে অত্যন্ত চালাক ভাবছে সে, পিছনের সমস্ত ট্রেইল মুছে দিয়ে যাচ্ছে।’

‘তোমাকে আরও স্পেসিফিক তথ্য দিতে হবে, রানা। কী ধরনের শখের কথা বলছ তুমি?’

‘আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে...’

‘ত্রিশ সেকেন্ড দেয়া হলো,’ রুক্ষ গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো।

‘এরপর প্রথম গুলিটা চালাবে অ্যান্ড্রি।’

‘দাঁড়াও...’ একটু ভাবল রানা। ‘সিদ্ধিকী মদ পছন্দ করে।’

‘অনেকেই করে। ওটা কোনও তথ্য হলো না।’

‘রান্না-বান্নার ভক্ত সে, উঁচু মানের শেফের মত রেসিপি বিশ্লেষণ করতে পারে।’ শাহরিয়ারের রান্না নিয়ে সিদ্দিকীর করা মন্তব্যগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে রান্নার।

‘আমরা সবাই খুব ভাল করে জানি, সিদ্দিকী একজন ভোজনরসিক,’ বিরক্ত গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘নতুন কিছু জানলে বলো। তোমার সময় কিন্তু ফুরিয়ে আসছে।’

আরেকটু ভাবল রানা। তারপর বলল, ‘গলফ খেলতে ভালবাসে সিদ্দিকী। আমাদেরকে বলেছে, শারীরিক পরিশ্রম বলতে ওই একটা জিনিস-ই করে ও। গলফের পাগল।’

‘তারমানে সিদ্দিকী নাপা ভ্যালিতে গেছে, কিংবা গেছে নিউ ইয়র্কের ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্টে... অথবা ফ্রান্সের বোর্দো-তে; ওখানে বসে সে ভূরিভোজন করছে, আর বাকি সময় গলফ খেলে বেড়াচ্ছে! এটাই বলতে চাইছ তুমি?’ তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পেল ব্ল্যাক উইডোর গলায়। খেপে গেল পরমুহূর্তে। ‘যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি, রানা! এক্ষুনি যদি তুমি কাজে লাগার মত তথ্য দিতে শুরু না করো, তা হলে সোহানার আশা ছেড়ে দিতে হবে।’

‘আমাকে শেষ করতে দাও,’ বলল রানা। ‘আগেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলো না। এমনিতে গুরুত্বহীন মনে হলেও, এসব ছোট ছোট তথ্য জোড়া দিয়েই বিরাট একটা তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।’

‘লেকচার দিতে হবে না,’ বিরক্ত গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘যা বলার জলদি বলো। এবার কী শোনাবে—সিদ্দিকীর নখ কাটার স্টাইল?’

খোঁচাটা গায়ে মাখল না রানা। বলল, ‘নিউয়র্কের ওয়্যারহাউসে আমি যখন ওকে উদ্ধার করতে যাই, তখন ওখানকার শেলফে কয়েকটা বই আর ভিডিওটেপ দেখেছি আমি। সংখ্যায় বেশি নয়, তবে ওখানে যদি ওই ক’টা জিনিস নিয়ে সে

তিন সপ্তাহ কাটিয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে—জিনিসগুলো তার জন্য অমূল্য সম্পদ। ওগুলোই তাকে অতটা সময় আনন্দ জুগিয়েছে... কিংবা তার ফ্যান্টাসি পূরণ করেছে।’

‘ফ্যান্টাসি!’ ব্ল্যাক উইডো ভুরু কঁচকাল।

‘ওর নতুন জীবনের কথা বলছি। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে লোকে দীর্ঘদিনের লালিত কোনও স্বপ্নপূরণ করতে চায়। কী পরিচয় নেবে, কোথায় আবাস গড়বে—দুটো ক্ষেত্রেই।’

‘বই আর ভিডিওগুলোর নাম বলো।’

কাঁধ বাঁকাল রানা। ‘সমস্যা ওখানেই—আমি মনে করতে পারছি না।’ এবারও আংশিক সত্য বলছে ও। কবি রবিনসন জেফারসের প্রতি সিদ্ধিকীর অনুরাগের কথা ফাঁস করছে না। তথ্য দিচ্ছে বাছাই করে, যাতে প্রতিপক্ষ আগ্রহী হয়ে ওঠে... আবার পুরোপুরি কাজেও লাগাতে না পারে। সবকিছু জানার জন্য ওকে আর সোহানাকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে ব্ল্যাক উইডো; আর বেঁচে থাকলে এদের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ ঠিকই পাওয়া যাবে। ‘পার্নোগ্রাফির একটা বই দেখেছি আমি, ভূ-তত্ত্বেরও একটা বই ছিল। ভিডিও কালেকশনটা অবশ্য আরও অদ্ভুত। ক্লিণ্ট ইন্সটউডের একটা থ্রিলার ছিল, সঙ্গে ট্রয় ডোনাহিউ অভিনীত একটা টিনেজ রোমান্স...’

‘ছবির নাম বলতে হবে তোমাকে।’

‘বলেছি তো, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।’

‘ম্যাডাম, ব্যাটাকে একটা ধোলাই দেব নাকি?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাভুনি। ‘তাতে মগজটা খোলাসা হয়ে যেতে পারে।’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল ব্ল্যাক উইডো। ‘ঘাঘু লোক, মারধর করে কিছুই বের করতে পারবে না।’

সোহানার দিকে অ্যাভুনির দৃষ্টি ঘুরে যাচ্ছে দেখে রানা বলল, ‘মিছেমিছি জোর-জবরদস্তি করছ তোমরা। সত্যিই আমার মনে

নেই, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। একটু সময় লাগবে।
খামোকা টরচার করলে হিতে-বিপরীত হতে পারে।’

‘ভেবো না,’ বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘তোমার স্মৃতিশক্তি চাক্ষা
করবার তরিকা জানা আছে আমাদের।’ তুড়ি বাজাল সে, সঙ্গে
সঙ্গে পিছিয়ে গেল গোটা অ্যাসল্ট টিম। রানা-সোহানাকে ফেলে
রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

যাবার পথে ব্ল্যাক উইডোকে সেলফোনে কথা বলতে শুনল
ওরা। কাকে যেন বলছে, ‘ড. হামফ্রে-কে খবর দাও... গোল্লায়
যাক ব্যস্ততা! এখুনি ওকে এখানে চাই আমি!’

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দলটার পদশব্দ। এরপর শোনা গেল
মোটরের আওয়াজ—হাইড্রলিক পোলদুটো নীচে নেমে আসছে,
নামিয়ে আনছে কংক্রিটের স্ল্যাবটাকে। তিন ফুট... দু’ফুট... এক
ফুট... করে নেমে এল ওটা। কয়েক সেকেন্ড পরই মৃদু একটা ধুপ্
শব্দ করে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল প্রবেশপথ। ভূগর্ভের ল্যাবটার
নিকষ আঁধার ছেয়ে ফেলল রানা-সোহানাকে।

বারো

পরিবেশ পাণ্টে গেছে ল্যাবের ভিতরে। বাতাসটা আরও গুমোট
মনে হলো রানার কাছে। আসলে আগের মতই রয়েছে, কিন্তু
আচমকা নেমে আসা আঁধার আর নির্জনতা চাপ ফেলছে স্নায়ুর
উপর। কানের কাছে সোহানার নিঃশ্বাসের শব্দ পেল রানা। স্বস্তির
সঙ্গে লক্ষ করল, মোটামুটি স্বাভাবিক তালেই দম ফেলছে ও।

তারমানে এখনও ভয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

‘ড. হামফ্রে-টা কে?’ কাঁপা গলায় জানতে চাইল সোহানা।

‘ঠিক জানি না,’ রানা বলল। ‘তবে আমার মন বলছে, ব্যাগভর্তি সিরিঞ্জ আর কেমিক্যাল নিয়ে হাজির হবে সে। আমাদের মুখ খোলাবে ওষুধের সাহায্যে।’

হাতড়ে হাতড়ে রানাকে ধরল সোহানা, হাঁটু গেড়ে বসল। ‘কতটা জোরে মেরেছে অ্যাঙ্কনি?’

‘আগামী ক’সপ্তাহ ভুবন-ভোলানো হাসি দিতে পারব না,’ হালকা রসিকতা করল রানা। ‘পরিবেশটায় প্রাণের ছোঁয়া দিতে চাইছে। ‘তবে দাঁত ভেঙে ফোকলা বুড়ো হইনি, এই-ই যা সান্ত্বনা।’

একটু হাসল সোহানা। ‘তুমি কথা জানো বটে!’

‘তোমার কী অবস্থা? ভয় করছে?’

‘ওটা তো সারাক্ষণই করছে, রানা। তবে একটা টেকনিক খাটাচ্ছি—হিপনোসিসের মাধ্যমে মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখছি, যাতে বিপদের চিন্তা মাথায় চেপে বসে না থাকে। অনেকটাই কাজ হয়েছে এতে।’

‘দ্যাটস্ নাইস। এবার তা হলে বেরুবার একটা ব্যবস্থা করতে হয়, কী বলো?’

‘ক্... কীভাবে?’ সোহানা অবাক।

‘সেটাই তো বের করতে হবে। দাঁড়াও, আগে আলো জ্বালি।’

ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল রানার হাতে। জ্বলন্ত কাঠিটা চারদিকে ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখল ও।

‘দেশলাই পেলে কোথায়?’ প্রশ্ন করল সোহানা।

‘পকেটেই ছিল, অ্যাঙ্কনি নেয়নি। ব্যাটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। ভেবেছে সামান্য ক’টা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কিছুই করতে পারব না আমরা।’

‘হুম, ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। আমাদের বেল্টগুলোও তো গেল নেয়নি। বেল্টের বাকল আর স্পাইক যে অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা যায়, সেটা বোধহয় ভাবেইনি।’

আঙুলে আগুনের ছঁাকা খেতেই কাঠিটা ফেলে দিল রানা। এগল, ‘মশাল দরকার আমাদের। শার্টের হাতা ছিঁড়ে নিচ্ছি, তোমারগুলো দিতে পারবে?’

‘নিশ্চয়ই।’

কাপড় ছেঁড়ার ফড় ফড় শব্দ হলো। একটু পরেই ব্লাউজের দুটো হাতা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোহানা। রানাকে অবশ্য একটু বেগ পেতে হলো—ওর শার্ট মোটা কাপড়ে তৈরি, শক্ত সেলাই সহজে হার মানতে চাইল না। রীতিমত টানাহেঁচড়া করে গুলতে হলো দুই হাতা।

একটু পরে সফল হলো ও। একটা হাতা রেখে বাকিগুলো চালান করল পকেটে। তারপর বেল্ট খুলে বাকলের সঙ্গে পেঁচিয়ে ঝাঙল হাতাটা। জিনিসটা মেঝেতে রেখে দেশলাইয়ের সাহায্যে আগুন জ্বালল। ছোট্ট একটা স্তূপের মত জ্বলে উঠল ওটা, মোটা কাপড় বলে বেশি দ্রুত পুড়ছে না, আশা করা যায়—বেশ কয়েক মিনিট টিকবে।

‘চমৎকার!’ মন্তব্য করল সোহানা। ‘আলোর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু এখান থেকে বেরুবে কীভাবে? যাবার রাস্তাটা তো ওরা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।’

‘রাস্তা ওই একটাই আছে, তা বিশ্বাস হয় না আমার,’ বলল রানা। ‘এ-ধরনের আগরগ্ৰাউণ্ড ইন্সটলেশনে বিকল্প রুট রাখতে হয়। নইলে মেইন ডোরের মোটর যদি কোনও কারণে বিকল হয়ে পড়ে, ভিতরের সবাই চিরতরে আটকা পড়বে না?’

‘তা অবশ্য ঠিক বলেছ,’ স্বীকার করল সোহানা। ‘কিন্তু বিকল্প একজিট কোন্‌দিকে হতে পারে?’

‘খোলা জায়গায় হবে না, আশপাশের লোকজন দেখে ফেলবে তা হলে।’ লজিক্যালি চিন্তা করলে ওটা ফার্মহাউসের ভিতরে হবার কথা।’

স্বল্প আলোয় চারপাশে তাকাল সোহানা। মনে মনে হিসেব করল, ফার্মহাউসটা কোন্‌দিকে হতে পারে। ওদিকে তাকাতেই একটা করিডোর চোখে পড়ল। আঙুল তুলে বলল, ‘এটা।’

রানাও একমত। ‘চলো।’

বেন্টের অপর দিকটা হাতে তুলে নিল ও, মেক-শিফট মশালটা টেনে নিয়ে চলল করিডোর ধরে। বেশ কিছুদূর যেতেই একটা দরজা চোখে পড়ল; পুরো ল্যাবের এই একটা দরজাই শুধু খুলে নেয়া হয়নি। কাছে গিয়ে হাতল ঘোরাল সোহানা, ওটা তালা দেয়া।

‘ইন্টারেস্টিং!’ বলে উঠল ও।

‘কী ব্যাপার?’ পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘রুটটা সম্ভবত খুঁজে পেয়েছি আমরা। দরজাটায় তালা দেয়া।’

‘ইস্‌স... যন্ত্রপাতি থাকলে খুলে ফেলা যেত!’ আফসোস করল রানা।

‘এখুনি হতাশ হচ্ছ কেন?’ হাসল সোহানা। ‘ওভার-কনফিডেন্ট অ্যাঙ্কনির কথা ভুলে গেছ?’ চুলের ভিতর হাত দিয়ে দুটো হেয়ার-পিন বের করে আনল ও।

রানাও হেসে ফেলল। ‘লোকটার আসলে আমাদের দলে থাকা উচিত ছিল।’

হাঁটু গেড়ে হাতলের সামনে বসে পড়ল সোহানা, হেয়ার-পিন দুটো ঢুকিয়ে দিল কী-হোলে। একটু চেষ্টাতেই খুট করে শব্দ হলো। নবে মোচড় দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল ও।

পরমুহূর্তেই দুই বিসিআই এজেন্টের মুখ কালো হয়ে গেল।

ফার্মহাউসের ঠিক তলা ওপাশটা, তবে ওখান দিয়ে বেরবার কোনও কায়দা নেই। অগ্নিকাণ্ডে বাড়িটার নীচতলার মেঝে... মানে রুটটার ছাদ ধসে পড়েছে। দরজার ওপাশটা কাঠ-কয়লা আর মাটি-পাথরে এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে যে, ওগুলো ঠেলে এগোবার উপায় নেই।

‘ধ্যান্তেরি!’ সঙ্গেদে বলল সোহানা। ‘এই জঙ্ঘাল সাফ করতে তো বুলডোজার লাগবে!’

‘হুঁ,’ বলল রানা। ‘আমাদেরকে তালমতই আটকেছে ওরা। সেজন্যেই বেল্ট, হেয়ার-পিন আর দেশলাই নিয়ে মাঝা ঘামায়নি।’

মিটমিট করে নিভে গেল আগুনটা, তাড়াতাড়ি আরেকটা হাতা বের করে বাকলে জড়াল রানা, নতুন করে মশাল জ্বালল। আলোটা নিয়ে আবার প্রবেশপথের সামনের জায়গাটার ফিরে এল ওরা।

রানা বলল, ‘এত সহজে হাল ছাড়ছি না। একটা বন্ধ তো কী হয়েছে, অন্য আরেকটা খুঁজে বের করব।’

চিন্তায় ডুবে গেল দুই বিসিআই এজেন্ট। কয়েক মুহূর্ত পরেই সোহানার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘এয়ার-ভেন্টিলেশন, রানা! বাতাস চলাচলের জন্য ডাঙ্ক সিস্টেম আছে এখানে... একটা প্রান্ত সারফেসের কোথাও উঠেছে নিশ্চয়ই! ওটা ধরে বেরনো যাবে!’

ছাতের দিকে চোখ ফেরাল রানা। ছোট্ট একটা ফোকর দেখা যাচ্ছে, ছাকনি নেই। ওটাই এয়ার-ভেন্টিলেশনের ডাঙ্ক, ওপাশে শাফট রয়েছে; ছাতের সমান্তরালে চলে গেছে ল্যাবের ভিতরদিকে, অন্ধকারে... কোথায় গিয়ে উঠেছে, কে জানে।

দু’হাতের আঙুল ঝাঁজে ঝাঁজে আটকে ঘোড়ার রেকাবের মত করে ধরল ও। সোহানাকে ইশারা করল উপরে উঠতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল সোহানা, রানার পাতা হাতে পা রেখে এক ঝটকায় উঠে গেল ডাক্টের মুখ বরাবর, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল কিনারা ।

‘কিছু দেখতে পাচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করল রানা ।

‘হ্যাঁ, কিন্তু জবাবটা শুনে খুশি হবে না,’ সোহানা বলল । ‘শাফটটা একেবারে সরা । তুমি তো দূরের কথা, এমনকী আমিও হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারব না । আটকে যাব ।’

ওকে নামিয়ে আনল রানা । বিরক্ত সুরে বলল, ‘আমেরিকান মুক্তি-মেকারদের ধরে চাবকানো দরকার । সিনেমার ডাক্তারগুলো এত বড় দেখায় কেন? খামোকা মানুষকে ভুল ধারণা দেয়!’

‘ওদের গালাগাল দিলে আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না,’ তিস্ত কণ্ঠে বলল সোহানা । ‘তোমার উর্বর মস্তিষ্কে অন্য কোনও আইডিয়া থাকলে শোনাও ।’

‘আইডিয়া নেই, তবে এটুকু বুঝতে পারছি—বেরুতে চাইলে সামনের দরজাটাই ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে,’ বলল রানা ।

‘ওটা খুলছ কী করে?’ জানতে চাইল সোহানা । ‘বাইরে সেগ্টি থাকবে, তাদেরকেই বা খালিহাতে সামলাবে কীভাবে?’

‘একটা একটা করে সমাধান করি, কেমন? আগে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করি, তারপর নাহয় বাইরের ওদের নিয়ে ভাবব ।’

‘দরজা খুলতে হলে ওই ডাইনিটার রিমোট-টা দরকার হবে তোমার ।’

‘উঁহু,’ রানা মাথা নাড়ল । ‘আসল দরকার হলো ইলেকট্রিসিটি, সেটা এখানে আছে । রিমোট জিনিসটা মেইন কন্ট্রোল হতে পারে না । ল্যাবের ভিতর-বাহির... দু’জায়গাতেই সুইচবোর্ড থাকবার কথা ।’

‘তুমি কি ভাবছ, সেটা আমাদের জন্য আস্ত রেখেছে ওরা?’

‘দেখিই না, এসো।’

আলোটা টেনে নিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি গেল ওরা, ওখানে দেয়ালের গায়ে একটা খোলা কনসোল দেখা গেল। সুইচবোর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে ভিতরে প্লাস্টিকের ক্যাপ লাগানো নানা রকম ওয়ায়্যারের সংযোগ রয়েছে।

শিস দিয়ে উঠল রানা। ‘নাইস!’ বুঝতে পারছে, সুইচবোর্ড না থাকলেও তারগুলোর সংযোগ এদিক-ওদিক করে খোলা যাবে দরজাটা।

সোহানাও বুঝেছে, কিন্তু খুশি হতে পারছে না। ‘কিন্তু টেস্ট করতে গেলেই বাইরে দাঁড়ানো সেক্সিরা স্ল্যাবের নড়াচড়া দেখতে পাবে।’

‘পাবে না,’ বলল রানা। ‘আপাতত শুধু খোলার কায়দাটা বের করব। মোটরটা শব্দ করলেই সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন কেটে দেব।’

‘তাতে লাভ কী হবে? আমরা তো এখানেই থেকে যাচ্ছি।’

‘পদ্ধতিটা সুযোগ বুঝে কাজে লাগাব আমরা... যখন সবকিছু অনুকূলে থাকবে।’

‘তার আগেই কেমিক্যাল পুশ করে আমাদেরকে ভোঁতা করে ফেলবে ওরা।’

‘সাহস রাখো, অমন কিছু ঘটবে না। আমি কথা দিচ্ছি!’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল সোহানা। কনসোলের সামনে গিয়ে ওয়ায়্যারে হাত দিতে যাবে রানা, এমন সময় হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল মোটরে। প্রবেশপথের কংক্রিট স্ল্যাবটা সরে যেতে থাকল, ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যালোকের পটভূমিতে কয়েকটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল—ব্ল্যাক উইডো, অ্যান্ড্রুনি আর হ’জন সৈনিক। নীচে নামতে যাচ্ছে ওরা।

তাড়াতাড়ি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল রানা, বেস্টটা তুলে নিয়ে সোহানা-সহ পিছিয়ে গেল ছায়ায়, যাতে

ভিতরে ঢুকলেই ওদের দেখতে না পায় প্রতিপক্ষ। দ্রুত কিছু তাকল ও, তারপর দেশলাইয়ের বাস্ফটী বের করে কয়েকটা কাঠি সরাল, বাস্কের কিনার থেকে বারুদ মাখা কাগজও একটু ছিঁড়ে রাখল। সবশেষে বাস্ফটী হাতের ভিতর দলামোচড়া করে ফেলল ও।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পায়ে শব্দ শোনা গেল। একে একে লোকগুলো নেমে এল ল্যাবে। উঁচু গলায় ব্ল্যাক উইডো বলল, ‘কোথায় তোমরা? বেরিয়ে এসো। নইলে কিন্তু ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করব!’

হুমকিটা অগ্রাহ্য করল না ওরা। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলো প্রতিপক্ষের।

‘খোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি কেন?’ নাক কোঁচকাল ব্ল্যাক উইডো, পরমুহূর্তে মেঝেতে পড়ে থাকা ছাইয়ের উপর দৃষ্টি গেল তার।

‘অন্ধকার ভাল লাগে না,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘তাই আলোর ব্যবস্থা করেছিলাম।’

‘আগুন ধরিয়েছ কীভাবে?’

‘দেশলাই।’

বিরক্ত চোখে অ্যান্ড্রিনির দিকে তাকাল ব্ল্যাক উইডো, দৃষ্টিতে ভরসনা। একটু যেন কুঁকড়ে গেল বস্ত্রার।

খোলা প্রবেশদ্বার দিয়ে আসা সূর্যের আভাষ মোটামুটি ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে দলটাকে। তীক্ষ্ণ চোখে ওদের লক্ষ করল রানা। সৈনিকদের শরীরের আকার হঠাৎ করেই যেন কমে গেছে অনেকটা—ভিতরে পরা কেভলার ভেস্ট খুলে রেখে এসেছে তারা। কিছুটা গা-ছাড়া ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে ওদের মধ্যে। ইউটিলিটি বেঙ্গে টু-ওয়ে রেডিও, বেরেটা পিস্তল, ফ্ল্যাশ-ব্যাং ক্যানিস্টার আর বাড়তি অ্যামিউনিশন প্রমাণ করছে যে, সাজসজ্জায় তেমন কমতি নেই; তারপরও ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ধরা

৫।৩ের সাব-মেশিনগান দেখিয়ে দিচ্ছে... কমতি রয়েছে উদ্যমে।
শব্দগুণ্টা শুভ, দুই বন্দিকে আর বড় কোনও থ্রেট ভাবছে না
শোকগুণ্টা। তাদের এই ভাবটাকে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার
করা যাবে।

বক্সারের দিকে এবার নজর ফেরাল রানা। লোকটার
ব্যাগি-প্যান্টের একটা পকেট ঝুলে রয়েছে ওজনে। রানা বা
সোহানার সিগ-সাওয়ার সম্ভবত ওখানেই রেখেছে সে। আরেক
পাশের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে রানার এমারসন নাইফটার
হাতল।

‘ম্যাচটা দিয়ে দাও,’ হুকুম দিল ব্ল্যাক উইডো।

দ্বিরুক্তি না করে মেয়েটার পায়ের কাছে ওটা ছুঁড়ে ফেলল ও।
ভুরু কুঁচকে তোবড়ানো বাক্সটা তুলে নিল ব্ল্যাক উইডো। ‘বাক্সটার
এ-অবস্থা করেছ কেন?’

‘পকেটে ম্যাচের বাক্স রেখে ত্রল করেছ কখনও?’ হালকা
গলায় বলল রানা। ‘ওই অবস্থাই হয়।’

ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না যুবতী, বাক্সটা গুঁজে
রাখল পকেটে। ওখান থেকে যে কাঠি এবং একটু কাগজ ছিঁড়ে
রাখা হয়েছে, সেটা আর জানতে পারল না। বন্দিদের দিকে
তাকিয়ে বলল, ‘আরেকটা সুযোগ দিতে এসেছি। ডাক্তার এসে
পড়লে কিন্তু ব্যাপারটা তোমাদের জন্য আর সুখকর থাকবে না...’

‘হ্যাঁ, এমনিতে সুখের সাগরেই ভাসছি বটে!’ বাঁকা উত্তর দিল
রানা।

‘ঠাট্টা বন্ধ করো!’ ধমক দিল ব্ল্যাক উইডো। ‘আমি রসিকতা
পছন্দ করি না। তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি, কাজেই
আমাকে না-খাপানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।’

‘বুঝলাম। তা... কী সাহায্য করতে এসেছ?’

‘আমাদের সঙ্গে ল্যাপটপ কম্পিউটার আছে,’ বলল ব্ল্যাক

উইডো। 'ইন্টারনেট ব্রাউজ করে কিছু তথ্য ডাউনলোড করে এনেছি। দেখো, এগুলো শুনে কিছু মনে করতে পারো কি না।' জ্যাকেটের পকেট থেকে কয়েকটা প্রিন্টআউট বের করল সে। ট্রয় ডোনাহিউ। সোনালি-চুলের, সুদর্শন, লম্বা টিনেজ হার্টথ্রব; কাঠ-অভিনয়ের জন্য সমালোচিত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান। তাঁর সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবিগুলো হচ্ছে: 'আ সামার প্লেস', 'সুজান স্লোড', 'প্যারিশ', 'রোম অ্যাডভেঞ্চার', 'পাম স্প্রিং উইকএণ্ড...' নাম কোনোটা তোমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে?'

'ছবির নাম আসলে ভাল করে দেখিনি আমি। তবে হ্যাঁ, নায়িকার নামটা বক্স থেকে পড়েছিলাম।'

'নায়িকাদের লিস্ট আছে আমার কাছে।' পাতা উল্টে পড়ল ব্ল্যাক উইডো, 'কনি স্টিভেনস্, স্যাণ্ড্রা ডি, সুজান প্লেসেট, স্টেফানি পাওয়ার্স...'

'স্যাণ্ড্রা ডি,' বলল রানা, মাঝে মাঝে সঠিক তথ্য দিয়ে শত্রুকে লেজে-খেলাচ্ছে ও। 'স্যাণ্ড্রা ডি-র সঙ্গে যে-ছবিটা করেছে।'

'আ সামার প্লেস,' প্রিন্টআউট থেকে প্লট পড়ল ব্ল্যাক উইডো। 'মেইন-এর রিসর্ট শহরে ভালবাসার কাহিনি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'কী মনে হয় তোমার? সিদ্ধিকী কি মেইনে যাবার স্বপ্ন দেখছিল?'

'সমস্ত ইনফরমেশন মিলিয়ে না দেখলে সেটা বলা মুশকিল,' নীরস গলায় জানাল রানা।

'হুম। ঠিক আছে, তা হলে ক্লিট ঈস্টউডের ছবি। থ্রিলার, তাই না?'

'অন্তত ওঅর মুভি বা ওয়েস্টার্ন ছিল না ওটা, আমি শিয়ার।' নাম পড়তে শুরু করল ব্ল্যাক উইডো। 'ডার্টি হ্যারি?'

'না।'

‘ম্যাগনাম ফোর্স, দ্য এনফোর্সার, দ্য ডেড পুল।’

‘উহু।’

‘দ্য আইগার স্যাক্ষশন, প্লে মিস্টি ফর মি, থাণ্ডারবোল্ট অ্যাণ্ড লাইটফুট, টাইটরোপ।’

‘একটাও না...’ বলতে বলতে মাথাটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল রানার। মনে পড়ে গেল ছবিটার নাম। চেহারায় অবশ্য এই আবিষ্কারের কোনও ছাপ ফুটতে দিল না, আগের মতই নির্বিকার রাখল মুখটাকে।

‘ভারি যন্ত্রণা তো!’ চেহারা বিকৃত করে ফেলল ব্ল্যাক উইডো। তারপর আবার পড়ল, ‘দ্য গণ্টলেট, দ্য রুকি, ইন দ্য লাইন অভ ফায়ার।’

‘নাহ্।’

‘আ পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড, অ্যাবসলিউট পাওয়ার, ট্রু ক্রাইম, ব্লাড ওয়ার্ক।’

আবার মাথা নাড়ল রানা।

রাগী ভঙ্গিতে কাগজগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ব্ল্যাক উইডো। হিসিয়ে উঠে বলল, ‘লিস্ট খতম, তোমাদের সঙ্গে আলোচনাও খতম। অসুবিধে নেই, আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে আমাদের ডাক্তার। তখন তুমি কীভাবে মুখ বন্ধ রাখো, তা-ই দেখব আমি।’

উল্টো-ধুরে গটমট করে হেঁটে চলে গেল যুবতী, পিছু পিছু বাকিরা। প্রবেশপথের স্ল্যাবটা নেমে এসে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল ভিতরটা।

ভেরো

এবার আগের চেয়েও গুমোট মনে হলো ভিতরটা। সোহানাকে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুনল রানা, যেন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ স্বাভাবিক করবার জন্য ও বলল, ‘যাক, অন্তত একটা সুখবর আছে।’

‘আমার কল্পনাতে আসছে না, সেটা কী হতে পারে।’ সোহানার কণ্ঠে হতাশা।

‘আমাদের বেল্টগুলো নেয়নি ওরা।’ দেয়াল হাতড়ে এগোতে শুরু করল রানা, যেখানে বেল্টটা ফেলে রেখেছিল, সেখানে গিয়ে থামল। পায়ের স্পর্শে জিনিসটা খুঁজে বের করল ও, তারপর নিচু হয়ে তুলে নিল হাতে। ‘রিল্যাক্স,’ সাহস জোগানোর সুরে বলল ও। ‘আবার আলো জ্বালছি।’

‘ম্যাচটা নিয়ে গেছে না?’

‘সব কাঠি দিইনি।’ আগুন জ্বালল রানা, তৃতীয় হাতটা ব্যবহার করে আগের মত আবার মশাল তৈরি করল। কাঁপা কাঁপা আলোয় সোহানার ছাইবর্ণ চেহারাটা দেখতে পেল ও—মুখ শুকিয়ে গেছে দুশ্চিন্তায়। ওর ভিতরের সমস্ত আত্মবিশ্বাস আর সাহসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে ফিয়ার-গ্যাস।

‘খারাপ লাগছে?’ নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

‘তৃষ্ণা পেয়েছে।’

‘স্বাভাবিক, অ্যাড্রেনালিনের এফেক্ট ওটা।’

‘মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খটেখটে হয়ে আছে, রানা। একটু যদি পানি পেতাম... একটা যদি পানির কল থাকত...’ বলতে বলতে থমকে গেল সোহানা। ওর চোখদুটোয় উজ্জ্বলতা ফুটতে দেখা গেল।

‘কী?’ সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

‘কল-টল সব খুলে নিয়ে গেছে ওরা, কিন্তু দেয়ালের ভিতরে বসানো পানির লাইন নিশ্চয়ই সরাতে পারেনি?’

‘কী বলতে চাইছ?’

‘কলের দরকার কী, রানা? শুধু লাইন দিয়ে পানি পেলেই একটা ফাঁদ তৈরি করতে পারি আমরা... ওদের জন্যে!’

সোহানার প্ল্যানটা এবার ধরতে পারল রানা। হেসে বলল, ‘এক্কেবারে ঠিক বলেছ।’

‘কুইক, বাথরুমটা খুঁজে বের করতে হবে!’

মশাল নিয়ে দ্রুত পা চালাল ওরা, উঁকি দিয়ে দেখতে শুরু করল শূন্য ল্যাবের একটার পর একটা কামরা। করিডোরের শেষ মাথায় পাওয়া গেল বাথরুম। ভিতরে ফিস্ফিসার বলতে কিছু নেই, শুধু দেয়ালের গায়ে কয়েকটা লোহার ক্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওখানে শাওয়ার-ট্যাপ, ইত্যাদি লাগানো ছিল।

কাছে গিয়ে ক্যাপগুলো দেখল ওরা। বেশ শক্ত করে লাগানো হয়েছে, ভালমত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পানির পাইপের খোলা মুখ। খালি হাতে খোলা সম্ভব না কোনোমতেই। কী করা যায়, ভাবল রানা। একই সঙ্গে চোখ বোলাতে থাকল চারপাশে। সোহানার বেল্টের উপর নজর পড়তেই মুখে হাসি ফুটল। ছোট্ট বাকলটা মোটামুটি শক্তভাবেই এঁটে যাবে ক্যাপের চতুষ্কোণ মাথায়।

বাকলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। কাজটা সহজ নয়, ক্যাপের মাথায় আটকানো গেলেও চাপ দেয়ার মত যথেষ্ট জায়গা

নেই ছোট জিনিসটাতে। চামড়ার বেন্টটাকে লিভারের মত ব্যবহার করল ও, কাজ যা হবার ওটুকুতে হচ্ছে। একটু পরেই কপালে ঘাম জমল ওর, হাতের মুঠি ব্যথা করতে শুরু করেছে, তবু হাল ছাড়ল না। অক্লান্ত চেষ্টার ফল মিলল একটু পরে। পঁচা খুলে একটু ঢিল হলো ক্যাপটা, এরপর খালি হাতেই ঘুরিয়ে খুলে ফেলা গেল পুরোটা।

মুখ কালো হয়ে গেল সোহানার, খাটুনিটা মাঠে মারা গেছে, খোলা পাইপ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বেরুচ্ছে না, ভিতরটা খটখটে শুকনো।

‘মেইন ভালভ আছে নিশ্চয়ই,’ অনুমান করল রানা। ‘ওটা সম্ভবত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এসো খুঁজে দেখি।’

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পাশের কামরায় উঁকি দিল ওরা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ওটাই ল্যাবের ইউটিলিটি রুম। মেঝে ফুঁড়ে উঠে আসা একটা মোটা পাইপ দেখা গেল, ছাতের কাছে গিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো পাইপের একটা নেটওয়ার্কে বিভক্ত হয়ে গেছে ওটা। ছোট পাইপগুলো চলে গেছে চারপাশের দেয়াল ভেদ করে।

‘ওইস্তো!’ আঙুল তুলে দেখাল সোহানা। মোটা পাইপের গায়ে মেইন ভালভটা দেখতে পেয়েছে।

ওটা ঘোরাতে বিশেষ শক্তি খরচ হলো না, দেড়-ফুট ব্যাসের হুইল ঘুরিয়ে সহজেই ভালভটা খুলে দেয়া গেল। পরমুহূর্তেই ‘পানির প্রবাহের শব্দ শুনল ওরা, প্রথমে ধীরে... তারপর প্রবল বেগে বইতে শুরু করল পানি। কান পাতল দুই বিসিআই এজেন্ট, পাশের বাথরুম থেকে ভেসে আসছে মেঝেতে পানি ছলকানোর আওয়াজ—খোলা পাইপের মুখ দিয়ে পড়তে শুরু করেছে অঝোর ধারা।

মশালটা নিভে আসছে, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে শেষ হাতাটা বের করল রানা, বাকলে জড়িয়ে জ্বলে দিল ওটা। সোহানার

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কতটা সময় পেরিয়েছে?’

ঘড়ি দেখল সোহানা। ‘দশ মিনিট।’

‘তারমানে বিশ মিনিট পাব আমরা করিডোরটা পানিতে ভাসানোর জন্য। এসো।’

ইউটিলিটি রুম থেকে বেরিয়ে এল দুজনে, বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। দেখা গেল, খোলা পাইপ দিয়ে বেরুতে থাকা পানি শুধু মেঝের মাঝখানটা ভিজিয়েছে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছে এক কোণের ড্রেন দিয়ে।

‘শিট!’ গাল দিয়ে উঠল রানা। তাড়াতাড়ি গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেটটা। সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমারটাও দাও।’

কথা না বলে খুলে দিল সোহানা। তারপর পাইপে মুখ লাগিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিল পানি।

জ্যাকেটদুটো নিয়ে ড্রেনের মুখের কাছে চলে গেল রানা, দলা পাকিয়ে বন্ধ করে দিল পানি বেরুনোর পথ। একটু পরেই ওখানটায় জমতে শুরু করল পানি, যাবার পথ না পেয়ে ছড়াতে শুরু করল পুরো বাথরুম জুড়ে, এদিকটা সয়লাব হয়ে গেলে খোলা দরজা দিয়ে করিডোরে বেরিয়ে যাবে।

ছড়াতে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত বোধ করল রানা—বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। শার্টটা খুলে সোহানার হাতে তুলে দিল ও, বলল, ‘আগুনটা যেন না নেভে।’ তারপর সোহানার বেল্ট নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। দ্রুত খুলে দিতে শুরু করল দেয়ালের গায়ে লাগানো সবক’টা ক্যাপ। একটু পরেই মোট চারটে পাইপ থেকে পানির ধারা বেরুতে শুরু করল। এবার খুব দ্রুতবেগে ছড়িয়ে যাচ্ছে পানি, করিডোর ভেসে যেতে সময় লাগবে না।

বাথরুম ছেড়ে আবার ইউটিলিটি রুমে ফিরে এল ওরা। একপাশের দেয়ালে ইলেকট্রিসিটির ব্রেকার-বক্স দেখেছে রানা

আগে, এগিয়ে গেল ওটার দিকে। দুটো তার বাছাই করল ও, তারপর টেনে সেগুলো বক্স থেকে বের করে আনতে শুরু করল। খেয়াল রাখল যেন ছিঁড়ে না যায়। তারদুটো মেঝের কাছাকাছি পৌঁছোতে থামল ও, দাঁত দিয়ে কামড়ে ডগার ইনসুলেশন কিছুটা আলাদা করল, খোলা জায়গাটায় হাত দিলে এবার শক খাবে যে-কেউ।

সোহানাও অবশ্য বসে নেই, রানার শার্ট ছিঁড়ে মশালটাকে টিকিয়ে রাখছে ও, মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে করিডোরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা পানি নিজের পছন্দমত জায়গায় পা দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পর প্রস্তুতি শেষ হলো ওদের। কপাল ভাল বলতে হবে, কাজের মাঝখানে হাজির হয়ে বাগড়া দেয়নি ব্ল্যাক উইডো। ডাক্তার সম্ভবত দেরি করছে আসতে। শেষ বারের মত করিডোরটা দেখে ইউটিলিটি রুমে ফিরে এল রানা। নিভিয়ে ফেলল আগুন। ইতোমধ্যে ওখানেও পৌঁছে গেছে পানি, ব্রেকার-বক্সের নীচের মেঝে খইখই করছে। তারমধ্যে বিদ্যুতের তারদুটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা।

মেইন ভালভ বন্ধ করে দিল রানা, তারপর এসে দাঁড়াল সোহানার পাশে। মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়া পাইপের সঙ্গে বেল্টদুটোর সাহায্যে দুটো লুপ তৈরি করল ও, সোহানার হাত থেকে এরপর নিয়ে নিল তারগুলো।

‘সময় হয়েছে,’ বলল রানা। ‘তৈরি থাকো।’

‘কী মনে হয়?’ বলল সোহানা। ‘কাজ হবে?’

‘লেটস্ হোপ ফর দ্য বেস্ট।’

কচ্ছপের গতিতে গড়িয়ে চলল সময়। অস্বস্তিকর পরিবেশ, তা-ও কথা বলল না দুজনে। টেনশন বোধ করছে। এভাবে আরও দশটা মিনিট কাটবার পর নড়ে উঠল সোহানা। ফিসফিসিয়ে

বলল, ‘শুনতে পাচ্ছ?’

শুনেছে রানা। ল্যাবের প্রবেশপথের হাইড্রলিক মোটর জ্যান্ড হয়ে উঠেছে, সরে যাচ্ছে স্ল্যাবটা। কংক্রিটের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে করিডোরে ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি দেখতে পেল ওরা। শোনা গেল ব্ল্যাক উইডোর কণ্ঠ।

‘ডাক্তার এসে পড়েছে, বাছারা!’

সাদা দিল না রানা-সোহানা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা।

‘কোথায় তোমরা?’ বিরক্ত গলায় চৈচাল ব্ল্যাক উইডো।

চুপ করে থাকল রানা-সোহানা।

‘লুকোচুরি করলে কী ঘটবে, মনে আছে তোমাদের?’

জবাব দিল না ওরা।

‘বেশ!’ সরোষে বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেডই তা হলে তোমাদের প্রাপ্য।’

করিডোর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে বোঝা গেল, কানে ইয়ার-প্লাগ পরছে দলটার সবাই। আবছা আলোয় সোহানার দিকে তাকাল রানা, ইশারা করল দু’হাতে কান চেপে ধরে রাখতে। অবশ্য ইউটিলিটি রুমে যদি শেষ পর্যন্ত গ্রেনেড ফাটানো হয়, এই কান চেপে ধরায় কিছুই যাবে-আসবে না; ব্যাপারটা স্রেফ মনের শান্তির জন্য করা।

মহিলা এক ‘কথার মানুষ। কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রথম। গন্থকরণটা ঘটল। প্রবেশপথের পাশের প্রথম কামরায় গ্রেনেড ফাটানো হয়েছে। এরপর সিরিজ বোমার মত ফাটতে শুরু করল ওগুলো। একটা-একটা করে কামরা পেরুচ্ছে শত্রুরা, আর গ্রেনেড ফাটাচ্ছে। প্রতিবারই বাড়ছে শব্দের প্রচণ্ডতা। একদিক থেকে খুশি হলো রানা। নিজেদের বাঁচানোর জন্য প্রতিপক্ষ ইয়ার-প্লাগ আর স্পেশাল গগলস্ ব্যবহার করছে। ওগুলোর

কারণে পানিতে পা ফেলার ছপছপ শব্দ শুনতে পাবে না ওরা, ফাঁদটা ঠিকমত দেখতেও পাবে না।

হঠাৎ থেমে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ব্ল্যাক উইডোর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। ‘হোয়াট দ্য হেল... এখানে পানি এল কোথেকে? অ্যাই... ব্যাপারটা কী, দেখো তো!’

আর দেরি করা চলে না, সোহানার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা। এক লাফে যার যার মাথার উপরের লুপ অঁকড়ে ধরল দুজনে, জিমনাস্টের ভঙ্গিতে শরীর জাগিয়ে তুলল উপরে, হাঁটু ভাঁজ করে পানি থেকে দূরে রাখল পা। হাত থেকে তারদু’টো ফেলে দিল রানা।

দেখার মত একটা দৃশ্য সৃষ্টি হলো পানিতে। প্রথমে একটা-দুটো, তারপর শত-সহস্র আঁকাবাঁকা নীলচে রেখার ঝলকানি উঠল। জালের মত বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যেন, জীবন্ত সরীসৃপের মত নড়াচড়া করছে পানির বুকে। চোখের পলকে ইউটিলিটি রুম পেরিয়ে করিডোরে চলে গেল বিদ্যুতের রেখাগুলো।

গলা-ফাটানো আর্তনাদ শুনতে পেল রানা-সোহানা। করিডোর থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার, সেইসঙ্গে নানারকম শব্দ। খটাস খটাস করে মেঝেতে ধাতব শব্দ হলো—শত্রুপক্ষের হাত থেকে খসে পড়ছে মেশিনগান—ফ্ল্যাশলাইট থেকে শুরু করে সব ধরনের ইকুইপমেন্ট। গড়াতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের কাঁপা কাঁপা আলোয় করিডোরের দেয়ালে ছায়া দেখতে পেল রানা-সোহানা। একে একে ভূপাতিত হচ্ছে শত্রুদলের সদস্যরা, মেঝেতে পড়ে শরীর মোচড়াচ্ছে। একটা সাবমেশিনগানের টানা ক্যাট-ক্যাট শব্দে কানে তালা লেগে গেল, করিডোরের দেয়ালে ফুলকি তুলছে বুলেট-বৃষ্টি। হাত থেকে অস্ত্র ফেলেনি লোকটা, অদৃশ্য প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়ছে... কিংবা ইলেকট্রিক শকে নিজের অজান্তেই

ট্রিগারের উপর আঙুল চেপে বসেছে তার । .

ম্যাগাজিন খালি হয়ে যেতেই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল । একটু অপেক্ষা করে ঝুলন্ত তারদুটো তুলে নিল রানা, তারপর নেমে এল মেঝেতে । ওর দেখাদেখি সোহানাও । তারদুটো গুটিয়ে ব্রেকার-বল্টের উপর তুলে রাখল রানা, বেরিয়ে এল ইউটিলিটি রুম থেকে ।

ভেজা করিডোরে দশটা দেহ পড়ে থাকতে দেখল ওরা । ন'জনের গায়ে সামরিক পোশাক, শেষ লোকটা সুট-পরা । পাশে একটা ডাক্তারি ব্যাগ গড়াগড়ি খাচ্ছে । একটা এমপি-৫ সাবমেশিনগান তুলে নিল রানা, তাক করে রাখল অজ্ঞান শত্রুদের দিকে—যদি এখনও কারও হুঁশ থাকে, সে যেন কোনও ট্যা-ফোঁ করতে না পারে । অ্যাভুটিকে দেখতে পেল ও, উপুড় হয়ে পড়ে আছে পানিতে । প্যাণ্টের পকেট ফুলে আছে যথারীতি ।

‘সিগ-সাঁওয়ারগুলো নাও,’ সোহানাকে বলল রানা । ‘আমার ছুরিটাও ।’

পকেট হাতড়ে অ্যাভুটিনের কাছে একটামাত্র সিগ-সাঁওয়ার পেল সোহানা, অন্যটা সম্ভবত ব্ল্যাক উইডো নিয়ে গেছে । পিস্তলটা ওকে রাখতে বলল রানা, এমারসন নাইফটা গুঁজে রাখল নিজের কোমরে । অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রানার, যখন খেয়াল করল—পড়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে কোনও নারী নেই । প্রমাদ মনেল ও—যেভাবেই হোক, ব্ল্যাক উইডো ওদের ফাঁদটাকে ফাঁকি দিয়েছে ।

আর দেরি করল না রানা, ছুট লাগাল ল্যাবের প্রবেশপথের দিকে । ওটা এখনও খোলা । সিঁড়ির উপরের ধাপে একটা ডায়ামূর্তি চোখে পড়ল ওর, প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে । গুলি করল না, মানুষটার পিছনে সিঁড়ির ধাপে ফুলকি তুলল বুলেট, কিন্তু শাস্ত্রভেদ করতে পারল না ।

ব্ল্যাক উইডোকে ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল রানা, পরমুহূর্তেই গুঞ্জন উঠল ওপেনিং মেকানিজমে—স্ল্যাবটা নেমে আসতে শুরু করেছে। ডাইনিটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম চেপে দিয়েছে।

পাগলের মত ছুটল রানা, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশ। আর কিছুতেই বেরুতে পারবে না এই নরক থেকে। পিছনে সোহানার পায়ের শব্দ পেল ও, কিন্তু ওকে কিছু বলল না, সমস্ত মনোযোগ এখন বেরুনোর দিকে।

সিঁড়িতে পৌঁছে গেছে রানা, একেক লাফে দু-তিনটে করে ধাপ পেরুতে শুরু করল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্ল্যাবটাও নেমে আসছে। শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছুল, তখন ফাঁকাটার প্রস্থ মাত্র দু'ফুট। সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাটের মত লাফ দিল ও, নিখুঁতভাবে জ্যা-মুক্ত তীরের মত পেরিয়ে গেল ফাঁকটা... আর ও পেরুতেই পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল স্ল্যাবের দরজা।

বল্ট করে উঠে বসল রানা, উজ্জ্বল সূর্যালোকের সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করল না, চোখ ছোট করে তাকাল চারদিকে। হতচকিত চারজন সৈনিককে আবছাভাবে দেখতে পেল ও, চমক সামলে অস্ত্র তুলতে চেষ্টা করেছে। তবে রানা ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত, নিমেষে হাতের সাবমেশিনগান সিধে করে গুলি চালাল।

কেভলার ভেস্ট-বিহীন বুকে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল একজন, উল্টে পড়ে গেল মাটিতে। আরেকজন অবশ্য অস্ত্র তুলতে পারল, তবে ট্রিগার চাপার আগেই রানার বুলেট তার থুতনি আর চোয়াল উড়িয়ে নিয়ে গেল। অবস্থা দেখে বাকি দুজন আর খোলা ময়দানে লড়াইয়ের চেষ্টা করল না। উল্টো ঘুরে সোজা ছুট লাগাল ফার্মহাউসের ধ্বংসস্তুপের পিছনে। রানাও উঠে দাঁড়াল, ছুটল কাভারের খোঁজে। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হবার আগে

ওদেরকে ধাওয়া করা, বা সম্মুখসমরে নামা-টা স্রেফ নির্বুদ্ধিতা হবে।

আস্তাবলের পাশে একটা পাথুরে চৌবাচ্চার পিছনে আড়াল নিল ও—ওটা ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। জায়গাটায় পৌঁছেছে কি পৌঁছেনি, এমন সময় গর্জে উঠল মেশিনগান। দুই পলাতক পজিশন নিয়ে ফেলেছে ধ্বংসস্তুপে, ওখান থেকে ফায়ার শুরু করেছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, পাথরের চৌবাচ্চা সমস্ত বুলেট ঠেকাতে পারবে অবলীলায়, কাজেই অস্ত্রির হবার কিছু নেই। একমাত্র চিন্তা ব্ল্যাক উইডোকে নিয়ে—ডাইনিটাকে দেখা যাচ্ছে না; কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, কে জানে! দুই সৈনিক যেখানে পজিশন নিয়েছে, তার অন্যপাশ থেকে এগিয়ে এসে ওকে ক্রোণাঠাসা করবার চেষ্টা করছে হয়তো।

রানা বুঝতে পারল, চৌবাচ্চার পিছনে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। শত্রুরা ওকে ক্রসফায়ারে ফেলবার সুযোগ পেয়ে যাবে তা হলে। কিন্তু যাবেটা কোথায়? সোহানার জন্যও চিন্তা হচ্ছে। ল্যাভে আটকা পড়েছে ও, দরজাটা খুলতে হলে ব্ল্যাক উইডোর রিমোটটা প্রয়োজন হবে... এবং তাড়াতাড়ি। ভিতরের অচেতন সৈনিকরা জান ফিরে পেলে মহাবিপদে পড়ে যাবে সোহানী। সিগ-সাওয়ারটা আছে বটে, হয়তো সৈনিকদের অস্ত্রগুলোও সরিয়ে ফেলতে পারবে,, কিন্তু সবাই মিলে হামলা করলে দুর্বল আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্টায় গুলি চালাতে পারবে কি না সন্দেহ।

চৌবাচ্চার আড়াল থেকে একটু উঁকি দিল রানা। ব্ল্যাক উইডোর ফোর্ড এক্সপ্রোরার দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। পাশে একটা সবুজ রঙের স্টেশন ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে—ডাক্তার সম্ভবত ওটায় চড়ে এসেছে। ডাইনিটা কি ওগুলোর পিছনে লুকিয়েছে? এখান থেকে বোঝা সম্ভব নয়, গাড়িদুটো ওর বর্তমান

পজিশন থেকে বেশ দূরে। কাছে যাবার চেষ্টা করলে লুকানো দুই সৈনিকের সহজ শিকারে পরিণত হবে।

পরিস্থিতিটা বিচার করল রানা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ব্ল্যাক উইডোর দলের শুধু ওই দুই সৈনিকই এখন ওর প্রতিপক্ষ। বাকিরা ল্যাভের ভিতরে বেঁহঁশ হয়ে পড়ে আছে। তবে সংখ্যায় মাত্র দুজন হলেও এরা ঝানু লোক, সামলাতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে, সহায়তা লাগবে ভাগ্যেরও। হাতের এমপি-৫-টা পরীক্ষা করল রানা। ম্যাগাজিনে ত্রিশটা বুলেট থাকে, তবে এখন কটা আছে, সেটাই প্রশ্ন। ল্যাভ থেকে বেরিয়ে তিনবার বাস্ট চালিয়েছে ও, একেক বাস্টে চারটার বেশি বুলেট খরচ হবার কথা নয়, ওভাবেই ট্রেইনিং পেয়েছে। তবে এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন—উত্তেজিত ছিল, হয়তো বা বেশি বুলেট ছুঁড়ে ফেলেছে। একটু বাড়িয়ে ধরল ও, তিন বাস্টে আঠারোটা বুলেট খরচ হয়েছে বলে ভাবল। তারমানে আর বারোটা বুলেট রয়েছে ওর কাছে, দু-একটা বেশি হলে সেটা বোনাস। তবে আপাতত এগুলোই ওর সম্বল। সঙ্গে বাড়তি অ্যামিউনিশন নেই। হিসেব করে খরচ করতে হবে প্রত্যেকটি বুলেট।

সিলেকশন লিভারটা অটোমেটিক থেকে সিঙ্গেল-শটে নামিয়ে আনল রানা। তারপর চৌবাচ্চার পিছনের জমিতে নজর বোলাল। কয়েক গজ দূরত্বে একটা নালা চোখে পড়ল—আস্তাবলের ময়লা পানি আর পশু-বর্জ্য যাবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। খুব একটা গভীর নয়, তবে বুকে ভর দিয়ে ক্রল করলে শরীর লুকানো যাবে। ওটা ব্যবহার করেই পজিশন পাল্টাবে বলে ঠিক করল। তার আগে প্রতিপক্ষকে একটু ধোঁকা দেয়া দরকার, বোঝানো দরকার—ও এখানে থেকেই লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছে।

মাটি থেকে এক মুঠো নুড়িপাথর তুলে নিল রানা, ছুঁড়ে দিল বামপাশে। এমনভাবে ওগুলো পড়ল, যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে,

দৌড়ে পালাতে চাইছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে শরীর জাগাল এক সৈনিক, রানা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে ভুল দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা। নিজের এমপি-৫ তুলে ফাঁয়ার করল ও, তবে তাড়াহুড়োয় ঠিকমত নিশানা ভেদ করতে পারল না। কাঁধে গুলির আঘাত পেয়ে চোঁচিয়ে উঠল লোকটা, কট করে বসে পড়ল। ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা—লোকটাকে অচল করতে পারেনি। পারলে লড়াইয়ের ফলাফল ওর অনুকূলে চলে আসত অনেকটাই।

অবশ্য একেবারে ব্যর্থ হলো না পরিকল্পনাটা। গুলি খেয়ে খেপে গেছে সৈনিক আর তার অক্ষত সঙ্গী। তুমুল বর্ষণের মত চৌবাচ্চার দিকে গুলি ছুঁড়ছে তারা, রানা যে সটকে পড়তে পারে, সেটা আর ভাবছেই না। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে গেছে দুজন।

হামাগুড়ি দিয়ে নালায় নেমে পড়ল রানা, বুক মিশিয়ে সরে যেতে শুরু করল। অল্পক্ষণেই নালায় শক্ত তলদেশে ঘষা খেয়ে বুকের চামড়ায় জ্বালাপোড়া শুরু হলো, তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। দাঁতে দাঁত পিষে এগিয়ে চলল। ফার্মহাউসের পাশ ঘেষে চলে গেছে নালাটা, সৌভাগ্যক্রমে ওটার কাছাকাছি পজিশন নেয়নি দুই সৈনিকের কেউ। ফাঁকি দিয়ে উল্টোদিকে চলে যেতে অসুবিধে হবে না।

মিনিট দশেক পরেই পোড়া ফার্মহাউসের সামনে পৌঁছে গেল ও, ওটারদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। নালা ছেড়ে উঠে পড়ল, সামনে দেখতে পেল ওর আর সোহানার টরাস গাড়িটা—পাহাড়ের ফাটল থেকে নিয়ে এসেছে শত্রুরা। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল রানার—পালানোর জন্য নিজস্ব গাড়িটা নাগালের মধ্যে পেয়ে তবে আগে সোহানাকে উদ্ধার করতে হবে।

বামদিক দিয়ে ফার্মহাউসের সামনে উঠে এসেছে ও, এবার

একছুটে চলে গেল ডানে। দেয়ালের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল। ফোর্ড এক্সপ্রোরার আর সবুজ স্টেশন ওয়্যাগনটা বেশ কাছে এখন থেকে, তবে গাড়িগুলোর আড়ালে কেউ আছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা, তাকাল গাড়িদুটোর তলা দিয়ে।

ব্ল্যাক উইডোর বুটজোড়া চিনতে পারল ও, জ্যাকেটের নীচটাও চোখে পড়ল। সামনের চাকার কাছে নিচু হয়ে বসে আছে মেয়েটা। বুদ্ধিমতী, জানে—বনেটের পাশটাই আড়াল নেবার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা; শক্তিশালী বুলেট ছুঁড়েও ইঞ্জিন এফোঁড়-ওফোঁড় করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় অন্যপাশে লুকানো কাউকে আহত করা। উইণ্ডশিল্ড আর জানালার কাঁচ ভেদ করে ব্ল্যাক উইডোর সোনালি চুল দেখা গেল একটু—মাঝে মাঝে মাথা তুলে পাথুরে চৌবাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে সে।

চমৎকার একটা পজিশনে রয়েছে রানা, ওকে দেখতে পাচ্ছে না ব্ল্যাক উইডো, অথচ ও দেখছে। এমপি-৫-টা তুলে ধরল ও, সাবধানে নিশানা করল বনেটের উপরে। আবার ভাইনিটা মাথা তুললেই গুলি করবে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকল রানা, তারপর হঠাৎই আবার দেখতে পেল সোনালি চুল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার চাপল ও। বজ্রপাতের মত শব্দ তুলে ছুটল বুলেট, তবে ব্ল্যাক উইডোর কপাল ভাল, সেই সঙ্গে রিফ্লেক্সও... নড়ে উঠল শব্দটা কানে যেতে। বেঁচে গেল সেজন্যেই। তারপরও আহত হলো অবশ্য—খুলিতে আঁচড় কেটে চলে গেল গুলিটা।

চিত হয়ে ব্ল্যাক উইডোকে পড়ে যেতে দেখল রানা—ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেছে। খুশি-অখুশি কিছুই হলো না ও, শান্তভাবে দ্বিতীয় গুলিটা করবার জন্য তৈরি হলো। মাটিতে শুয়ে পড়ায় ফোর্ড এক্সপ্রোরারের তলা দিয়ে এখন যুবতীর শরীরের

বেশিরভাগটাই ক্রিয়ার ফায়ারিং লাইনে এসে গেছে।

তবে ব্ল্যাক উইডোও কম যায় না, শুয়ে পড়েই পিস্তল-ধরা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে গাড়ির তলা দিয়ে, সোজা রানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গড়ান দিয়ে বুলেটটাকে ফাঁকি দিল রানা। সোজা হবার সময় পেল না, শুনতে পেল ব্ল্যাক উইডোর উন্মত্ত চিৎকার।

‘বেজন্নাটা এদিকে! বাড়ির সামনে!’

দুই সৈনিকের মুখোমুখি হবার ঝুঁকি নিল না রানা, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে আবার চলে গেল ফার্মহাউসের বামদিকে—যেদিক দিয়ে এসেছে। থামল না, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পরপর দুটো কোনা পেরুল, চলে গেল বাড়ির পিছনে। অক্ষত সৈনিক ততক্ষণে নেত্রীর চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে, পায়ে পায়ে এগোচ্ছে বাড়ির ডানদিকে। লোকটার পিছনে গিয়ে উদয় হলো ও।

পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল লোকটা, উল্টো ঘুরে ঠেকাতে গেল আক্রমণ, তবে দেরি করে ফেলেছে। পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়ল রানা—কপাল, বুক আর তলপেট লক্ষ্য করে। নাইন মিলিমিটারের তিন আঘাতে মাটিছাড়া হলো সৈনিক, কয়েক হাত দূরে গিয়ে অছড়ে পড়ল।

গুলি থামল না রানা, পালা করে ব্ল্যাক উইডো আর আহত সৈনিকের অবস্থান লক্ষ্য করে ফায়ার করতে থাকল, সেই সঙ্গে এগিয়ে গেল মৃত সৈনিকের দিকে। ওখানে পৌঁছে হাতের এমপি-৫-টা ফেলে দিল, তুলে নিল অন্যটা, লোকটার কোমর থেকে বাড়তি ম্যাগাজিন-ও নিয়ে পকেটস্থ করল। তারপর আবার গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছিয়ে এল বাড়ির কোনায়।

এতক্ষণে একটু দম ফেলবার ফুরসত মিলল। তাড়াতাড়ি গেল না রানা—দুই শত্রু অবশিষ্ট রয়েছে, দুজনকেই আহত

করেছে ও । কাজেই রক্তক্ষরণে ওদেরকে একটু দুর্বল হতে দেয়া যাক, তারপর নাইয় আবার হামলা করা যাবে । ততক্ষণ বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করল ।

বিশ্রামটা দীর্ঘ হলো না । হঠাৎ মোটরের গুঞ্জন শুনে চমকে উঠল রানা ।

ল্যাবের প্রবেশপথের স্ল্যাবটা সরে যেতে শুরু করেছে!

চোদ্দো

এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইল রানা, তারপরই শঙ্কিত হয়ে পড়ল । বাইরে বেরুলেই বিপদে পড়বে সোহানা । সেজন্যেই নিশ্চয়ই রিমোটের বোতাম চেপেছে ব্ল্যাক উইডো—ওকে বেরিয়ে আসার জন্য প্ররোচিত করেছে । বেরুলেই খুন, কিংবা জিম্মি করবে ।

স্ল্যাবটা সরে যেতেই সিঁড়ির মাথায় সামান্য নড়াচড়া দেখা গেল । সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় চৈঁচাল রানা, ‘সোহানা! বেরিয়ো না!’

চিৎকারটা দিয়েই ঝট করে বসে পড়ল ও । প্রায় একই সঙ্গে দুই পশলা গুলি ছুটে এল—একটা সাব-মেশিনগানের, অন্যটা পিস্তলের । ওর অবস্থান বুঝতে পেরে গুলি চালিয়েছে ব্ল্যাক উইডো আর আহত সৈনিক । ফার্মহাউসের পোড়া, দুর্বল দেয়াল এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গেল বুলেটগুলো, বসে না পড়লে লাশ হয়ে যেত রানা ।

হামাগুড়ি দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল ও । আবার চৈঁচাল, ‘সোহানা! শুনতে পাচ্ছ? বেরিয়ো না ওখান থেকে!’

এবার আর গুলি হলো না—ব্ল্যাক উইডো ও তার সঙ্গী অ্যামিউনিশন বাঁচাচ্ছে।

সোহানার গলা আবছাভাবে শোনা গেল আস্তাবলের দিক থেকে, বাংলাতে কথা বলছে ও-ও। ‘বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একা তুমি ওদেরকে সামলাতে পারবে?’

‘পারব। মাত্র দুজন ওপরে। তুমি ওখানেই থাকো। বেরুলেই ডাইনিটা গুলি করবে তোমাকে। সেজন্যেই খুলে দিয়েছে এন্ট্রান্স।’

‘ও খোলেনি, আমিই খুলেছি।’

‘কী?’ বিস্মিত হলো রানা।

‘ওই যে, ইলেকট্রিকের ওয়ায়্যার জোড়া দিয়ে খোলার প্ল্যান করেছিলে না?’

‘খুব ভাল। মাথা নামিয়ে রাখো... আরও ভাল হয় যদি নীচে চলে যাও। নইলে এন্ট্রান্সের দিকে ওরা গুলি করলে রিকোশেটে আহত হবে।’

একটু নিশ্চুপ রইল সোহানা, কী যেন ভাবল, তারপর বলল, ‘নীচে যেতে হবে না, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ওরা দুজন কোথায় আছে, বলতে পারবে?’

‘ডাইনিটা তোমার ডানে, ওর গাড়ির পিছনে। সঙ্গে লোকটা প্যাবের এন্ট্রান্স থেকে একটু বাঁয়ে ফার্মহাউসের আড়ালে।’

‘ওদের গাড়িটা কি আগের জায়গাতেই আছে? মানে... যেখানে পার্ক করেছিল?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

খুলে বলল সোহানা। শেষে যোগ করল, ‘কয়েক মিনিট সময় দাও আমাকে। তারপর ইশারা দিলেই ফায়ার করতে রেডি থাকো।’

এমপি-৫-এর ম্যাগাজিন খুলে অ্যামিউনিশন চেক করে নিল

রানা। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল নালায়। ফার্মহাউসের আড়াল থেকে ওর উদয় হবার অপেক্ষায় আছে প্রতিপক্ষ, নালা থেকে নয়। ওদেরকে চমকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চাইছে।

একটু পরেই শোনা গেল সোহানার ডাক, 'তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

'এক থেকে পাঁচ গোনো।'

দম আটকে কাউন্টাউন শুরু করল রানা, গোনা শেষ হতেই ল্যাবের এন্ট্রান্স থেকে দুটো ডিমের মত বস্তু উড়ে বেরল—সোজা গিয়ে পড়ল আহত সৈনিকের পজিশনের কাছাকাছি। ধাম্ ধাম্ করে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল, সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো! ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়ছে সোহানা।

প্রথম দুটো বিস্ফোরণের রেশ না মিটতেই আরও দুটো ছুঁড়ল ও। প্রথমবার টার্গেট থেকে একটু দূরে পড়েছিল, তবে এবার থ্রোয়িং প্রয়োজনীয় কারেকশন দিয়ে নিয়েছে, তাই বলতে গেলে লোকটার পায়ের কাছে পড়ল গ্রেনেডদুটো।

দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণের সঙ্গে আর্তনাদ শুনতে পেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দেখল, দুহাতে কান চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে সৈনিক, ফ্ল্যাশ-ব্যাং বিস্ফোরণে সাময়িকভাবে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে সে। তবে লোকটা দুনিয়ার সেরা ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধা... স্পেশাল-অপসের সদস্য... তাই কিছু দেখতে-শুনতে না পেলেও শুধু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝে ফেলল রানার অবস্থান। কান ছেড়ে দিয়ে মাতালের মত কাঁধে-ঝোলানো সাবমেশিনগান তুলতে শুরু করল।

নির্দিধায় গুলি ছুঁড়ল রানা। সৈনিকের বুকে তিনটে ক্ষত সৃষ্টি হলো, বুলেটের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ধ্বংসস্থূপের ভিতর আছড়ে পড়ল ওর শরীরটা।

সোহানা অবশ্য হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর এবারকার টার্গেট

ব্ল্যাক উইডো। জোড়ায় জোড়ায় ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়ে ও পার্ক-করা ফোর্ড এক্সপ্লোরারের অবস্থান আন্দাজ করে। একের পর এক বিস্ফোরণে কান ঝালাপালা, ওদিকে এগোনোও যাবে না। তাই নালা ছেড়ে ছুটতে শুরু করল রানা, আগেরবারের মত ফার্মহাউসের পাশ ঘুরে সামনের দিক দিয়ে চলে গেল অপরপ্রান্তে। ওখান থেকে ব্ল্যাক উইডোর অবস্থা দেখবে, প্রয়োজনে ঘায়েল করবে।

ততক্ষণে গ্রেনেড-বর্ষণ কমিয়ে ফেলেছে সোহানা, রানা যখন ফার্মহাউসের পাশ থেকে গাড়িটার দিকে উঁকি দিল, তখন আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না কারও। চেষ্টা করে সোহানাকে থামতে বলল ও, তারপর বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। পায়ে পায়ে এগোল ফোর্ডের দিকে। যতই কাছে গেল, ততই বিস্মিত বোধ করল—আমেরিকান যুবতীটির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। যেভাবে গ্রেনেড ছুঁড়েছে সোহানা, তাতে পালাবার কোনও সুযোগ ছিল না। এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবার কথা। কিন্তু নেই তো! গেল কোথায়?

হঠাৎ চমকে উঠল রানা—ব্ল্যাক উইডোকে দেখতে পেয়েছে। ফোর্ডের ড্রাইভিং সিটের উপর শুয়ে ছিল মেয়েটা, ও কাছাকাছি পৌঁছুতেই উঠে বসেছে। মাথার একপাশের চুল সামান্য রক্তে ভেজা, রানার বুলেট আঁচড় কেটেছিল ওখানটায়, নইলে পুরোপুরি সুস্থ সে। কারণটা ব্যাখ্যা করবার জন্যই যেন কানে হাত দিল ব্ল্যাক উইডো, বের করে আনল একটা ইয়ার-প্লাগ। অন্য হাতে একটা স্পেশাল গগলস্ তুলে দেখাল। চালু মেয়ে, রানা-সোহানার বাংলা কথোপকথন বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু সতর্ক হয়ে গিয়েছিল ওরা কোনও ফন্দি আঁটছে বুঝতে পেরে। সোহানা প্রথম গ্রেনেড-জোড়া ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার-প্লাগ আর গগলস্ পরে ফেলেছিল। কিন্তু এতক্ষণ অপেক্ষা করল কেন? আরও আগেই

পালিয়ে যেতে পারত না?

জবাবটা পরমুহূর্তে পাওয়া গেল। ইগনিশন-কি ঘুরিয়ে ফোর্ড এক্সপ্লোরারের ইঞ্জিন চালু করল ব্ল্যাক উইডো, গিয়ার দিয়ে সবেগে ছুটে এল রানার দিকে, ওকে চাপা দিতে চাইছে। এই মতলবেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, ওকে খতম করার জন্য ফাঁদ পেতে বসে ছিল।

ছুটে আসা ফোর্ডের সামনে নিজেকে নাস্তা মনে হলো রানার, পুরোপুরি উন্মুক্ত জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ও ব্ল্যাক উইডো ঘায়েল হয়েছে ভেবে; নাগালের মধ্যে একটুও আড়াল নেই। এমপি-৫ তুলে গুলি করল... ইঞ্জিন বিকল করে দিতে চায়, কিন্তু ফুলকি তুলে ছিটকে গেল বুলেট। মিলিটারি ভেহিকেলটার সমস্ত শরীর আর্মার-প্লেটে মোড়া। আবার গুলি করল ও—এবার উইণ্ডশিল্ডে। শুধু সামান্য চিড় ধরল কাঁচে—ওটাও বুলেটপ্রুফ। তবে হাল ছাড়ল না রানা, জানে—যত শক্তিশালী কাঁচই হোক, ছ'ইঞ্চি ব্যাসের মধ্যে পর পর পাঁচটা গুলি করলে তা গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য। দক্ষ মার্কসম্যান ও, কাজটা ওর জন্যে কঠিন কিছু নয়।

প্রায় গায়ের উপর চড়ে বসা ফোর্ড এক্সপ্লোরারের উইণ্ডশিল্ডে গুলি করতে থাকল রানা, চোখের সামনে কাঁচের গায়ে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরতে দেখল। তবে ভাগ্য মন্দ থাকলে যা হয়, চারটে গুলি করবার পরেই খালি চেম্বারে ঠকাস করে পড়ল হ্যামার—উত্তেজনায় ম্যাগাজিন বদলাতে ভুলে গেছে ও, ঘুরিয়ে গেছে অ্যামিউনিশন।

আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রানাকে চাপা দেবে ব্ল্যাক উইডো। হাত থেকে এমপি-৫-টা ফেলে দিল ও, উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল, পিছু পিছু ধাওয়া করে এল ফোর্ড। রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডানে কাটাল রানা... বাঁয়ে কাটাল, কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। ব্ল্যাক উইডো দক্ষ চালক, ঘন ঘন ব্রেক

কষে আর স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ট্র্যাকে রাখল গাড়ি।

ইঞ্জিনের তীব্র গর্জন বেড়ে যেতে শুনে এক পলকের জন্য পিছনে তাকাল রানা; আঁতকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর শরীরের উপর উঠে আসছে ফোর্ড। মরিয়া হয়ে ডানে ঝাঁপ দিল ও, গড়ান দিয়ে সরে গেল গাড়ির সামনে থেকে। ওর শরীরের ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল ফোর্ডের চাকা, এক বলকের জন্য টায়ারের খাঁজগুলোও স্পষ্ট দেখা গেল।

মাটি থেকে উড়তে থাকা ধুলো নাকে-মুখে ঢুকতেই কাশতে শুরু করল রানা। চোখেও ঝাপসা দেখছে। উঠে বসে ধাতস্থ হলো ও, হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখ রগড়াল। ধুলো সরে যেতেই আবার দেখতে পেল ফোর্ড গাড়িটাকে—টার্ন নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, ইঞ্জিন আইডলে রেখে। হুঁদুর-বেড়াল খেলতে শুরু করেছে ব্ল্যাক উইডো—ফাটা উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে তার মুখে হিংস্র হাসি দেখা গেল। শিকারকে বাগে পেয়েছে সে—রানা এখন নিরস্ত্র, ক্লান্ত এবং খোলা ময়দানের মাঝখানে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনালা ব্ল্যাক উইডো, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে। উঠে দাঁড়াল রানা, সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটে এল ফোর্ড... তীরবেগে! ঐকে-বৈঁকে ফার্মহাউসের দিকে দৌড়াতে থাকল ও, ওখানে পৌঁছুতে পারলে একটা আড়াল পাওয়া যাবে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই পরিষ্কার হয়ে গেল, পৌঁছানো সম্ভব নয়। হাপরের মত উঠছে নামছে রানার বুক, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। পিছনে ফোর্ডের ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে যেতে শুনল ও, সরে যাবার মত শক্তি অনুভব করল না।

পঠিক তখুনি ফার্মহাউসের পাশ থেকে একটা নারীমূর্তি উদয় হতে দেখল রানা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল—‘রানা! ক্যাচ!!’

সোনালি রোদে ঝিলিক দিয়ে সিগ-সাওয়ারটাকে উড়ে আসতে দেখল রানা, নিখুঁত নিশানায় একেবারে ওর গায়ে পড়তে যাচ্ছে। ঝাঁপ দিল ও, খপ করে ধরল পিস্তলটা; তারপর দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটের মত শূন্যেই মোচড় খাওয়াল শরীরকে। দর্শনীয় ভঙ্গিতে ফোর্ডের দিকে ঘুরে গেল রানা, মাটিতে পড়তে পড়তে গুলি ছুঁড়ল।

উইগুশিল্ডে পঞ্চম শট এটা, ব্ল্যাক উইডোর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে চুরমার হয়ে গেল বুলেটপ্রুফ গ্লাস, বিশাল একটা ফোকর সৃষ্টি হলো ওখানে। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে ওই ফাঁক দিয়ে আরও দুটো গুলি ঢোকাল রানা।

চমৎকার রিফ্লেক্স আরেকবার জীবন বাঁচাল ব্ল্যাক উইডোর। ঝট করে নড়ে গিয়ে বুলেটকে ফাঁকি দিল সে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঘুরিয়ে ফেলল স্টিয়ারিং—বিপদ থেকে সরে যাবার চেষ্টা। স্কিড করে ঘুরে গেল ফোর্ড, মাটিতে পড়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করছিল রানা, গাড়ির রিয়ার-এণ্ড এসে ধাক্কা দিল ওকে। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়ল ও।

ব্যথাটা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, ঝট করে উঠে বসে আবার গুলি চালাল। ফোর্ডের পিছনের উইগুশিল্ডে কামড় বসাল সিগ-সাওয়ারের বুলেট, তবে তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারল না। হাত কাঁপছে রানার, নির্দিষ্ট বৃত্তে থাকছে না গুলি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার গাড়ির মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করল ব্ল্যাক উইডো, রানার দিকে আবার ছুটে আসার ইচ্ছে।

ইচ্ছেটাতে বাদ সাধল নতুন করে ছুটে আসা এক পশলা গুলি। দ্বিতীয় সৈনিকের এমপি-৫-টা জোগাড় করেছে সোহানা, ওটা ব্যবহার করছে। বেগতিক পরিস্থিতি বুঝতে কষ্ট হলো না ব্ল্যাক উইডোর—দ্বিমুখী আক্রমণে ফোর্ডের একটা কাঁচও টিকবে না; তারমানে মোরব্বা হয়ে যেতে হবে তাকে। কাজেই দুঃসাহস

দেখাবার আশ্রয় হারিয়ে ফেলল। তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার পথে উঠল ফোর্ড, ধুলো উড়িয়ে চলে গেল দৃষ্টিসীমা ছেড়ে। পিছন থেকে খামোকাই গুলি ছুঁড়ল রানা-সোহানা, ফায়ারিং-সার্কেল মেইনটেন করতে না পারায় বুলেটপ্রুফ কাঁচ আর আর্মার-প্লেটেড চেসিসে মাথা কুটে মরল বুলেটগুলো।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই চাপা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল, ব্ল্যাক উইডো পালিয়ে যেতেই বেড়ে গেল শব্দটা—রোটরের ভারী আওয়াজ চিনতে পারল রানা, একটা হেলিকপ্টার আসছে। শঙ্কা ভর করল মাথায়, কে আসছে... ব্ল্যাক উইডোর দলের রি-এনফোর্সমেন্ট নয়তো! বুকটা ব্যথায় দপ্ দপ্ করে উঠল হঠাৎ করে—ফোর্ড এক্সপ্লোরারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল যেখানটায়। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে কি না, কে জানে।

আবার গাড়ির আওয়াজ পেল রানা, কয়েক মুহূর্ত পর পাশে এসে থামল টরাস, সোহানা ড্রাইভিং সিটে। ‘উঠে এসো,’ বলল ও। ‘হেলিকপ্টার আসছে...’

‘শুনেছি।’ দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, প্যাসেঞ্জার সিটে বসল সোহানার পাশে। ‘চালাও!’

অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল সোহানা, টায়ারের কর্কশ শব্দ উঠল শক্ত মাটিতে, ধুলো উড়ল। তীরের মত সামনে বাড়ল টরাস। ব্ল্যাক উইডোর পথ ধরে বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে। আঁকা-বাঁকা রাস্তায় ঘন ঘন টার্ন নিতে শুরু করল সোহানা, যত দ্রুত পারে এলাকা থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে।

‘সাবধানে চালাও,’ সতর্ক করল রানা। ‘অ্যাকসিডেন্ট কোরো না।’

‘কেন, আমার ড্রাইভিং তোমার আস্থা নেই?’

জবাব না দিয়ে গ্লাভ-কম্পার্টমেন্ট খুলল রানা, ওখান থেকে

স্পেয়ার-ক্লিপ বের করে হাতের সিগ-সাওয়ারটা রিলোড করল। বলল, ‘আমি এ-পাশটা দেখছি, তুমি তোমার সাইডে চোখ রাখো। ডাইনিটা আমাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে বসে থাকতে পারে।’

এক পলকের জন্য পাশে তাকাল সোহানা। পেরোতে থাকা ঘন গাছগাছালি আর আগাছার জঙ্গল দেখে শুকনো গলায় বলল, ‘লুকানোর জায়গার অভাব হবে না ওর। অবস্থা দেখেছ? এ-জঙ্গলে গোটা এক প্লাটুন সৈন্য লুকালেও বোঝার উপায় নেই।’

‘আছে,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘পিছনে চিহ্ন রেখে গেছে ও।’ আঙুল তুলে সামনে দেখাল—রাস্তার উপরে ব্ল্যাক উইডোর ফোর্ডের উড়িয়ে যাওয়া ধুলো এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, ব্যাপারটা খেয়াল করেনি আগে।

একটু পরেই একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছল গাড়ি। উপত্যকার রাস্তা ওখানে মেইন রোডের সঙ্গে মিশেছে। পিচ-ঢালা রাস্তা একেবারে ফকফকে পরিষ্কার, তাই ধুলো ওড়েনি; বোঝা যাচ্ছে না—ব্ল্যাক উইডো ডানে, নাকি বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। টায়ার ট্র্যাক আছে কি না, দেখল রানা; তবে লাভ হলো না। ডান-বাম দু’দিকেই বেশ কিছু ধুলোমাখা চাকার দাগ চলে গেছে। ওর ভিতর গোনটা যে ব্ল্যাক উইডোর, তা বোঝা সম্ভব নয়।

গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে সোহানা, রানার মত ও-ও আনন্দ্যতায় ভুগছে। জিজ্ঞেস করল, ‘কোনদিকে যাব?’

‘নায়ে যাও,’ বলল রানা, সিদ্ধান্তটা অনুমান-নির্ভর।

মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল সোহানা, টার্ন নিল বামদিকে। রাস্তায় উঠে এসেই মেঝেতে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। মসৃণ রাস্তায় দেখতে দেখতে একশো কিলোমিটারে পৌঁছে গেল গতি, দু’পাশের গাছপালা এখন সাঁই সাঁই করে সরে যাচ্ছে পিছনে, ঘোলাটে দেখাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করল রানা, এই গতিতে ছুটতে

পারলে অ্যামবুশ পেতে সুবিধে করতে পারবে না কেউ। চোখের পলকে যে-কোনও ফাঁদ পেরিয়ে যেতে পারবে ওরা, ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকা টার্গেটে গুলিও লাগাতে পারবে না শত্রুপক্ষ।

খানিক দূর যেতেই আবার ইন্টারসেকশন উদয় হলো। এবারেরটা আগের চেয়ে জটিল—চারদিকে চলে গেছে চারটে রাস্তা। দ্বিধা ভর করল সোহানার চেহারায়। রানার দিকে আবার তাকাল সিদ্ধান্তের আশায়।

‘বাঁয়ে,’ স্থির গলায় বলল রানা।

‘বার বার বাঁয়ে যাবার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে?’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘জুয়া খেলছি বলতে পারো। ডাইনিটাকে পেলে ভাল, না পেলেও কিছু করার নেই।’

শ্রাগ করে আবার বাঁয়ের পথটা ধরল সোহানা। টানা দশ মিনিট সাপের মত আঁকা-বাঁকা রাস্তা পাড়ি দেয়ার পর পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে এল টরাস, নেমে এল সমতল ভূমিতে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর দেখতে পেল ওরা, মাঝখানটা চিরে চলে গেছে উঁচু হাইওয়ে। যতদূর দৃষ্টি যায়, আতিপাতি করে খুঁজল ওরা, কিন্তু ব্ল্যাক উইডো বা তার ফোর্ড এক্সপ্লোরারের চিহ্নও দেখা গেল না কোথাও।

‘কী করব?’ হাঁপিয়ে উঠে জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা—কাঁপতে শুরু করেছে সোহানা। এতক্ষণের, রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে ঢিল পড়ায় আবার ভীতিবোধটা ফিরে আসছে ওর মধ্যে। নরম গলায় রানা বলল, ‘কিছু না। ডাইনিটা পালিয়ে গেছে, আপাতত কিছু করার নেই ও-ব্যাপারে। এক্ষুনি মাথা না ঘামিয়ে বরং একটু সুস্থির হয়ে নিই। নার্ভগুলোর বিশ্রাম প্রয়োজন।’

‘হেলিকপ্টারটা যদি এদিকে চলে আসে?’

মিলিয়ে আসা রোটরের শব্দ নিয়ে বিচলিত হলো না রানা।

মনে হচ্ছে ওটা উপত্যকায় ল্যাণ্ড করেছে। বলল, ‘ওটাতে ব্ল্যাক উইডোর দলের কেউ এসেছে বলে মনে হয় না। তা হলে ডাইনিটা পালাত না।’

‘তা হলে?’

‘সম্ভবত এফবিআই,’ আন্দাজ করল রানা। ‘আমাদের দেরি দেখে এরিক হয়তো খোঁজ নিতে এসেছে।’

‘ওখানে ফিরে যেতে চাও?’

‘উঁহু,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘লড়াইটা আমাদের, এরিককে এর ভেতর জড়ানো আর উচিত হবে না। এমনতেই যথেষ্ট ঝামেলায় ফেলেছি ওকে।’

‘ওখানে ও বসে থাকবে ভেবেছ? তোমাকে-আমাকে না পেয়ে ঠিকই খুঁজতে বেরুবে। হেলিকপ্টার আছে, আমাদের ট্র্যাক করতে পারবে। ঠিকই এসে জুটে যাবে তোমার সঙ্গে।’

‘ল্যাভ, ওখানে পড়ে থাকা অজ্ঞান লোকজন, আর লাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ও; এখুনি আমাদের খোঁজে বেরুতে পারবে না। তার আগেই গা-ঢাকা দেব।’ হাত নাড়ল রানা। ‘ওসব বাদ দাও। তুমি ঠিক আছ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে?’

‘এখনও না। তুমি? ডাইনিটার গাড়ি ধাক্কা দিয়েছিল... বেশি লেগেছে?’

‘সিরিয়াস কিছু নয়। তবে তুমি কিন্তু দারুণ দেখিয়েছ!’ রানার গলায় প্রশংসা। ‘ওয়ায়্যার জোড়া দিয়ে দরজা খোলা... তারপর ফ্ল্যাশ-ব্যাং দিয়ে ডাইভারশন... এ-অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে এতকিছু করতে পারবে ভাবিনি।’

‘মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল আসলে,’ বলল সোহানা। ‘আমি আটকা পড়ে রইলাম, আর তুমি ওপরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একা লড়াই করছ... নিজের অসহায়ত্ব দেখে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।’

‘রাগ জিনিসটা একটা চমৎকার মোটিভেটর,’ মন্তব্য করল

রানা। ‘বিশেষ করে ভয় মোকাবেলার জন্যে। এক্কেবারে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে সাহায্য করেছে তোমাকে।’

‘থাক, আর মোমপালিশ দিতে হবে না,’ কপট রাগ দেখাল সোহানা। ‘নার্ভ ঠাণ্ডা হয়েছে? তা হলে বলো, এখন কী করতে চাও।’

‘যা করছিলাম, তা-ই। সিদ্ধিকীকে খুঁজে বের করব। ব্ল্যাক উইডোর ইন্টারোগেশনে একটা উপকার হয়েছে। ওকে খোঁজার ব্যাপারে নতুন কয়েকটা ক্লু পেয়েছি। আগে ওগুলোর কথা ভাবিনি আমি।’

‘সিদ্ধিকীর পছন্দ-অপছন্দ?’

‘হুঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘কিছুটা সময়ের জন্য সাইকোলজিস্ট হতে হবে আমাদেরকে—লোকটার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য। তবে তার আগে লজিস্টিকসের অবস্থা দেখা দরকার...’

‘একটা পিস্তল খুঁিয়েছি আমরা,’ সোহানা বলল। ‘ওটা সম্ভবত ব্ল্যাক উইডো নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তোমার-আমার ওয়ালেট, টাকা-পয়সা, নকল আই.ডি.—সব।’

‘ব্ল্যাকআপের কী অবস্থা, দেখে নিই।’

সিটের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, একটা গোপন খোপ থেকে বের করে আনল এক তাড়া কাগজপত্র আর ডলারের বাণ্ডিল। শিস দিয়ে উঠল ও। ‘যাক, এগুলো ওদের হাতে পড়েনি। গাড়িটা ঠিকমত সার্চ করেনি বোধহয়।’

‘বাঁচা গেছে!’

‘চলো তা হলে, একটা মোটেল খুঁজে বের করি।’

‘যাচ্ছি, তবে তোমার চেহারা-সুরত ঠিক করা দরকার,’ বলল সোহানা। ‘লোকজনের চোখে পড়ে যাবে নইলে।’

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, ওর সারা শরীর ধুলোবালিতে মাখা। শার্ট নেই, খোলা বুকটা ভরে আছে নানা রকম আঁচড় আর

কাটাছেড়ায়—রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও—পিছনের সিটে এখনও কয়েকটা মিনারেল ওঅটরের বোতল পড়ে আছে। তাই বলল, ‘মুখ-হাত ধুতে অসুবিধে হবে না। তবে জামা-কাপড় দরকার। সামনে কোথাও দোকান পেলে দাঁড়িয়ো।’

পিছনের সিটে চলে গেল রানা। টরাস-টা ছুটতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে।

‘ইয়ে... সোহানা...’ একটু পরে পিছন থেকে ডাকল রানা।

‘শুনছি, বলো।’

‘তোমার এখন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার...’

‘ভুলে যাও, আমি তোমার সঙ্গেই থাকছি,’ কঠিন গলায় বলল সোহানা।

‘কিন্তু এই অবস্থায়...’

‘আমি সামলে নেব,’ বলল সোহানা। ‘দেখো, আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করো না। অর্থবের মত হাসপাতালে পড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাতে তো লাভ-ও নেই। সিদ্দিকীর নিউট্রালাইজার-টা দরকার আমার, সেটা তোমার সঙ্গে থাকলেই বরং তাড়াতাড়ি পাবো।’

‘কিন্তু সামনে আরও অনেক বিপদ মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকে। তুমি এই নার্ভ নিয়ে তার ভেতর পড়লে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে যেতে পারে।’

‘আর আমাকে ছাড়া তুমি একা বিপদ মোকাবেলা করলেই বুঝি কাজটা সহজ হয়ে যাবে?’ পাল্টা যুক্তি দিল সোহানা। ‘কথা বাড়িয়ো না। আমাকে তোমার দরকার... আর তোমাকে আমার। ক্লিয়ার?’

আর কিছু শুনতে চায় না, এই ভঙ্গিতে আলোচনা শেষ করল সোহানা। অ্যাকসেলারেটর চেপে গতি বাড়িয়ে দিল টরাসের। রানা অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

পনেরো

দু'ঘণ্টা চলে পেনসিলভেনিয়ার হ্যারিসবার্গে পৌঁছুল রানা ও সোহানা, ওখানেই একটা মোটেলে উঠল। বেইলি'জ রিজ থেকে বহু দূরে জায়গাটা, ওদের খোঁজে কেউ এতদূর পর্যন্ত আসবে বলে মনে হয় না। আরেকটা সুবিধে হলো, হ্যারিসবার্গ রাজ্যটার রাজধানী... বড় শহর। বিভিন্ন প্রকার দোকানপাটের পাশাপাশি প্রচুর ভিডিও-রেণ্টাল স্টোর আছে... বিশাল কালেকশন। ওখান থেকে ড. সিদ্দিকীর পছন্দের ছবিগুলো খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

হলোও না। মোটেলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে বেরুল ওরা। ক্লিগ্ট ইন্সটুডের ছবি তো সবখানে পাওয়া যায়; ট্রয় ডোনাহিউ একটু পুরনো আমলের নায়ক বটে, তবে মাত্র তিনটে দোকানে টুঁ মেরেই আ সামার প্রেস-এর ক্যাসেট পাওয়া গেল।

মোটেলে ফিরে ওটাই প্রথমে দেখবে বলে ঠিক করল ওরা। বক্সের পিছনটা পড়ল সোহানা, 'মেইন-এর এক রিসোর্ট শহরে দুই দুর্ভাগা প্রেমিক-প্রেমিকা! হুম, বস্তাপচা প্রেমের ছবি মনে হচ্ছে।'।

একটা ভিসিআর ভাড়া করে এনেছে রানা, ওটায় টেপটা ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'সিদ্দিকীকে রোমান্টিক মানুষ বলে মনে হয়নি আমার কাছে। এই ছবিটা দেখার পেছনে ওর নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ ছিল।'।

'ব্ল্যাক উইডোর ধারণা হয়তো ঠিক,' মন্তব্য করল সোহানা।

‘সিদ্ধিকী হয়তো মেইনে রিলোকেটেড হতে চেয়েছিল।’

‘দেখা যাক!’ বলল রানা।

শুরু হলো সিনেমাটা। টেপটা অনেক পুরনো, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ। ছবি কাঁপছে প্রায় সারাক্ষণ, রঙ-ও জায়গায় জায়গায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে ওসব পরের সমস্যা। সিনেমা-হলের ওয়াইড-স্ক্রিনের জন্য তৈরি হয়েছিল ছবিটা, টিভি-র পর্দায় দু’পাশের অনেকটা অংশ কাটা পড়ে গেছে—পরিচালক প্রকৃতির যে-অপরূপ শোভা সেলুলয়েডে তুলে এনেছিলেন, তার বলতে গেলে কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

‘মিউজিক মন্দ নয়,’ কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করল সোহানা।

‘হ্যাঁ, ওই একটা জিনিসই মন্দ না,’ বিরক্ত গলায় বলল রানা, ‘বাকি সবই থার্ড-ক্লাস।’

সোহানার ভাষ্যমতে বস্তাপচা প্রেমের কাহিনিই চলছে পর্দায়। ট্রয় ডোনাহিউ ও সাঞ্জা ডি হলো দুই অল্পবয়েসী তরুণ-তরুণী—পরস্পরকে ভালবাসে। অযথাই তাদের প্রেমে বাধা দিচ্ছে সমাজ, প্রেমিক-প্রেমিকাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। অভিনয় একেবারে যা-তা, পাত্র-পাত্রীদের মুখে কোনও অভিব্যক্তিই ফুটছে না। সেটা নিয়ে পরিচালক তেমন মাথাও ঘামায়নি বোধহয়, ফালতু এক কাহিনির অজুহাতে আমেরিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখানোর মিশনে নেমেছিল যেন। খানিক পরপরই পাইন-গাছে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এক সৈকত, এবং তাতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দৃশ্য ভাসছে পর্দায়... মনে হচ্ছে পর্যটনের কোনও বিজ্ঞাপন চলছে।

‘সুন্দর বাড়ি তো!’ হঠাৎ বলে উঠল সোহানা।

পর্দায় একটা পাথরের তৈরি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সাগরের ধারে, উঁচু একটা রিজের উপর সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আকৃতিটা অনেকটা জাহাজের গলুইয়ের মত। চমৎকার স্থাপত্য,

মনে মনে স্বীকার করল রানা। ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট নামে এক বিখ্যাত মার্কিন স্থপতির করা বেশ কিছু ডিজাইনের ছবি দেখেছে ও—অনেকটা এরকমই ছিল সেগুলো।

পীড়াদায়ক টানা দু'ঘণ্টা দশ মিনিটের মেলোড্রামা করে শেষ হলো ছবিটা। তিতিবিরক্ত ভঙ্গিতে রানা বলল, 'ধ্যাত্তেরি! এমন জঘন্য সিনেমা খুব কম দেখেছি জীবনে।'

'এটা যেন অমন না হয়!' বলে দ্বিতীয় ক্যাসেটটা তুলে নিল সোহানা। ক্লিণ্ট ঈস্টউডের প্লে মিস্টি ফর মি। পড়ল বক্সের পিছনটা: 'এক ডিস্ক জকির জীবন বিষিয়ে তোলে উন্মাদিনী ভক্ত। পরিচালক হিসেবে ক্লিণ্ট ঈস্টউডের অভিষেক চলচ্চিত্র। তাঁর জন্ম-শহর কারমেল-এ চিত্রায়িত।'

বক্সের সামনের পোস্টারটাও দেখল ও—অভিনেত্রী জেসিকা ওয়াল্টার ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'হুম, দেখে তো মন্দ হবে বলে মনে হচ্ছে না। খুনোখুনির ব্যাপার আছে... ইন্টারেস্টিং!'

'আমি দেখেছি ছবিটা,' ভিসিআরে ক্যাসেট ঢুকিয়ে বলল রানা। 'বহুদিন আগে অবশ্য। কাহিনি-টাহিনি কিছু মনে নেই। তবে ছবিটা যে ভাল লেগেছিল, তা মনে আছে।'

'যাক, ভাল খবর দিলে!'

রিওয়াইও 'বাটন চেপে রানা বলল, 'কী যেন মিলছে না। এটার পটভূমি ক্যালিফোর্নিয়া, আর সামার প্রেস ছিল মেইনে। আমেরিকার দু'প্রান্তে দুটো রাজ্য। এর মধ্যে কমন কিছু থাকে কী করে?'

'থাকবেই, তা কীভাবে শিয়ার হচ্ছে?' সোহানা জিজ্ঞেস করল।

'সন্দিকী বলেছে,' নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউসে বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথোপকথন স্মরণ করল রানা। 'আমার সঙ্গে হেঁয়ালি

করছিল—ওই কমন জিনিসটার জন্যই নাকি ছবিদুটো তার পছন্দ।’

‘কী হতে পারে?’

‘দেখি, বের করতে পারি কি না।’ টেপটা শুরুতে পৌছে গেছে, প্লে বাটন চাপল রানা।

ছবিটা শুরু হলো একটা ওভারহেড হেলিকপ্টার-শট দিয়ে। আঁকাবাঁকা একটি তটরেখা ফুটে উঠল পর্দায়, সাগরের উদ্দাম স্রোত এসে আছড়ে পড়ছে বালি-পাথরে; সৈকতের ধারের পাইন গাছের সারি মাথা নোয়াচ্ছে তীব্র বাতাসে। ত্রিশ সেকেন্ড না যেতেই রানা-সোহানার পিঠ খাড়া হয়ে গেল। দৃশ্যটা অতি-পরিচিত।

‘হায় খোদা!’ বিস্মিত গলায় বলল সোহানা। ‘এটা... এটা...’ কথা আটকে যাচ্ছে ওর।

‘হ্যাঁ, একটু আগে দেখা বিচ-টাই,’ বলল রানা, বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। ‘সামার প্লেসের কাহিনি মেইনের হলেও ওটার গুটিং আসলে হয়েছে কারমেল।’

‘ওইস্তো বাড়িটা,’ আঙুল তুলে দেখাল সোহানা।

আর কোনও সন্দেহ নেই, পর্দার এক কোণে ভেসে উঠেছে জাহাজের গলুইয়ের ডিজাইনে তৈরি বাড়িটা। তারমানে একই লোকেশনে গুটিং হয়েছে দুটো ছবির।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল ওরা দুজন। রিমোটের বোতাম চেপে ভিসিআর বন্ধ করল সোহানা, তাকাল রানার দিকে। ‘বইয়ের কথা বলছিলে তুমি। ওয়্যারহাউসে কী কী বই ছিল সিদ্ধিকীর কাছে?’

‘ফটোগ্রাফি... একটা দেখে মনে হচ্ছিল সফ্ট পর্নোগ্রাফি। জিয়োলজির বই ছিল; আর ছিল কবিতা—রবিনসন জেফারসের।’

হারিসবার্গ পাবলিক লাইব্রেরির রেফারেন্স সেকশন অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

বইয়ের তো অভাব নেই-ই, দ্রুত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বেশ কিছু কম্পিউটারও রয়েছে ওখানে। মোটেল থেকে সোজা ওখানে ছুটে গেল রানা ও সোহানা। কম্পিউটার, সেই সঙ্গে লাইব্রেরি ক্যাটালগ মিলিয়ে ঠিক করে নিল—কী কী বই দরকার ওদের।

এক কোনার একটা টেবিল দখল করল ওরা, তারপর পালা করে বিভিন্ন র‍্যাক থেকে বই আনতে শুরু করল। একটু পরেই ছোটখাট একটা স্তূপ জমে গেল টেবিলে, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনে।

‘শোনো, এখানে কী লিখেছে,’ খানিক পর ফিসফিসাল সোহানা, মোটাসোটা একটা বই ওর সামনে। ‘শহরের আসল নাম কারমেল-বাই-দ্য-সি; মানে, সাগরপারের বাগান। সংক্ষেপে শুধু কারমেল ডাকা হয়। শহরটা আসলে একটা আগারওয়াটার ক্যানিয়নের ডগায় বসে আছে—পানির তলার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন বলে ওটাকে। জায়গাটা নিয়ে অনেক জিয়োলজিস্টেরই ফ্যাসিনেশন আছে।’

‘হুম, তা হলে একটা বইয়ের রহস্য ভেদ হলো,’ বলল রানা।

‘আরও আছে,’ বলল সোহানা। ‘সৃজনশীল মানুষদের তীর্থপীঠ কারমেল। ওখানকার লেখক, আর্টিস্ট আর ফটোগ্রাফারদের খ্যাতি দুনিয়া-জোড়া।’ ফটোগ্রাফার শব্দটার উপর জোর দিল ও। ‘অ্যানসেল অ্যাডামস্ থাকতেন ওখানে; থাকতেন এডওয়ার্ড ওয়েস্টন-ও।’

‘অ্যাডামসের নাম শুনেছি,’ রানা বলল। ‘বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। কিন্তু ওয়েস্টন-টা কে?’

‘ফটোগ্রাফির একটা বইয়ে তুমি নগ্ন ছবি দেখেছ, তাই না?’

‘হ্যাঁ, কভারে। ভিতরটা উল্টে দেখিনি অবশ্য।’

‘নাম কী ছিল—প্যাশন?’

‘কী জানি, ঠিক খেয়াল নেই। কেন?’

‘এডওয়ার্ড ওয়েস্টনও নামকরা ফটোগ্রাফার। তাঁর একটা বিখ্যাত ফটোগ্রাফির বই হচ্ছে—প্যাশন। শুধুমাত্র কারমেল এবং আশপাশের ছবি ওটাতে।’

‘এখানে আছে?’

সুপ থেকে বাড়তি মলাট দেয়া একটা বই বের করে দিল সোহানা। ওটা নিয়ে মলাটটা খুলে দেখল রানা—সম্পূর্ণ নগ্ন একটি মেয়ের ছবি প্রচ্ছদে; তবে রসার ভঙ্গিটা এমন, যাতে শরীরের গোপন অংশগুলো দৃষ্টিগোচর না হয়। দু’পা একত্র করে বুকের সামনে ভাঁজ করে বসেছে মেয়েটি।

‘হ্যাঁ, এই বইটাই দেখেছি।’ রানা মাথা ঝাঁকাল।

‘ভিতরটা দেখো।’

পাতা উল্টে আর একটা নগ্ন ছবিও পেল না রানা। সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় হয়ে উঠেছে টুকরো টুকরো স্বর্গ। প্যাশন জাগাবার মত জায়গাই বটে। রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে প্রচ্ছদের ছবিটা। পাতা উল্টাতে উল্টাতে মাঝামাঝি গিয়ে থেমে গেল রানা। আবার সেই বিচ... একপাশে উদ্দাম ঢেউ, অন্যপাশে পাইনের সারি।

‘সিদ্ধিকী যে এই জায়গাটার বিষয়ে অবসেসড—এ-ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ আছে তোমার?’ সোহানা ভুরু নাচাল।

মাথা নাড়ল রানা। নেই।

তারপরও সোহানা বলল, ‘গলফ ভালবাসে সিদ্ধিকী, তাই না? প্বেল বিচ হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত গলফ কোর্সগুলোর একটা, কারমেল থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে ওটা। ওখানকার রেস্টুরেন্টগুলোও খাবার-দাবারের জন্য বিখ্যাত—ঠিক যেমন সিদ্ধিকীর পছন্দ। শুধু রবিনসন জেফারসের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না...’

‘এক মিনিট।’ হাত তুলে সোহানাকে থামাল রানা।

জেফারসের জীবনীর একটা বই নিয়ে বসেছে ও, দ্রুত পাতা উল্টাল। শেষে পেয়ে গেল যা খুঁজছে। বলল, ‘এই যে... ১৯১৪ সালে রবিনসন জেফার্স ও তাঁর স্ত্রী ইউনা কারমেল বেড়াতে আসেন। জায়গাটা তাঁদের এতই ভাল লেগে যায় যে, ওখানেই বসত গড়েন। জেফার্স ওখানে জমি কেনেন, তারপর সাগরপার থেকে সংগ্রহ করা পাথর দিয়ে একটা বাড়ি আর চল্লিশ-ফুট উঁচু টাওয়ার তৈরি করেন।- বাড়িটার নাম—টর হাউস; টাওয়ারের নাম—হক টাওয়ার। জেফার্স ও ইউনা ওখানেই মারা যান।’

নিউয়র্কের ওয়্যারহাউসে পড়া কবিতাটা মনে পড়ে গেল রানার: আই বিন্ট হার আ টাওয়ার, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং...। হক টাওয়ারের কথাই লেখা হয়েছে ওখানে।

সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে রানার মন থেকে। বইপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সোহানাকে বলল, ‘চলো, কারমেল যাবার সময় হয়েছে।’

সড়কপথে রওনা হলো ওরা। বিমানে গেলে দ্রুত পৌঁছনো যেত, কিন্তু তাতে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি অনেক বেশি। এয়ারপোর্টে হাজার রকমের চেকিঙের মুখে পড়তে হয়, সিকিউরিটি ক্যামেরায় ছবি ওঠে। ‘এ-মুহূর্তে আমেরিকান সরকারের খুব ক্ষমতাবান একটি মহলের’ শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে ওদের উপর, এয়ারপোর্টে গেলে তাদের সামনে ধরা পড়ে যাবে। তাই গাড়িতেই যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

ইন্টারস্টেট-৮০ ধরে এগোল ওরা। ওহাইও, ইন্ডিয়ানা, ইলিনয় এবং আইওয়া হয়ে নেব্রাস্কে পৌঁছল। ওখানে একবেলা বিশ্রাম নিয়ে আবার নামল পথে। পালা করে ড্রাইভ করল দুজনে—ওকলাহোমা পেরুল, তারপর পেরুল ওয়াইওমিং। অবশেষে... চারদিনের মাথায় স্যান ফ্রান্সিসকো পৌঁছল ওরা;

ওখান থেকে দক্ষিণমুখী প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে অনুসরণ করল, কারমেলে ঢুকল রাত দুটোয়।

একটা মোটেলে উঠল ওরা—রাতের মত বিশ্রাম নেবার জন্য। তবে বিশ্রাম পেল না রানা, নানা রকম চিন্তায় জেগে থাকল সারা রাত। সকালে মোটেলের ডাইনারে নাস্তা সারতে সারতে সোহানা জিজ্ঞেস করল, ‘কোথেকে তল্লাশি শুরু করতে চাও?’

‘সেটা এখনও ভাবিনি,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘আমি অন্য জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—লোকটাকে চিনব কী করে?’

‘মানে? ওকে না-চেনার কী আছে?’

‘আছে,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘ওকে ছদ্মবেশের ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়েছি আমরা সেফ-সাইটে। তা ছাড়া দু’সপ্তাহের বেশি হয়েছে, ওকে শেষবার দেখেছি। এর মধ্যে শরীরের গঠন বদলে ফেলতে পারে সে।’

‘কীভাবে?’ সোহানার চেহারা বিস্ময়।

‘প্রচুর সময় পেয়েছে ও,’ রানা ব্যাখ্যা করল। ‘এর ভিতর লাইপোসাকশন সার্জারির মাধ্যমে মেদ কমাতে পারে। ক্র্যাশ-ডায়েট ফলো করলেও দু’সপ্তাহে বিশ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। এত দ্রুত ওজন কমানো রিস্কি, শরীরের ক্ষতি হয়... তবে সেটা নিয়ে সিদ্ধিকী মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।’

‘ইয়াল্লা! ওকে তা হলে চেনা যাবে কী করে?’

‘কঠিন তো বটেই। খাটতে হবে আমাদের। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে—আমরা ওকে হয়তো চিনব না, কিন্তু ও আমাদেরকে ঠিকই চিনতে পারবে...’

‘ভুল বললে,’ বাধা দিল সোহানা। ‘তোমাকে চিনবে, আমাকে নয়। ওর মুখোমুখি হইনি আমি একবারও। অন্তরার বাড়িতে যে-টুকু দেখেছে, সেটা সন্কেবেলায়... দূর থেকে।’

‘হুম, তা অবশ্য ঠিক বলেছ,’ স্বীকার করল রানা। মুখে হাত

বোলাল, গত কয়েকদিন দাড়ি কামায়নি ইচ্ছে করে, তবে এটুকু ছদ্মবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। ‘একটু বাইরে যেতে পারবে?’ সোহানাকে বলল ও। ‘দু-একটা জিনিস দরকার আমার।’

ষোলো

পুরো কারমেলে একটাই রাস্তা সৈকতের দিকে গেছে—ওশন অ্যাভিনিউ। হাইওয়ে থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা, বেশ চওড়া। রাস্তার দু’পাশ আর মাঝখানের আইল্যাণ্ডে নানা রকম গাছ লাগিয়েছে মিউনিসিপ্যাল কমিটি—দেখতে খুবই ভাল লাগে। পিচ-ঢালা পথে চলা সত্ত্বেও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মত একটা অনুভূতি সৃষ্টি হয়। অবশ্য জঙ্গলের নির্জনতা নেই এখানে; পুরো রাস্তা জুড়ে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে নানা ধরনের দোকান—পর্যটকদের ভিড় সবখানে।

ধীর গতিতে ওশন অ্যাভিনিউ ধরে গাড়ি চালাচ্ছে সোহানা, প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসে জানালা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রানা—কপাল ভাল হলে টুরিস্টদের মাঝে সিদ্ধিকীকে পেয়ে যেতে পারে। ভারী ছদ্মবেশ নেবার মত সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি আশপাশে, তাই হালকা ছদ্মবেশ নিয়েছে ও—মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের পাশাপাশি একটা বড় সানগ্লাস পরেছে; মাথার চুল ঢেকেছে হিপ্পিদের মত একটা পরচুলা দিয়ে।

একটু পরেই রাস্তার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল টরাস। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক-মাইল দীর্ঘ অর্ধ-চন্দ্রাকার সৈকতটা, বালি ওখানে অস্বাভাবিক রকমের সাদা। এখানে-সেখানে উঁচু হয়ে

আছে প্রবাল; ফেনায়িত ঢেউকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কয়েকজন সার্ক্যার সেই ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়েছে সার্ক্যাবোর্ড নিয়ে। বিচের আশপাশের গাছপালা দুলছে মৃদু বাতাসে, কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের গর্জন আর উড়ন্ত গাংচিলের কোলাহলে। মানুষেরও অভাব নেই—পানিতে নেমে গা ভেজাচ্ছে; হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেকে।

একটা বিনকিউলার কিনে এনেছে সোহানা, সেটা চোখে লাগিয়ে লোকজনের উপর দৃষ্টি বোলাল রানা। কিন্তু সিদ্দিকীর মত কাউকে দেখতে পেল না।

বিচের ধারের রাস্তা ধরে এগোল সোহানা; রাস্তার অপরপাশে বেশ কিছু বাড়িঘর আছে—সেগুলোর দিকে নজর। একটু পরেই আঙুল তুলে দেখাল, ‘ওই যে বাড়িটা।’

তাকাল রানা। জাহাজের গলুই আকৃতির বাড়িটা একলা দাঁড়িয়ে আছে ক্রিফের উপর, কালের আবর্তনে সারা দেহ বিবর্ণ। ‘পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে,’ মন্তব্য করল ও। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিনকিউলার নিয়ে।

সময় নিয়ে পুরো বিচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। শেষে হাল ছেড়ে দিল। এখানে নেই সিদ্দিকী। সোহানাকে গাড়ি ঘোরাতে বলল ও।

নির্জন, সবুজে-ঘেরা একটা রাস্তা ধরে রবিনসন জেফারসের প্রপার্টিতে পৌঁছুল ওরা। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একটু হতাশ হলো রানা—ছিমছাম, ছোট্ট বাড়িটা দেখে। বইতে কবি জেফারসের এই বাড়ি নিয়ে যেভাবে মাতামাতি করা হয়েছে, তাতে আরও আলিশান কিছু আশা করেছিল ও। এমনিতে অবশ্য জায়গাটা বেশ মনোরম, পুরো এলাকা জুড়ে বাগান করা হয়েছে—রঙ-বেরঙের ফুল ইংল্যান্ডের গ্রাম্য এলাকার কথা মনে

করিয়ে দেয় ।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি কটেজটা—টর হাউস । টাওয়ারটা একটু বাঁয়ে; চিমনি, চওড়া সিঁড়ি, টারেট আর ব্যাটেলমেন্ট দেখা যাচ্ছে ওটাতে—ঠিক যেন মধ্যযুগের কোনও স্থাপনা ।

গাড়িটা পার্ক করে হুঁট-বিছানো ওয়াকওয়ে ধরে এগোল রানা-সোহানা । বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক উদয় হলেন, নিজের পরিচয় দিলেন ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে—সম্পত্তির দেখাশোনা করেন । ‘আপনারা কি বাড়িটা ঘুরে দেখতে চান?’ জানতে চাইলেন তিনি ।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল রানা । ‘টাওয়ারটাও ।’

‘কোনও অসুবিধে নেই । আসুন ।’

বয়স্ক ভদ্রলোককে অনুসরণ করল ওরা । সোহানা বলল, ‘ভেবেছিলাম অনেক ভিড় হবে এখানে । এখন তো দেখছি, আমরা ছাড়া আর কেউ নেই ।’

‘দুঃখজনক ব্যাপারই বটে,’ বললেন ভদ্রলোক । ‘রবিনসন জেফারসের অনুরাগীর সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে । আগে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতাম টুরিস্টদের নিয়ে, এখন কালে-ভদ্রে দু’একজন আসে... এই যেমন আপনারা ।’

‘কারণটা কী?’

‘দিনকাল পাল্টে গেছে । শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় মানুষের? আমার তো ধারণা, খুব শীঘ্রি কারমেলের শৈল্পিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে । স্রেফ একটা টুরিস্ট স্পটে পরিণত হবে শহরটা ।’

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখালেন ভদ্রলোক । রুমগুলো ছোট ছোট, বাতাস চলাচল কম । জানা গেল, গুরুত্ব ত্রিশ বছর ইচ্ছে করেই ইলেকট্রিসিটির সংযোগ নেননি জেফারস বা ইউনা, নিখাদ

প্রকৃতির কাছে থাকতে চেয়েছেন। দুটো ছেলে হয়েছিল তাঁদের, ওরা বড় হবার পর পরিবেশটাতে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে।

বাড়ি দেখা শেষে টাওয়ারে চলল রানা-সোহানা। দেখার মত একটা জিনিস বটে ওটা! মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অবয়বটা স্রেফ বাহ্যিক নয়, ভিতরেও একই নকশা বজায় রাখা হয়েছে। স্ত্রী'র অবসর কাটানোর জায়গা, আর ছেলেদের খেলাঘর ছিল টাওয়ারটা—তাই উঁচু ব্যালকনি, অ্যাটিক, গোপন সিঁড়ি থেকে শুরু করে মাটির নীচে পুরোদস্তুর একটা ডানজন-ও আছে টাওয়ারে। খুবই আকর্ষণীয়। ছাদ আর ব্যালকনি থেকে সমুদ্রের চোখ-জুড়ানো দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

‘১৯৫০-এ ক্যাসারে মারা যান ইউনা; জেফারস্ মারা যান ‘৬২-তে,’ বললেন বয়স্ক ভদ্রলোক। ‘স্ত্রী’কে খুবই ভালবাসতেন তিনি, জীবনের শেষ বছরগুলোয় শুধু স্মৃতিচারণ করেই কবিতা লিখেছেন। ওগুলোই সবচেয়ে বিখ্যাত। দু’একটা নমুনা দেখলে বুঝবেন...’ ফটোস্ট্যাট করা দু’টো ব্রোশিয়ার রানা-সোহানার হাতে তুলে দিলেন।

পাতা উল্টাতে গিয়ে থেমে গেল রানা, একটা গাড়ি থামার শব্দ পেয়েছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল পার্কিং স্পেসের দিকে। একটা ভ্যান এসে থেমেছে, চার সদস্যের একটা পরিবার এসেছে টর হাউস দেখতে। ভাল করে দেখল রানা—পুরুষ সদস্য একজনই রয়েছে দলটাতে, তবে সে সিদ্ধিকী নয়। পেশিতে ঢিল দিল ও।

ফাউণ্ডেশনের ভদ্রলোকও দেখেছেন পরিবারটাকে, চেহারায়ে খুশি-খুশি ভাব ফুটল—টুরিস্ট পেলে ভাল লাগে তাঁর। রানা-সোহানার টুর শেষ হয়েছে, তাই তড়িঘড়ি করে বললেন, ‘যদি আর কিছু জানতে চান...’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা, ‘জিজ্ঞাস্য একটা আছে আমার, তবে সেটা রবিনসন জেফারস সম্পর্কে নয়।’

‘তা হলে?’ ভদ্রলোক একটু বিস্মিত।

‘একজন লোককে খুঁজছি আমরা। মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, এখানে এসেছিল সে। লোকটা জেফারসের একজন অন্ধভক্ত... ফ্যানাটিকও বলতে পারেন।’

‘নাম?’

‘আন্দালিব সিদ্দিকী। তবে এখন ভুয়া নাম ব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশি।’

‘দুঃখিত, ও-নামে কাউকে চিনি না। দেখতে কেমন?’

‘বয়স ধরুন চল্লিশের মত। প্রায় ছ’ফুট লম্বা। এমনিতে গোঁফ-দাড়ি রাখে না, তবে এখন রাখতে পারে...’

‘কী সব যে বলছেন না!’ একটু বিরক্ত হলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। ‘এটুকু দিয়ে কি মানুষ চেনানো যায়? স্পেসিফিক কিছু থাকলে বলুন।’

‘আগে খুব মোটা ছিল ও। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে ওজন কমিয়েছে। এভাবে শুকালে যা হয়... খুতনির নীচের চামড়া ঝুলে যায়, ওটা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে কিনা... তো, অমন কাউকে দেখেছেন?’

‘মনে পড়ছে না। দেখলে কী করব, ওকে আপনার কথা বলব?’

‘না, না,’ তাড়াতাড়ি বলল রানা। ‘আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লোকটা ভুয়া নামে তিনটে বিয়ে করে সটকে পড়েছে। সেজন্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।’

‘আর এই লোক রবিনসন জেফারসের অন্ধভক্ত?’ বয়স্ক লোকটার চোখে অবিশ্বাস। ‘সেই কবির... যিনি ভালবাসার মূর্ত প্রতীক?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘অদ্ভুত, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটাকে যদি দেখেন, তা হলে নাম জানবার চেষ্টা করবেন, কিংবা লাইসেন্স প্লেটের নাম্বারটা টুকে রাখবেন। পারবেন না?’

‘পারব। কিন্তু আপনাকে জানাব কী করে?’

‘বার্ডিস্ মোটলে উঠেছি আমরা; আমার নাম মোরশেদ খান।’ রেজিস্টারে লেখা ভুয়া নামটা জানাল রানা। ‘ক্লার্ককে বললে মেসেজ দিয়ে দেবে।’

‘ঠিক আছে,’ একটা ব্রোশিয়ারের পিছনে তথ্যটা টুকে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর একটু ইতস্তত করলেন। ‘ইয়ে, আপনারা আবার বেআইনী কিছু করাচ্ছেন না তো আমাকে দিয়ে?’

‘নিশ্চিত থাকুন, আপনি কোনও বিপদে পড়বেন না। বরং সাহায্যের জন্য পুরস্কার পাবেন।’

কয়েক মুহূর্ত রানা-সোহানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, ‘আপনাদের কথা আমার বিশ্বাস হয়েছে। ঠিক আছে, লোকটাকে দেখলেই খবর দেব আমি।’

টর হাউস থেকে পাবল্ বিচে গেল ওরা—গলফ কোর্সে। টিকেট কেটে ঢুকতে হলো ভিতরে। গাড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে চোখ রাখল রানা-সোহানা—গলফারদের মধ্যে সিদ্ধিকী আছে কি না, বোঝার জন্য। তবে বিশেষ লাভ হলো না।

এলাকাটা বেশ বড়, অনেকগুলো কোর্স আছে। সবগুলোকে ঘিরে রেখেছে নানা ধরনের গাছগাছালি, রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। ফলে সোহানাকে স্পিড বাড়াতে বলল রানা, গলফ কোর্সের অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নেবে।

ক্লাবের মূল বিন্দিং, সেইসঙ্গে অফিসটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ওখানে গিয়ে হাজির হলো ওরা, আধঘণ্টা অপেক্ষা

করার পর একজন কর্মকর্তার দেখা পেল। ভদ্রলোক যা বললেন, তা শুনে হতাশ হতে হলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য—পেবল্ বিচের গলফ কোর্সে খেলতে হলে রীতিমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। তারপরও অন্তত বছরখানেকের আগে শিডিউল পাওয়া সম্ভব নয়, এতই লম্বা ওয়েইটিং লিস্ট। অবশ্য প্রভাবশালী, এবং গণ্যমান্য মানুষদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় না, তবে অমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য।

‘অসম্ভব! সিদ্ধিকীর পক্ষে কিছুতেই এক বছর আগে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া সম্ভব নয়,’ অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বলল সোহানা। ‘অতদিন আগে নিশ্চয়ই জানত না, তাকে এখানে এসে গা-ঢাকা দিতে হবে?’

রানা একমত। বলল, ‘ঠিকই বলেছ। তবে এই এলাকায় আরও গলফ কোর্স আছে। ওগুলোর কোনোটায় যেতে পারে।’

‘কমপক্ষে এক ডজন গলফ কোর্স আছে কারমেলের আশপাশে,’ সোহানা বলল। ‘গলফারের সংখ্যা অন্তত হাজারখানেক হবে। এত লোকের খোঁজ নেয়া আমাদের দুজনের পক্ষে কি সম্ভব?’

‘তোমার মাথায় অন্য কোনও আইডিয়া আছে?’

‘এরিকের কথা ভাবছিলাম। এফবিআই চাইলে খুব অল্প সময়েই সমস্ত গলফ কোর্সের মেম্বারদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারে।’

‘উঁহু,’ রানা মাথা নাড়ল। ‘এরিককে আর জড়াব না।’

‘ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, রানা,’ সোহানা অনুরোধ করল। ‘এফবিআই ছাড়া সিদ্ধিকীকে ট্র্যাক করা স্রেফ অসম্ভব।’

‘না,’ রানা অনড়। ‘যা করার আমরাই করব।’

নিঃশব্দ বেলা। কারমেল বিচের উত্তর-পূর্ব কোণে, একটা সাইপ্রেস

গাছের ছায়ায় বসে আছে রানা-সোহানা। দুজনেরই হাতে বিনকিউলার, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাচ্ছে সৈকতে আনাগোনা করতে থাকা মানুষের উপর।

‘অভিযোগ করছি না,’ হঠাৎ বলল সোহানা, ‘সমুদ্র আমার কাছে ভালই লাগে, কিন্তু এভাবে এখানে কতক্ষণ বসে থাকব আমরা, জানতে পারি? কীভাবে নিশ্চিত হব, সিদ্ধিকী এখানে আসবে?’

‘ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে,’ বলল রানা। ‘অল রোডস্ লিড টু রোম।’

‘মানে?’ সোহানা ভুরু কঁচকাল।

বিনকিউলার নামিয়ে ওর দিকে ফিরল রানা। ‘কারমেলে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই বিচ-টা। সিদ্ধিকীর ফ্যাসিনেশন-ও এটাকে ঘিরে। এখানে না এসে ও পারবে না। আমার তো ধারণা, নিয়মিতই এখানে আসে ও।’

‘তা আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু এত লোকের ভিতর সহজেই ও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।’

‘একবার-দু’বার এড়াতে পারে, বার বার পারবে না।’

‘তারমানে দিনের পর দিন এখানে বসে থাকবে তুমি?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘তোমার মাথায় কোনও বিকল্প বুদ্ধি থাকলে বলতে পারো।’

‘আছে একটা,’ বলল সোহানা। ‘সিদ্ধিকী এখানে পার্মানেন্টলি থাকতে চাইছে... তারমানে নিশ্চয়ই কোনও বাড়ি কিনেছে। গত দু’সপ্তাহে এখানে নতুন কারা বাড়ি-ঘর বা সম্পত্তি কিনেছে, সেটার খোঁজ নিতে পারি আমরা।’

‘বুদ্ধিটা মন্দ নয়,’ রানা স্বীকার করল। ‘কিন্তু টাউন হল আমাদের মত দুজন বহিরাগত মানুষকে ওই তথ্য দেবে না।’

‘আমরা যদি...’ বলতে গিয়ে থেমে গেল সোহানা।

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। ‘আবার এরিকের সাহায্য নিতে বলছ?’

‘তুমি এমন গোঁ ধরেছ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না,’
সোহানা বিরক্ত। ‘বিপদে যদি সাহায্য না নেবে, তা হলে ওর মত
বন্ধু থেকে লাভ কী?’

‘সাহায্য নিতে গিয়ে ওকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি,’
শান্ত গলায় বলল রানা। ‘কিছু মনে কোরো না, এমনিতেই
ব্যাপারটায় যারা জড়িয়েছে, তারাই মারা গেছে। মনসুর, মারুফ,
রফিক, শাহরিয়ার, অন্তরা... সবার চেহারা চোখে ভাসছে আমার,
সোহানা। নতুন করে আর কাউকে ওদের সঙ্গে যোগ করতে চাই
না আমি। দেখেছই তো, এরিক সামান্য একটু সাহায্য করতে
চেয়েছিল, তাতে ওকেও মেরে ফেলতে যাচ্ছিল টেরোরিস্টরা।
আর তোমার কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম...’

‘গত কয়েকদিনে আমার কিন্তু একটুও ভয় করেনি,’ মনে
করিয়ে দিল সোহানা।

‘কারণ বেইলি’জ রিজ থেকে পালাবার পর এখন পর্যন্ত নতুন
কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়িনি আমরা। ভিতরে ভিতরে
তোমার শরীরে কী ঘটছে, জানি না আমরা। নতুন একটা বিপদ
ওরকম হলে তুমি যে ভেঙে পড়বে না, তারও কোনও নিশ্চয়তা
নাই।’

‘আমার কথা বাদ দাও। তখন আমরা গ্যাসটার ব্যাপারে,
নিজেরা কারা পুরো ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত... সেসব কিছুই জানতাম
না। মথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না আমাদের। কিন্তু এখন বিপদটার
সত্যিকার রূপ জানি; জানি কী কী মোকাবেলা করতে হতে পারে।
আমাদেরকে, বা আমাদের বন্ধুদেরকে এখন আর সহজে ঘায়েল
করতে পারবে না কেউ।’

‘না সোহানা, আমি ঝুঁকি নেব না।’ রানা কনভিন্সড্‌ হয়নি।

‘নিউট্রাইলাজারটা না-পাওয়া পর্যন্ত এ-অ্যাসাইনমেন্টে কোনও প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়।’ বিনকিউলারটা আবার চোখে লাগাল ও।

সোহানাও চুপ হয়ে গেল, কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে বোধহয়।

পরিবেশ হালকা করবার জন্য রানা বলল, ‘চিন্তা কোরো না, সারাদিন বিচে বসে থেকে বোর হতে হবে না তোমাকে। বই পড়তে পছন্দ করে সিদ্দিকী, আমরা বড় বড় বুকস্টোরগুলোর উপরও নজর রাখব। আর সন্ধ্যার পর নজর রাখব ভাল রেস্টুরেন্টগুলোয়, সিদ্দিকী যেখানে খেতে আসতে পারে। সুখবর বলতে পারো, আগামী কয়েকদিন নিয়মিত ডিনার-ডেটে পাচ্ছ আমাকে!’

‘ও-সুখ আমার কপালে নেই,’ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সোহানা। ‘সিদ্দিকী ডায়েট করছে। ভেবেছ, রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভূরিভোজন করে বেড়াবে ও?’

‘ভোজনরসিক-রা যতই ডায়েট করুক, খাবারের লোভ ছাড়তে পারে না। আমি শিয়োর, পেট ভরে না খাক, অন্তত এখানকার মেনু-গুলো চেখে দেখার জন্যে হলেও রেস্টুরেন্টে যাবে সিদ্দিকী।’

ওদের সামনে দিয়ে একজন জগার দৌড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠ খাড়া করে ফেলল সোহানা।

‘কী ব্যাপার?’ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

‘একটা ব্যাপার চিন্তা করোনি তুমি,’ উত্তেজিত গলায় বলল সোহানা। ‘শুধু ডায়েট, কিংবা সার্জারির মাধ্যমে শরীরকে শেপে আনা সম্ভব নয়। মেদ কমায় ঝুলে পড়া চামড়াকে দ্রুত ঠিক করতে চাইলে... দ্রুত ফিটনেস ফিরে পেতে চাইলে... ব্যায়াম দরকার সিদ্দিকীর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যায়াম!’

জিমনেশিয়ামের অভাব নেই কারমেলে। টেলিফোন ডিরেক্টরি

ঘেঁটে অন্তত বিশটা নাম পাওয়া গেল। কোন্টাতে যে ভর্তি হয়েছে সিদ্ধিকী, বলা মুশকিল। তবে ভর্তি যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। একা একা ব্যায়াম করে শরীরকে ফিট করা কঠিন, বিশেষ করে সময়সীমা যেহেতু কমিয়ে আনতে চাইছে সে। জিমেনেশিয়ামের দক্ষ ইন্সট্রাকটররাই শুধু সঠিক নিয়ম বাতলাতে পারে তাকে, নানা রকম ব্যায়ামের ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করতে পারে।

সংখ্যা বেশি বলে দু'ভাগে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিল রানা-সোহানা। জিমেনেশিয়ামগুলোর তালিকা করল প্রথমে, তারপর ঠিকানা দেখে শহরকে দুটো ভাগ করল... দুজন দুদিকে খোঁজ নেবে ঠিক করল। পরদিন সকালে কাজ শুরু করল ওরা, দুপুর নাগাদ অর্ধেকের মত জিমেনেশিয়ামে ঘুরে এল রানা। তবে উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে পারল না। শেষে বেলা দুটোয় মিশন স্ট্রিটে চলে গেল ও, ওখানেই একটা রেস্টুরেন্টে দুজনে মিলিত হবে বলে ঠিক করে রেখেছে—একসঙ্গে লাঞ্চ সারবে।

আড়াইটা বাজল, সোহানার দেখা নেই। চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা, এত দেরি করবার কথা নয় ওর। ছোট্ট শহর, রাস্তাঘাটেও তেমন ভিড় মেই যে যানজটে আটকা পড়বে। আরেকটু দেখবে বলে ঠিক করল ও। পেরিয়ে গেল আরও দশ মিনিট। এবার সত্যিই টেনশনে পড়ে গেল রানা। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই কোনও।

রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সোহানার জন্য বরাদ্দ করা জিমেনেশিয়ামগুলোর ঠিকানা জানা আছে ওর, মিশন স্ট্রিটের কাছাকাছি যেটা, সেটায় চলে গেল প্রথমে।

জিমেনেশিয়ামটা দোতলায়, সিঁড়ি ভেঙে ওখানে উঠে গেল রানা। দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে। লবি, আর পিছনের বিশাল

এক্সারসাইজ হলে নজর বোলাল, কিন্তু দেখতে পেল না সোহানাকে। সিদ্দিকীর মতও কেউ নেই। রিসেপশনে অল্পবয়েসী এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে, সারা গায়ে কিলবিল করছে পেশি। ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা।

‘এক্সকিউজ মি,’ বলল ও। ‘আমার স্ত্রী-র এখানে আসবার কথা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। এসেছিল কি না, জানা দরকার। দেখেছেন নাকি... ভারতীয় চেহারা, খুব একটা লম্বা নয়, সুন্দরী...’

চোখ তুলে তাকাল যুবক। ‘আপনার নাম কি মাসুদ রানা?’

চমকে গেল রানা, অচেনা এই যুবকের মুখে ওর সত্যিকার নাম শুনতে পাবে—আশা করেনি। পেটের ভিতর প্রজাপতি উড়তে শুরু করল। কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল ও।

‘দুঃখিত, সার। আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে।’

‘দুঃসংবাদ!’ চমকে গেল রানা।

‘হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন এখানে। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না, ওঁর বন্ধুরা ছিলেন... ওঁকে নিয়ে গেছেন সঙ্গে।’

‘বন্ধু!’

‘হ্যাঁ... ওই সোনালিচুলের মহিলা, আর ওঁর স্বামী।’

কথা বলতে পারল না রানা, পাথর হয়ে গেছে।

‘আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে চেয়েছিলাম অবশ্য,’ বলে চলেছে যুবক। ‘তবে ওঁরা মানা করলেন। আপনার স্ত্রী’র নাকি ব্লাড-প্রেসারের সমস্যা আছে, মাঝে মাঝেই এমন হয়। ব্যাপারটা নাকি সিরিয়াস কিছু না।’

‘কী করল ওরা তখন?’ থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ধরাধরি করে ওঁকে দাঁড় করাল; একটা ড্রিঙ্ক খেতে দিল... আপনার স্ত্রী অবশ্য তারপরও পুরোপুরি সুস্থ হননি, ওঁর বন্ধুরা

ধরাধরি করে নিয়ে গেছেন ওঁকে।’

‘দুজন বন্ধু?’

‘হ্যাঁ। সোনালিচুলের মহিলার নিজের অবস্থাও বেশি ভাল না বোধহয়, চেহারা ফ্যাকাসে দেখলাম... মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজও ছিল... কীভাবে ব্যথা পেয়েছে, কে জানে!’

রানার সামনে দুনিয়া দুলতে শুরু করেছে। ওর জানামতে একজনই সোনালিচুলো মেয়ে আছে, যে কয়েকদিন আগে মাথায় আঘাত পেয়েছে।

‘আপনার মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন, সার? দৃষ্টিভ্রার তো কিছু নেই। ওই মহিলা আপনার জন্য একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন।’ কাউন্টারের তলা থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে দিল যুবক।

কাঁপা কাঁপা হাতে খামটা ছিঁড়ল রানা। ভিতর থেকে একটা চিরকুট বেরুল। তাতে শুধু পাঁচটা শব্দ লেখা:

টর হাউস। কাল সকাল আটটা।

সতেরো

সকালটা কুয়াশায় মোড়া, সূর্য উঠলেও ঠিকমত আলো ফোটেনি। এক ঘণ্টা আগেই জায়গামত পৌঁছুল রানা, সাতটায়। টর হাউস থেকে এক ব্লক দূরে পার্ক করল গাড়ি, হেডলাইট নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল, তারপর নেমে পড়ল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, গাড়িতে হিটারের কারণে আরামদায়ক একটা উত্তাপ ছিল, কিন্তু বাইরে

বেরুতেই গা কেঁপে উঠল। স্পোর্টস জ্যাকেটের চেইনও বন্ধ করা যাচ্ছে না, বিপদ দেখা দিলে শোলডার হোলস্টার থেকে দ্রুত পিস্তল ড্র করতে হবে।

হাঁটতে শুরু করল রানা। ঘন কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা কমে গেছে, ঠিকমত চোখে পড়ছে না দশ ফুট দূরের জিনিসও। কেমন একটা স্তব্ধতা চারপাশে, পাকা রাস্তায় পা ফেলার শব্দও বড় বেশি কানে বাজছে। রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘাসে নেমে এল ও, এবার আর ততটা আওয়াজ হচ্ছে না।

গতকাল জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে কয়েক ঘণ্টা 'পাগলের মত ছোট্টাছুটি করেছে রানা—সোহানা এবং ওর কিডন্যাপারদের খোঁজে। জিমনেশিয়ামের পিছনে পার্কিং লটে সোহানার রেখে যাওয়া গাড়িটাই শুধু পেয়েছে, আর কোনও লাভ হয়নি খোঁজাখুঁজিতে। ব্ল্যাক উইডো নিজের ট্রেইল মোছায় দক্ষ, পিছনে একটা সূত্র-ও রেখে যায়নি। চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছিল ওর, অসতর্ক থাকার কারণে নিজেকে গালমন্দ করেছে সারাক্ষণ। সন্দেহ নেই, ট্রয় ডোনাহিউ আর ক্লিণ্ট ঈস্টউডের ছবিদুটোর কানেকশন ধরে ফেলেছে ব্ল্যাক উইডো—কাজটা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব ছিল না তার জন্য। তারপর কারমেলে এসে খুঁজে বের করেছে ওদেরকে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে ডাইনিটা, প্রথম সুযোগেই ধরে নিয়ে গেছে সোহানাকে। এমন কিছু ঘটতে পারে, সেটা মাথায় রাখা উচিত ছিল রানার, আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল, কিছুতেই সোহানাকে একা পাঠানো উচিত হয়নি। সেই অসতর্কতার মাশুল যে এবার কীভাবে চুকাতে হবে—সেটা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে ও।

সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্ফল ছোট্টাছুটির পর ভাগ্যকে মেনে নেয় রানা। বুঝতে পারে, পুরো ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রণ এখন প্রতিপক্ষের হাতে;

চেপ্টা করেও কিছুই করতে পারবে না। তারচেয়ে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেখা যাক, কী চায় ব্ল্যাক উইডো। সোহানাকে উদ্ধার করবার মত কোনও সুযোগ আছে কি না, সেটা তখনই বোঝা যাবে।

টর হাউসের দিকে এগিয়ে চলল রানা। এক ঘণ্টা আগে এসে খুব একটা উপকার হয়নি। ঘন কুয়াশা মস্ত এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে ফাঁদ পাততে পারছে না, আবার শত্রুরা হামলা করে বসলে কাভার নেবার মত ভাল জায়গাও বাছাই করে রাখতে পারছে না। কিছুটা অসহায় বোধ করল ও, প্রকৃতির উপর ক্রুদ্ধ হলো ওকে এমন অবস্থায় ফেলায়।

গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও খুব শীঘ্রি। ততক্ষণে শরীরের অস্থিমজ্জাতেও কামড় বসিয়েছে ঠাণ্ডা, স্নায়ুগুলো অসাড় হবার জোগাড়। হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে আসতেই স্থির হয়ে গেল ও, কে যেন আসছে! রাস্তার পাশ থেকে সরে গেল রানা, একটা গাছের আড়ালে গিয়ে পিস্তলটা হাতে নিল।

একটু পরই কুয়াশার আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, দৃষ্টিসীমার মধ্যে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেসে এল মৃদু হাসির আওয়াজ, সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠ। ‘এক ঘণ্টা আগেই এসে পড়েছ, না?’

ব্ল্যাক উইডো। মাথায় একটা পট্টি বাঁধা, সেদিনের মতই খাকি প্যান্ট-সুট আর বুট পরেছে। বাড়তি পোশাক বলতে রয়েছে একটা ফটোগ্রাফারস্ জ্যাকেট, ওটার পকেটগুলো কনসিলড্ ওয়েপন আর বাড়তি অ্যামিউনিশন রাখবার জন্য আদর্শ।

মেয়েটার কথার জবাব দিল না রানা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

‘বেরিয়ে এসো,’ বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘লুকিয়ে লাভ নেই, তুমি যে আগে এসে ফাঁদ পাতার চেপ্টা করবে, সেটা জানতাম।

সে-কারণে কাল রাত থেকেই অপেক্ষা করছি আমরা, সব ধরনের প্রস্তুতি-সহ।’

আর লুকানোর মানে হয় না, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তায় উঠে এল। ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মন পড়তে শুরু করেছে তুমি।’ ওর কণ্ঠে বাঁকা সুর। ‘লোকে শুনলে ভাববে, আমাদের মধ্যে আত্মার সংযোগ আছে। খুব খারাপ হবে সেটা; তোমার মত একটা বিষাক্ত কীটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কোনও ধরনের গুজবও শুনতে চাই না আমি।’

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। ‘জিভের ধার কমে নি দেখছি! এনিওয়ে, আমি আত্মার সংযোগে বিশ্বাস করি না। যা করেছে, তা হলো চরিত্র বিশ্লেষণ। তোমার ফাইলটা মুখস্থ করে ফেলেছি আমি; বোঝার চেষ্টা করেছি, কোন্ পরিস্থিতিতে কী করো তুমি।’

‘খুব সম্মানিত বোধ করছি কথাটা শুনে।’

‘পিস্তলটা নামাবে? পরিস্থিতির সঙ্গে মানাচ্ছে না ওটা। আর যা-ই করো, আমাকে তুমি এখন গুলি করবে না।’

সিগ-সাওয়ারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রানা। বলল, ‘ঠিকই বলেছ। সেদিন একবার বুলেট নষ্ট করেছি, আজ আবার করার কোনও মানে হয় না। এরপর যখন গুলি করব, তখন যমের বাড়ি পাঠাবার জন্যই করব। মেয়ে বলে কোনও রকম দয়া-মায়া আশা কোরো না।’

‘কে কাকে যমের বাড়ি পাঠায়, আগেভাগেই ঘোষণা কোরো না—যখনকারটা তখন দেখা যাবে,’ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘এসো কাজের কথা শুরু করা যাক।’

‘আমার কানদুটো খোলা আছে।’

‘এখানে? সেটা বোপহয় উচিত হবে না। কে কখন এসে পড়ে... তারচেয়ে চলো বিচে যাই। পরিষ্কার বাতাস পেলে তোমার মগজটা হয়তো কাজ করতে শুরু করবে। বুঝতে পারবে,

আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করাটা কত বড় বোকামি।’

‘সেটা বোঝার জন্য বিচে যাঁবার দরকার নেই। এমনিতেই বুঝতে পারছি—ঠাট্টা-তামাশা না, তোমাকে আসলে বিশি ভাষায় গালিগালাচ দেয়া উচিত।’

বিরক্ত চোখে রানার দিকে তাকাল যুবতী। বলল, ‘এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে আসবে কি না, বলো।’

‘চলো।’

রাস্তা ছেড়ে বিচের দিকে হাঁটতে শুরু করল ব্ল্যাক উইডো, রানা পিছু নিল ওর। কিছুদূর গিয়ে মেয়েটা আলাপচারিতার ভঙ্গিতে বলল, ‘আমি কিন্তু খুব খেপে আছি তোমার ওপর।’

‘তোমাকে গুলি করেছিলাম বলে?’ রানা জানতে চাইল।

‘না, ওটা মেনে নিতে রাজি আছি আমি। তবে আমাকে ট্রয় ডোনাহিউ-র জঘন্য ছবিগুলো দেখতে বাধ্য করায় তোমার শাস্তি হওয়া দরকার।’

‘ছবিগুলো! আমি তো মাত্র একটার কথা বলেছিলাম।’

‘আরে... ওটা সত্যি বলেছ, না মিথ্যে—তা বুঝব কী করে? তাই ডোনাহিউ-র কালেকশন নিয়ে বসতে হয়েছিল আমাকে। রোম অ্যাডভেঞ্চার? প্যারিশ? পাম স্প্রিং উইকএণ্ড? ওফ, বমি করে দিয়েছিলাম প্রায়। একটার চেয়ে একটা...’

মুচকি হাসল রানা। ‘তা... সামার প্লেস-এর বিচটাই যে সবকিছুর চাবিকাঠি, সেটা বুঝলে কী করে?’

‘প্লে মিস্টি ফর মি দেখে। তবে তার জন্য ক্লিফ্ট ঈস্টউডের প্রত্যেকটা ছবি দেখতে হয়েছে আমাকে। লোকটা আমার খুব পছন্দের নায়ক ছিল, কিন্তু অনবরত বিরিয়ানি খেলে কী হয়, জানো তো? পেটের অসুখ। বিতৃষ্ণা এসে গেছে ঈস্টউডের ওপরেও। পছন্দের তালিকা থেকে এই যে লোকটাকে বাতিল তালিকায় পাঠিয়ে দিলাম, সেটা তোমার আরেকটা অপরাধ।’

‘বুঝতে পারছি, গুরুতর সব অপরাধ করে ফেলেছি,’ হাসি চেপে বলল রানা। ‘তা, আমাদেরকে খুঁজে পেলে কীভাবে?’

‘কারমেলে এসে গলফ ক্লাবগুলোর উপর নজর রাখতে শুরু করেছিলাম, সিদ্ধিকীর জন্যে। পাবল বিচের ক্লাবে যেতে দেখেছি তোমাদের। এরপর পিছনে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছি... বাকিটা তো আন্দাজ করতেই পারছ।’

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করছে। চোখ-কান আরও খোলা রাখা উচিত ছিল, তা হলে ফেউ লাগার ব্যাপারটা ধরতে পারত। যদিও এরা প্রফেশনাল, নিজেদের অদৃশ্য করে রাখতে জানে; তবে সেটা ওর মত অভিজ্ঞ এজেন্টের জন্য কোনও অজুহাত হতে পারে না। জিজ্ঞেস করল, ‘সোহানাকে কবজা করলে কীভাবে? জিমনেশিয়ামের ওরা সন্দেহ করল না কিছু?’

‘কাম অন, এসব ছোটখাট বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত হচ্ছে না তোমার,’ হাসল ব্ল্যাক উইডো। ‘তারপরও জিজ্ঞেস যখন করেই ফেলেছ, তা হলে বলি। চুপিসারে তোমার বান্ধবীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই আমরা, একটা ইঞ্জেকশন পুশ করি। আমার মাথার পট্টিটাও খুব কাজ দিয়েছে... আহত সুন্দরী মেয়েকে কেউই সন্দেহ করে না। ওকে নিয়ে সহজেই বের হয়ে আসতে পেরেছি, কেউ বাধা দেয়নি, প্রশ্ন তোলেনি।’

‘কী বললে? সুন্দরী, আবার মেয়ে? তুমি নিজেকে তা-ই মনে করো? আমরা তো তোমাকে পাজি, ত্যাঁদোড়, হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষ বলে জানি।’

‘দায়িত্ব নিলে সেটা আমি পালন করি, কে কী জানে বা কী ভাবে তার তোয়াক্কা রাখি না।’

‘ওর কোনও ক্ষতি করোনি তো?’

‘প্রশ্নই ওঠে না। সোহানা বহাল তব্বিতেই আছে... তবে

শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, সেটা তোমার উপর নির্ভর করবে।’

‘মানে?’

জবাব না দিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ব্ল্যাক উইডো। একটু পরেই ওরা পৌছে গেল টর হাউসের পাশের বিচে। সাত-সকালে জায়গাটা একেবারে নির্জন, শুধু টেউয়ের আছড়ে পড়া ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। একটা বিচ চেয়ারে গিয়ে বসল মেয়েটা, পাশের আরেকটা দখল করল রানা। চুপ করে রইল, সময় দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে মুখ খোলার।

‘সিদ্ধিকীকে আমার দরকার, রানা,’ খানিক পর বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘জ্যাস্ত, না মৃত—তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু ওকে যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছি, বসদের চোখে আমি একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নই। ওঁরা বোঝা পছন্দ করেন না।’

‘কাদের কথা বলছ... সিদ্ধিকীর কন্ট্রোলারদের কথা?’

মাথা ঝাঁকাল ব্ল্যাক উইডো। ‘আমিও ওদের একজন ছিলাম। পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমার ওপর। সিদ্ধিকী যতক্ষণ বেঁচে আছে, কাজটা ততক্ষণ অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। ওঁরা দিন দিন অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, আমার জন্যে লক্ষণটা মোটেই শুভ নয়। আমার ক্যারিয়ার খতম হওয়ার জোগাড় হয়েছে।’

‘সহানুভূতি জানাচ্ছি,’ আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা। ‘যদিও আমার সেটা জানানো উচিত নয়। তোমার মত একটা নিষ্ঠুর মানুষের সহকর্মীদের হাতে খুম হয়ে যাওয়াই তো ভাল মনে করি।’

গরম চোখে ওর দিকে তাকাল ব্ল্যাক উইডো। রাগী গলায় বলল, ‘যথেষ্ট হয়েছে! মিছরির ছুরি চালাবার জন্য তোমাকে ডেকে আনি নি এখানে। আরও বড় একটা কাজ রয়েছে তোমার জন্যে।’

‘সম্ভবত আন্দাজ করতে পারছি, সেটা কী হতে পারে।’

‘ইয়েস, মাসুদ রানা! আমি চাই, তুমি ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করবে! এবং তা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে!’

‘আমি কেন? কারমেল পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, এখন তো কাজটা তুমি নিজেই করতে পারো।’

‘না, রানা। সিদ্দিকীর সঙ্গে পাল্লা দেয়া শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। তুমি ওকে শিখিয়েছ কীভাবে অদৃশ্য হতে হবে, তাই তুমিই শুধু পারবে ওকে আবার দৃশ্যমান করতে।’

‘বুঝলাম। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টায় ওকে খুঁজে বের করা তো অসম্ভব একটা কাজ!’

‘যদি সোহানাকে জ্যান্ত পেতে চাও, অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে তোমার, রানা! আমার হাতে সময় নেই!’ কঠিন গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো।

চুপ হয়ে গেল রানা। কী বলবে—সময়সীমা বাড়াবার জন্য চাপাচাপি করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে না। ব্ল্যাক উইডো নিজেও সম্ভবত একটা ডেডলাইন পেয়েছে, সেজন্যেই এভাবে খেপে উঠেছে।

ওকে নীরব হয়ে যেতে দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। ‘কাল সকালে... ঠিক এই সময়ের মধ্যে আবার তোমাকে দেখতে চাই আমি। সিদ্দিকীর লাশ-সহ।’

‘ভুল করছ তুমি,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘আমি ভাড়াটে খুনি নই যে, খুন করে লাশ এনে দেখাব তোমাকে। সিদ্দিকীকে জ্যান্ত এনে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি, খুনোখুনির কাজটা তুমি নিজেই কোরো।’

‘আমার আপত্তি নেই।’ বলে একটা চিরকুট রানার হাতে তুলে দিল ব্ল্যাক উইডো। ‘এতে আমার ফোন নাম্বার আছে, সিদ্দিকীকে হাতে পাবার পর জানিয়ো। আমি বলে দেব, কোথায়-কীভাবে ওকে ডেলিভারি দিতে হবে।’

‘আর সোহানা?’

‘ওকেও একই সঙ্গে তুলে নিতে পারবে তুমি,’ বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘তবে সময় কিন্তু ওই চব্বিশ ঘণ্টাই, সেটা মনে রেখো। যদি ব্যর্থ হও, সোহানার চিহ্নও খুঁজে পাবে না আর।’

আর কিছু বলার বা শোনার প্রয়োজন মনে করল না সে। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পিছন থেকে ডাকল রানা, ‘শোনো!’

থামল ব্ল্যাক উইডো।

‘কাজটা তুমি ঠিক করলে না,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। ‘আমাকে যারা এভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে, আজ পর্যন্ত তাদের জন্য ফলাফলটা ভাল হয়নি।’

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। ‘চব্বিশ ঘণ্টা, রানা। গুডবাই!’

চলে গেল যুবতী। তার পিছনে অনেকগুলো ছায়াকে নড়তে দেখল রানা, দলের বাকিরাও ফিরে যাচ্ছে। ভূতের মত এতক্ষণ কুয়াশায় মিশে ছিল ওরা, উপস্থিতির সামান্যতম চিহ্নও দেখা যায়নি।

ওরা চলে যাবার পরও শূন্য সৈকতে অনেকক্ষণ বসে রইল রানা। মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করল ও। ছাড়বে না ওদের!

‘স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন,’ ওপাশ থেকে অতি-পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল।

‘তুমি কি এখনও চাইনিজ খাবার অপছন্দ করো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। একটা গ্যাস স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ও, কথা বলছে পে-ফোনে।

‘অবশ্যই! আমার দু’চোখের বিষ,’ বলল এরিক। একটা মুহূর্তের বিরতি নিল। ‘রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র রেখে গেছেন

আপনি আমাদের জন্য ।’

‘আত্মরক্ষা ।’

‘কথাটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতো, যদি আপনি ব্যাপারটা সশরীরে ব্যাখ্যার জন্য বেইলি’জ রিজে অপেক্ষা করতেন। ঝামেলা এড়ানো যেত। জানেন, এখন কতজন এফবিআই এজেন্ট আপনার খোঁজে বের হয়েছে? জানেন, কতগুলো আইন ভেঙেছেন এ-পর্যন্ত?’

‘আমাকেই খুঁজছে?’

‘নামটা আমি বলিনি। আগরগ্ৰাউণ্ড ওই ল্যাব থেকে উদ্ধার হওয়া লোকেরা বলেছে। আপনি নাকি ওদেরকে শক ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন?’

‘ওটা ওদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ব্যাটারা এখন কোথায়?’

‘বহাল তবয়িতে বাড়ি ফিরে গেছে। পেণ্টাগন থেকে নির্দেশ এসেছে, ওদের আটকে রাখা যাবে না। আমাদের কিছু করার ছিল না।’

‘তারমানে ব্যাপারটা ওখানেই খতম?’

‘মোটামুটি ওরকমই বলতে পারেন। আমরা অবশ্য জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে সব জানিয়েছি; কিন্তু ওরা প্রমাণ ছাড়া কিছু করতে নারাজ। সমস্যাটা বুঝতেই পারছেন... ল্যাবটা খালি, সিদ্ধিকী গায়েব... ওখানে যে অবৈধ বায়ো-কেমিক্যাল ওয়েপনের গবেষণা চলছিল, সেটা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা নেই। গ্যাসটা যে সিভিলিয়ান এবং মিলিটারি পার্সোনেলের উপর অবৈধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করা তো আরও অসম্ভব।’

‘তারমানে এই নয় যে, এর সঙ্গে যারা জড়িত, তারা পার পেয়ে যাবে। আমি তা হতে দেব না।’

‘আবার যুদ্ধ বাধাবার প্ল্যান করছেন নাকি? সেই র‍্যামডাইনের ঘটনাটার মত? সেজন্যেই ফোন করেছেন আমাকে?’

‘উঁহু, তোমাকে এসবের মধ্যে আর জড়াতে চাই না। ফোন করেছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ছোট্ট একটা সাহায্যের জন্য। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি...’

‘সমস্যায় তো আপনি শুরু থেকেই আছেন। এখন আবার নতুন কী ঘটল?’

‘সোহানাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। কাল সকালের মধ্যে যদি সিদ্ধিকীকে খুঁজে বের করে ওদের হাতে তুলে না দিই, তা হলে ওকে খুন করা হবে।’

‘মাই গড!’ শুধু দুটো শব্দই বেরল এরিকের গলা থেকে।

‘এরিক, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?’ বলল রানা। ‘এত অল্প সময়ে আমার একার পক্ষে কিছুতেই ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।’

‘নিশ্চয়ই করব,’ হড়বড় করে বলল এরিক। ‘এক্ষুণি চলো আসছি। কোথায় আপনি?’

‘কারমেল, ক্যালিফোর্নিয়া। তবে তোমাকে এখানে প্রয়োজন নেই আমার। সাহায্যটা, আমি চাই, তুমি তোমার অফিসে বসেই করবে।’

‘কার বিরুদ্ধে লেগেছেন, আপনি বুঝতে পারছেন না, মি. রানা। এরা র‍্যামডাইনের চেয়েও বহুগুণ ভয়ঙ্কর। ভেবেছেন, সিদ্ধিকীকে ওদের হাতে তুলে দিলেই আপনাকে, বা মিস সোহানাকে ছেড়ে দেবে? ইম্পসিবল, আপনাদের দুজনকেই খুন করবে ওরা। যদি বাঁচতে চান, আমাকে আপনার দরকার হবে।’

‘না!’ লড়াইটা আমার, শেষটাও আমাকেই দেখতে হবে। তুমি শুধু আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করো।’

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। বুঝতে পারছে, রানাকে টানানো যাবে না। তাই বলল, ‘ঠিক আছে, বলুন কী জানতে চান।’

‘কারমেল থেকে মণ্টেরি পর্যন্ত যত গলফ কোর্স আছে, সবগুলোতে খোঁজ নিতে হবে তোমাকে—গত তিন সপ্তাহে যত নতুন গলফার ক্লাবগুলোতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে, কিংবা মেম্বার হয়েছে, তাদের তালিকা চাই আমি।’

‘অমন লোক হাজারখানেক হতে পারে!’

‘আরও আছে। কারমেল এলাকার সমস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—গত তিন সপ্তাহে তারা যত ধরনের নতুন কেনা-বেচা বা লিজের কন্ট্রাক্ট করেছে, সব জোগাড় করতে হবে। লিস্ট-দুটো হাতে পেয়ে মেলাতে শুরু করো। দুটোতেই ক’টা কমন নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়, তা-ই জানতে চাই আমি, ব্যস।’

খসখস করে কাগজে কাজদুটো লিখে নিল এরিক। বলল, ‘ঝামেলার কাজ... সময় লাগবে।’

‘চব্বিশ ঘণ্টাও আমার হাতে নেই, এরিক। খোদার দোহাই, যত তাড়াতাড়ি পারো, লিস্টদুটো জোগাড় করো। আমি বিকেলে আবার ফোন করব তোমাকে।’

আর তর্ক করল না এরিক। বলল, ‘বুঝেছি, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি। কিন্তু বিকেল হতে তো দেরি আছে, এই সময়টা কী করবেন আপনি।’

‘আমি জিমনেশিয়ামে যাব।’ বলে ফোন রেখে দিল রানা, এরিককে হতভম্ব করে দিয়ে।

আঠারো

সাংবাদিক সেজে কাজ শুরু করল রানা। গতকাল যেগুলোয় যায়নি সেই জিম্নেশিয়ামগুলোতে টু মারতে শুরু করল এক এক করে। সবাইকে একই গল্প বলছে—দ্রুত শরীরের ওজন কমানোর সুফল ও কুফল নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করছে। কতটা দ্রুত শুকানো একজন মানুষের জন্য নিরাপদ, সেটা জানাতে চায় জনসাধারণকে। শুধু তত্ত্বকথা নয়, প্রতিবেদনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য জিম্নেশিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে বাস্তব কেসের রেফারেন্সও চেয়ে বেড়াচ্ছে।

গত কয়েকদিনে এই প্রথমবারের মত ভাগ্যদেবী কিছুটা সদয় হয়ে উঠলেন ওর প্রতি। চতুর্থ জিম্নেশিয়ামটাতে যেতেই ওখানকার ম্যানেজার বলল, ‘আপনার প্রতিবেদনের জন্য একেবারে আদর্শ একটা কেস আছে আমার হাতে—ভদ্রলোককে আপনি এক কথায় বিকারগ্রস্ত বলতে পারেন, ওজন কমাবার জন্য কাউকে এমন পাগল হয়ে যেতে দেখিনি আমি।’

‘কী রকম?’ সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

‘আর বলবেন না, ভীষণ মোটা ছিল লোকটা... যখন প্রথম এখানে এল আর কী। ক্লাবে ভর্তি হবার দু’দিনের মধ্যে লাইপোসাকশন সার্জারি করাল। ওটার ধকল কাটতে না কাটতে পুরোদমে ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। দু’সপ্তাহের কিছু বেশি হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ত্রিশ কেজির বেশি ওজন কমিয়ে ফেলেছে লোকটা।’

‘বলেন কী! কাজটা রিস্কি না?’

‘শুধু রিস্কি নয়, মারাত্মক।’ বলল ম্যানেজার। ‘কী হারে যে শরীরকে শোপে নিয়ে আসছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। শুরু দিকের চেহারা-সুরতের সঙ্গে এখনকারটার বিন্দুমাত্র মিল নেই। ইদানীং তো তাকে দেখে মনে হচ্ছে, স্টেরয়েডও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। নইলে মেদ সরে গিয়ে এত দ্রুত পেশি গজাতে পারে না।’

‘ভদ্রলোককে বলেছেন এ-কথা?’

‘বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছি। এক কথায় জানিয়ে দিয়েছে, তার ভাল-মন্দ নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ব্যাটা একটা পাগল, বুঝলেন? নইলে এমন করত না... এই রে, আপনি তো সাংবাদিক, কথাটা বর্লে দিয়ে ভাল করলাম না বোধহয়...’

‘নিশ্চিত থাকুন,’ রানা আশ্বাস দিল, ‘আপনার বা এই জিমের রিপোর্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কোনও রিপোর্ট লিখব না আমি।’

‘বাঁচালেন!’

‘লোকটার নাম জানতে পারি? দেখতে কেমন?’

‘রবার্ট ফস্টার। নামটা শুনতে আমেরিকান মনে হলেও চেহায়ায় এশিয়ান ছাপ আছে। গায়ের রং অবশ্য ফর্সা, ছ’ফুটের মত লম্বা। বয়স ধরুন... চল্লিশ-টল্লিশ হবে। এখনও পুরোপুরি স্লিম হয়নি অবশ্য, তবে পুরনো বন্ধু-বান্ধব কেউ হঠাৎ দেখলে যে তাকে চিনতে পারবে না, সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।’

‘ভূম, খুবই ইন্টারেস্টিং,’ মন্তব্য করল রানা। ‘ওঁকে কখন পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল ম্যানেজার। ‘ব্যায়াম-ট্যায়াম আজকাল বাড়িতেই করে, ওখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নিয়েছে শুনলাম। এখানে আসে শুধু ডায়েট আর এক্সারসাইজ টেকনিক রিভিউ করতে...

খুবই অনিয়মিত ।’

‘বাড়িটা কোথায়?’

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করল ম্যানেজার। পাতা উল্টে ফস্টারের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বের করল, তারপর বলল, ‘৭৮, ভিস্তা লিগা। মন্টেরির ওদিকে... নতুন আবাসিক এলাকা, বড়লোকদের জায়গা। তবে ওখানে গিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ফস্টার খুবই মুখচোরা টাইপের মানুষ, কারও সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে না। সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকার দেবে... সেটা তো আরও অবিশ্বাস্য।’

‘চেষ্টা করে দেখি। আর কিছু জানাতে পারেন?’

‘একটা সাদা রঙের পোর্শ গাড়ি চালায় লোকটা। লাইসেন্স নাম্বার: সিএমএল-এক্স-২৯২০।’

‘আপনি দেখি মুখস্থ করে বসে আছেন!’ রানা অবাক হলো।

‘মুদ্রাদোষ বলতে পারেন,’ হাসল ম্যানেজার। ‘ছোটবেলা থেকেই নতুন কোনও গাড়ি দেখলে লাইসেন্স নাম্বার মুখস্থ করে ফেলি।’

‘ভাল, খুব ভাল,’ উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল রানা। ‘অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।’

আধঘণ্টা পর। •

পঞ্চাশ। একম্ন। বাহান্ন...

ভিস্তা লিগার রাস্তা ধরে ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাচ্ছে দু’পাশের বাড়িঘরের নামফলকের দিকে, নম্বর দেখছে। জিমনেশিয়ামের ম্যানেজার ভুল বলেনি, আসলেই ধনীদের আবাসিক এলাকা এটা। ছবির মত সুন্দর প্রত্যেকটি বাড়ি, একেকটার দাম অন্তত দশ-পনেরো লাখ ডলারের কম হবে না; বেশিও হতে পারে। কাছেই পুরনো একটা পরিত্যক্ত গলফ

কোর্স আছে, নাম: ব্ল্যাক হর্স। ওটাকেও আবাসিক এলাকায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে—বানানো হচ্ছে নানা ধরনের বাড়ি আর রাস্তাঘাট, দূর থেকে দেখতে পেল রানা।

বাষাট্টি। তেষাট্টি। চৌষাট্টি...

কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছে রানা, কারমেল ছেড়ে সিদ্দিকী মন্টেরি পেনিনসুলায় বাড়ি নিতে গেল কেন? যদি বাড়তি সতর্কতার কারণে পছন্দের শহর থেকে দূরে আবাস গড়েও থাকে, তা হলে ওখানে আবার দামি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? ওখানকার জিমনেশিয়ামেই বা ভর্তি হয়েছে কেন?

সত্তর। একাত্তর। বাহাত্তর...

স্নায়ু টান টান হয়ে গেল রানার। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সিদ্দিকী বাড়িতে আছে কি নেই, বলা যাচ্ছে না। তাই সাবধানে থাকতে হবে। শয়তানটা ওকে চিনে ফেললে সর্বনাশ। কী করবে, মনে মনে ঠিক করে ফেলল রানা। বাড়ির সামনে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলে যাবে দূরে, লেআউট দেখে নেবে; ফিরে আসবে পায়ে হেঁটে। তারপর সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকবে বাড়ির ভিতর। সিদ্দিকীকে এখুনি পেলে তো ভাল, নইলে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না সে ফেরে।

চুয়াত্তর। পঁচাত্তর...

আটাত্তর নম্বর বাড়িটা ঠিক সামনে। হিসপ্যানিক নকশায় গড়া একটা দোতলা বাড়ি, ছাতটা লাল টালি বসানো। লনটা বেশ বড়, নিচু পিকেট-ফেন্স দিয়ে ঘেরা। ওদিকে তাকিয়েই থমকে গেল রানা। একটা সাইনবোর্ড বসানো হয়েছে লনের মাঝখানে, তাতে বড় করে লেখা:

বাড়ি বিক্রি হইবে।

যোগাযোগ করুন...

ফোন-নম্বর-সহ বিক্রেতার নাম দেয়া আছে, তবে সেটা রবার্ট

ফস্টার, মানে সিদ্দিকীর ছদ্মনাম নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ: মহিলা!

কিছু একটা গোলমাল আছে, বুঝতে পারছে রানা। ব্রেক কমে গাড়ি থামাল ও, নেমে পড়ল। আটান্তর নম্বরের মুখোমুখি আরেকটা বাড়ি আছে, ওটার দরজায় গিয়ে বেল বাজাল। মায়াময় চেহারার এক বৃদ্ধা উদয় হলেন জবাব দিতে। ‘ইয়েস?’

‘মাফ করবেন,’ বলল রানা। ‘আমি এখানে বাড়ি কেনার কথা ভাবছি। জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম, ওই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল।’ আঙুল তুলে দেখাল ও। ‘বাড়িটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?’

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। ‘এলিজাবেথকে বলেছিলাম, বিক্রি করতে চাও, করো। তবে এভাবে সাইনবোর্ড বসিয়ে না, দেখতে ভাল দেখায় না। মুখে মুখে কথা ছড়ালেই তো চলে...’

‘এক্সকিউজ মি,’ বাধা দিল রানা। ‘কীসের কথা বলছেন?’

‘বাড়িটার মালিক ছিল আমার বন্ধু—হেনরি স্যামসন,’ জানালেন বৃদ্ধা। ‘তিনদিন আগে মারা গেছে ও। এলিজাবেথ... মানে, ওর মেয়ে। আরে, অন্তত একটা হপ্তা ওয়েট কর, না; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বিক্রি করতে উঠেপড়ে লেগেছে। দেখছ না, সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে? আরে, মরা বাপটাকে অন্তত একটু সম্মান তো দেখা!’

‘হেনরি স্যামসন?’ ভুরু কঁচকাল রানা। ‘কতদিন থেকে থাকতেন তিনি এখানে?’

‘এই এলাকার বয়স তো বেশি নয়, ধরো আড়াই বছর... শুরু থেকেই ছিল হেনরি। ও আর আমি এখানকার একেবারে প্রথম দিককার বাসিন্দা।’

‘আর কেউ কি থাকত ওঁর সঙ্গে?’

‘একা মানুষ ছিল হেনরি। বউ মারা গেছে অনেক বছর আগে, বিয়ের পর এলিজাবেথ চলে গেছে প্যাসাডেনায়। শুধু এক হাউসকিপার ছাড়া আর কেউ থাকত না ওর সঙ্গে।’

‘ধন্যবাদ, ম্যা’ম,’ রানা বলল। ‘আর কিছু জানার নেই আমার।’

‘কিনবে বাড়িটা? তোমার মত ইয়াং ম্যানকে প্রতিবেশী হিসেবে পেলে মন্দ হয় না।’

হাসল রানা। ‘আপনাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ভেবে দেখি।’

ভিস্তা লিগা থেকে ফিরতে ফিরতে ড. সিদ্দিকীর কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে রানা—এই লোক যে কতটা ধুরন্ধর, তা টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। এক অর্থে প্যারানয়েড-ও বলা চলে তাকে। মিথ্যে পরিচয়ের ভিতর আরেকটা মিথ্যে পরিচয় তৈরি করেছে সে। রানা নিশ্চিত, রবার্ট ফস্টারের পরিচয়টা অন্তরার দেয়া নয়; এটা সিদ্দিকী নিজেই বানিয়ে নিয়েছে, অন্তরার দেয়া নিখুঁত পরিচয়টাকে আড়াল করবার জন্য। এটা তার জন্য স্রেফ একটা ফেইল-সেফ ব্যবস্থা। যেখানে একটা নকল পরিচয়ের পর্দাই সরানো কঠিন, সেখানে দুটো পরিচয়ের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে সে—যাতে একটা ফাঁস হয়ে গেলেও দ্বিতীয়টা অক্ষত থাকে। মনে মনে কৌশলটার তারিফ না করে পারল না রানা—অন্যদের চাইতে নিজেকে চালাক ভাবা-টা স্রেফ সিদ্দিকীর অহঙ্কার নয়, প্রতিটি কাজে-কর্মেও তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অন্তরার দেয়া পরিচয়টা সে সযত্নে রেখে দিয়েছে, দ্বিতীয়টা... মানে রবার্ট ফস্টারের-টা ব্যবহার করছে প্রথমটায় আবির্ভূত হবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করবার জন্য—জিনিয়াস প্ল্যানই বটে!

কিন্তু লোকটা এই দ্বিতীয় পরিচয়টা ম্যানেজ করল কীভাবে?

বাড়ির ঠিকানা নাহয় ভুয়া হলেও অসুবিধে নেই, কিন্তু জিমে ভর্তি হবার জন্য অথেনটিক সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আইডি দেখাতে হয়েছে নিশ্চয়ই; সেটাই এদেশের নিয়ম। ওগুলো দেখাল কীভাবে?

একটু ভাবতেই জঁবাবটা পেয়ে গেল রানা। অথেনটিক পরিচয় কীভাবে জোগাড় করতে হবে, সেটা জানা আছে সিদ্ধিকীর; জেনেছে ওর কাছ থেকেই। সেফ-সাইটের প্রথম ব্রিফিঙে মৃত বাচ্চার সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার চুরি করার ব্যাপারে জানানো হয়েছিল সিদ্ধিকীকে, সেটাই কাজে লাগিয়েছে সে। অন্যান্য সব স্টেটের মত ক্যালিফোর্নিয়াতেও বার্থ-রেকর্ড ও ডেথ-সার্টিফিকেট হচ্ছে পাবলিক ডকুমেন্ট—চাইলেই যে-কেউ দেখতে পারে। হল্ অভ রেকর্ডস্-এ গিয়ে নিজের জন্ম-তারিখের কাছাকাছি কোনও মৃত শিশুর সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার জোগাড় করেছে সে, সেটার মাধ্যমে আইডি নিয়েছে, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

অসহায় বোধ করল রানা, এমন একজন মিসগাইডেড জিনিয়াসের সঙ্গে কীভাবে পাল্লা দেবে, বুঝতে পারছে না। উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই শেখানো পথে, ওকেই ধোঁকা দিয়ে... যা শেখানো হয়েছে, তার চাইতেও নিখুঁতভাবে! তাকে কি আদৌ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে? তা-ও আবার কাল সকালের মধ্যে?

আনমনে মাথা নাড়ল ও।

বিকেল বেলা একটা পে-ফোন থেকে আবার এরিকের নাম্বারে ডায়াল করল রানা।

‘এজেন্ট স্টার্ন।’ এরিকের গলা শোনা গেল।

‘চাইনিজ খাবার...’

‘খুবই অপছন্দ আমার,’ বাধা দিয়ে বলল এরিক।

‘লিস্টগুলো হাতে পেয়েছ?’ সরাসরি কাজের কথা পাড়ল

রানা ।

‘হেডকোয়ার্টারের এক ডজন এজেন্টকে কাজে লাগিয়েছি আমি,’ এরিক বলল। ‘ফোনে খোঁজখবর নিচ্ছে ওরা। কারমেল-মণ্টেরি এলাকায় একজন রেসিডেন্ট এজেন্ট আছে, তাকে মাঠে নামিয়েছি। ওকে সাহায্য করতে স্যান ফ্রান্সিসকো আর স্যান হোসে থেকেও এজেন্ট গেছে। তবে এখনও অনেক রিয়াল এস্টেট এজেন্ট আর গলফ কোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। বুঝতেই পারছেন, সময় খুব একটা পাইনি আমরা।’

‘আমি জানি, তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করছ,’ বলল রানা। ‘তবু... আরেকটু তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করো।’

‘আমি এখনি তাড়া দিচ্ছি সবাইকে।’

‘খুব ভাল। বাই দ্য ওয়ে, তোমার সামনে কোনও কম্পিউটার আছে?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘একটা লাইসেন্স নাম্বার দিচ্ছি। গাড়িটার মালিকের নাম জানা দরকার।’

‘বলুন।’

‘ক্যালিফোর্নিয়ার নাম্বার। সিএমএল-এক্স-২৯২০। গাড়িটা পোর্শ, রঙ সাদা।’

‘জাস্ট আ মিনিট। আমি এখনি ক্যালিফোর্নিয়া ডিএমভি-র ডেটাবেজে খুঁজে দেখছি।’

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। তারপর এরিক বলল, ‘পেয়েছি। গাড়িটা একটা অটো কোম্পানির। তবে এখন এক মাসের লিজে আছে। লিজ নিয়েছে রবার্ট ফস্টার নামে এক লোক। ঠিকানা: ৭৮, ভিস্তা লিগা, মণ্টেরি। ওখানে খোঁজ নিতে কাউকে পাঠাব?’

‘দরকার নেই। ফস্টার ওখানে থাকে না। আমি অলরেডি ঘুরে এসেছি ওখান থেকে।’

‘ঘুরে এসেছেন!’ এরিক অবাক হলো। ‘তা হলে আবার ডেটাবেজ দেখতে বললেন কেন?’

‘ভেবেছিলাম অন্য কোনও ঠিকানা পাব।’

‘হুম! এক কাজ করুন। ঘণ্টাদুয়েক পর আবার ফোন করুন। দেখি, এর মধ্যে লিস্টগুলো কালেক্ট করতে পারি কি না।’

‘আমার হাতে এত সময় নেই, এরিক। যা করার এখনি করতে হবে। যতটুকু লিস্ট পেয়েছ, ওটাই নিয়ে এসো। দেখো, কমন নাম আছে কি না ওগুলোর ভিতরে।’

‘ঠিক আছে, দেখছি। তবে তারপরও একটু সময় দিতে হবে কিন্তু। এখনও নাম মেলানো শুরু করিনি কি না।’

‘কতক্ষণ লাগবে?’

‘বেশি না, মেলানোর কাজটা কম্পিউটারে করব তো, শুধু লিস্টগুলো আগে কম্পাইল করে নিতে হবে। এই ধরুন... বিশ-পঁচিশ মিনিট।’

‘ঠিক আছে, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আবার কল করছি।’

ফোন রেখে দিল রানা।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট অস্থিরতার মধ্যে কাটল রানার। বার বার ঘড়ি দেখল, কিন্তু সময় যেন ফুরোতেই চায় না। গ্যাস স্টেশনের পাশে একটা ডাইনার আছে, ওখানে গিয়ে কফি খেল ও, বাথরুমে গেল, জুকবক্সে পয়সা ফেলে পুরনো দিনের দুটো গান শুনল। এতকিছুর পরও দেখা গেল, মাত্র বিশ মিনিট পেরিয়েছে। শেষে ডাইনারের ভেঙিং মেশিন থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল ও। বেশ কিছুদিন হলো ধূমপান ছেড়েছে, কিন্তু টেনশনে সেটা আর মনে রইল না। পর পর দুটো সিগারেট টেনে ঘড়ি দেখল—হ্যাঁ, হয়েছে আধঘণ্টা।

পে-ফোন থেকে আবার ডায়াল করল রানা। এবার আর কোড-ওয়ার্ডের ঝামেলায় গেল না, সরাসরি এরিককে জিঙ্ক্‌স করল, ‘কী খবর?’

‘খবর বেশি ভাল না,’ বিমর্ষ গলায় বলল এরিক। ‘আংশিক লিস্ট মিলিয়ে দেখেছি আমরা, তাতেই ছাপ্পান্নটা নাম পাওয়া গেছে। পুরোটা মেলালে সংখ্যাটা যে কী পরিমাণ বাড়বে, সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।’

‘ছাপ্পান্ন?’ রানা ভুরু কঁচকাল।

‘হ্যাঁ। এক জায়গাতেও নেই লোকগুলো। প্যাসিফিক গ্রোভ, মন্টেরি, সি-সাইড, কারমেল, কারমেল ভ্যালি, কারমেল হাইল্যান্ডস... সবখানে ছড়িয়ে আছে। এতসব জায়গায় গিয়ে ফিজিক্যালি ওদের ভেরিফিকেশন করতে অনেক সময় আর লোকবল দরকার।’

‘হুম! কারমেলে ক’জন আছে?’

‘মাত্র একজন। অবশ্য ভ্যালি আর হাইল্যান্ডসে আরও চারজনের খোঁজ পাওয়া গেছে।’

মোট লোকের তুলনায় সংখ্যাটা নগণ্য। একটু বিস্মিত হয়ে রানা জিঙ্ক্‌স করল, ‘এসব জায়গায় নতুন লোকের সংখ্যা এত কম হয় কী করে?’

‘কারমেলে রিয়াল এস্টেটের দাম খুব চড়া। সবার পক্ষে এত দাম দিয়ে জমি বা বাড়ি কেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওখানকার লোকজন সহজে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রিও করে না। স্বাভাবিক, এমন চমৎকার জায়গা কে ছাড়তে চায়, বলুন?’

‘হুঁ,’ একটু ভাবল রানা। টাকার অভাব নেই ড. সিদ্ধিকীর, কাজেই কারমেলে বাড়ি বা জমি কিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় তার। সারাজীবনের স্বপ্ন ওটা, কিছুতেই বিসর্জন দেবে বলে মনে হয় না। তাই বলল, ‘ওই পাঁচটা নাম বলো তো।’

‘অ্যাবনার ডিন, জেমস পিভেন, লুথার স্টিগওয়েল, হোরেশিও কেইন, আর লায়াল...’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও!’ উত্তেজিত গলায় বলল রানা। ‘শেষ নামটা কী বললে?’

‘লায়াল ম্যাসন?’

‘না, না, তার আগেরটা।’

‘হোরেশিও কেইন।’

‘হ্যাঁ, ওটাই!’ ভাবনায় ডুবে গেল রানা। ব্যাপারটা কি নিছক কাকতাল, নাকি...

‘কী হলো, মি. রানা? চুপ হয়ে গেলেন যে?’

‘হোরেশিও কেইন... নামটা চেনা আমার...’

‘চেনেন ওকে? তা হলে তো বাদ...’

‘না, এরিক। হোরেশিও কেইন নামটা শুনেছি আমি আগে, মানুষটাকে চিনি না।’

‘কার কাছে শুনেছেন?’

‘আমার এজেন্সির একজন... অন্তরার কাছে!’

‘অন্তরা... মানে, যে-মেয়েটাকে সিদ্ধিকী খুন করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভাবছেন, কারমেলে এই নামটা খুঁজে পাবার মধ্যে কোনও কানেকশন আছে?’

‘কো-ইনসিডেন্স হবার সম্ভাবনা কতটুকু, এরিক? হোরেশিও নামটা বেশ আনকমন না? তার সঙ্গে যদি সারনেম-ও মিলে যায়, তা হলে কি আর একে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়?’

‘কিন্তু সামান্য একটা নামের ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অন্তরা নিশ্চয়ই আপনাকে সারাজীবনে ওই একটা নামই শোনাযনি?’

‘হোরেশিও কেইন সাধারণ কেউ ছিল না, এরিক। অন্তরার

জীবনের প্রথম এবং একমাত্র প্রেম ছিল ও। পরস্পরকে ভালবাসত ওরা, বিয়ে করার কথা ছিল। যে-অ্যাকসিডেন্টে অন্তরা পঙ্গু হয়ে যায়, ওই একই অ্যাকসিডেন্টে হোরেশিও প্রাণ হারায়। লং-ড্রাইভে বেরিয়েছিল ওরা, একটা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছিল, হোরেশিও ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্তরার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ঘটনাটা।

‘বুঝলাম। কিন্তু ওর প্রেমিকের নামটা সিদ্দিকী নিতে যাবে কেন?’

‘এখনও বুঝতে পারছ না তুমি, এরিক? অন্তরার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নকল পরিচয়ের কাগজপত্র তৈরি করিয়েছিল সিদ্দিকী। ও জানত, কাজ শেষ হলেই ওকে খুন করে ফেলবে শয়তানটা। তাই মরার আগে একটা সূত্র রেখে গেছে ও... এমন সূত্র, যেটা দুনিয়াতে শুধু আমি বুঝতে পারব। সিদ্দিকীর ভুয়া পরিচয়ের কাগজপত্রে ওর মৃত প্রেমিকের নাম বসিয়ে দিয়ে গেছে। শয়তানটার চোখে ওটা স্রেফ একটা নাম, কিন্তু আমার জন্য ওটা অনেককিছু!’

‘বুঝতে পেরেছি!’ এবার এরিকের গলাতেও উত্তেজনা ফুটল। তাড়াতাড়ি কাগজ ঘাঁটল ও। বলল, ‘ঠিকানাটা লিখুন। ৩৯, কারমেল হাইল্যান্ডস্। সাগরের পাশে, একটা ক্লিফের উপর। জায়গাটো—পুরো চার একরের সম্পত্তি। দোতলা একটা বাংলো আছে, বাকিটা ফলের বাগান।’

জ্যাকেটের পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে খসখস করে লিখে নিল রানা। ‘আমি ঋণী হয়ে রইলাম, এরিক...’

‘আরে রাখুন আপনার ঋণ! আমি আপনাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি। সিদ্দিকী লোকটা ভয়ঙ্কর। কোণঠাসা হয়ে পড়লে আরও যে কী করবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওখানে আপনার একা যাওয়া উচিত হবে না। আমাকে একটু সময় দিন, দেখি একটা

সোয়াট টিম পাঠাতে পারি কি না...’

‘না, এরিক,’ কড়া গলায় বলল রানা। ‘আর কেউ না, আমি একাই যাব।’

‘এটা গোঁয়াতুর্মির সময় নয়, মি. রানা। সিদ্ধিকীর মত ম্যানিয়াককে সামলাতে হলে আপনার ফায়ার-পাওয়ার, আর ম্যান-পাওয়ার—দুটোই প্রয়োজন হবে।’

‘ভুল বললে। লোক বেশি দেখলে ও বরং আরও সতর্ক হয়ে যাবে। আমি একা গেলে লুকিয়ে পৌছতে পারব, ওর চোখে পড়ব না। তোমাকে শুধু আর একটা কাজ করতে হবে।’

‘কী?’

‘সিদ্ধিকীর খবরটা তোমার অফিসের কাউকে জানিয়ে না। এফবিআই ব্যাপারটায় নাক গলাক, তা আমি চাই না।’

‘সেটা সহজ হবে না। লোকজনকে যে কাজে লাগিয়েছি, সেটা বসদের কাছে জাস্টিফাই করব কীভাবে?’

‘যা-খুশি বলো। উদ্ভাবনী শক্তি খাটাও। আগামীকাল পর্যন্ত সময় দরকার আমার।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। ‘ঠিক আছে। তবে একটা কথা, মি. রানা। আমাকে ডোবাবেন না কিন্তু!’

উনিশ

রাত বারোটা। কারমেল হাইল্যান্ডস্।

হাতঘড়িতে বিপ্ বিপ্ করে অ্যালার্ম বাজতেই চোখ মেলল

রানা। ঘন্টাখানেক আগে পৌঁছেছে ও, অভিযানে বেরুনোর আগে চোখ মুদে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

গাড়ির সিটে সিধে হয়ে চোখ রগড়াল রানা, মিনারেল ওঅটরের বোতল তুলে দু'টোক পানি খেল। তারপর হ্যাভারস্যাক নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ওর পরনে কালো রঙের পোশাক, মুখেও কালো ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট মেখেছে। গাড়ি পার্ক করেছে ড. সিদ্ধিকীর সম্পত্তি থেকে এক মাইল দূরে। সব মিলিয়ে ওর উপস্থিতি টের পাবার কোনও উপায় নেই।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, হাত দিয়ে ডলে শরীর গরম করল রানা; তারপর অন্ধকারে মিশে এগোতে শুরু করল। পিঠে হ্যাভারস্যাক-টা রয়েছে, তাতে নানা রকম দরকারি জিনিস। এক মাইল দূরত্ব পেরুতে বেশি সময় লাগল না। অল্পক্ষণেই সিদ্ধিকীর বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেল ও। সামনেই কাঁটাতারের বেড়া, ওপাশে ফলের বাগান। স্ট্রবেরি, পিচ, কমলা-সহ নানা জাতের গাছ লাগানো হয়েছে সার বেঁধে। ভালই হলো গাছপালা থাকায়, মনে মনে ভাবল রানা, খোলা জমিন হলে বরং গা-ঢাকা দিয়ে এগোতে কষ্ট হতো।

পকেট থেকে একটা ওয়ায়্যার-কাটার বের করল ও, কাঁটাতারের বেড়ার একটা অংশ কেটে জায়গা বের করল, সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বাগানের ভিতর অন্ধকার আরও ঘন... যেন কালির দোয়াত উপুড় করে ঢেলে দেয়া হয়েছে ওখানে। গাছের আড়াল ব্যবহার করে এগোচ্ছে রানা। সাবধানে পা ফেলছে, বাগানের জমি শুকনো পাতায় ভরা, সামান্য চাপেও মড় মড় শব্দ হচ্ছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে কম শব্দ করে এগোতে।

আসার আগে এখানকার ম্যাপ দেখে এসেছে রানা, তাই নিকষ আঁধারেও পথ চিনতে অসুবিধে হলো না। পনেরো মিনিট পর বাগানের প্রান্তে পৌঁছে গেল, শেষ গাছটার আড়াল থেকে

সাবধানে উঁকি দিল বাংলোর দিকে। দোতলা ভবনটা ইঁটের তৈরি, একপাশে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ফায়ারপ্লেসের চিমনি—ডিজাইনটা অন্তত বিশ বছরের পুরনো। তবে কেনার পর সম্ভবত মেরামত ও রং করিয়েছে সিদ্দিকী, নতুনের মত ঝকঝক করেছে। বাইরের দিককার দেয়ালে তো নতুন রঙ করা হয়েছেই; বারান্দার রেলিং, দরজা-জানালায় পাল্লা... সবকিছু লাগানো হয়েছে নতুন করে। বাইরের দিকটাতে আলোরও অভাব নেই, বেশ কয়েকটা সিকিউরিটি ল্যাম্প জ্বলছে—তাতে আলোকিত হয়ে আছে বাগান ও বাড়ির মধ্যবর্তী পঞ্চাশ গজের মত ফাঁকা জায়গাটা। পুরো বাড়ি অবশ্য অন্ধকার, একটা জানালাতেও আলো দেখা যাচ্ছে না। সিদ্দিকী সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিনকিউলার বের করল রানা, চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বাংলাটা। খেয়াল করল, বেশ কয়েকটা ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা রয়েছে দেয়ালের গায়ে, ওগুলোর লেন্স বাগানের দিকে তাক করা। একটু ভাবল রানা, ড. সিদ্দিকীর মত প্যারানয়েড লোক শুধু ক্যামেরা বসিয়ে ক্ষান্ত হবে না। নিউয়ার্কের হাইডআউটের কথা মনে পড়ল, ওখানে বুবি-ট্র্যাপ রেখেছিল লোকটা। এখানেও নিশ্চয়ই আছে। কী হতে পারে? ট্রিপ-ওয়ায়ার? অদৃশ্য রশ্মি? ডেথ-পিট?

পিছিয়ে গেল রানা, চিন্তায় পড়ে গেছে। বাংলা আর বাগানের মধ্যবর্তী জায়গাটা কাভার করেছে সিকিউরিটি ক্যামেরা, চোখ লাড়িয়ে ও-টুকু পেরুনো সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে হয়তো গুলি লাগে, কিংবা পাথর ছুঁড়ে দু-একটা ক্যামেরা নষ্ট করে দেয়া যায়; কিন্তু তাতে সিদ্দিকী সতর্ক হয়ে যাবে। তা ছাড়া শুধু ক্যামেরা নষ্ট করলেই চলছে না, মাটিতে যে-সব বুবি-ট্র্যাপ পাতা আছে, সেগুলোকে ফাঁকি দেবে কীভাবে?

গম্ভীর হয়ে বাংলা আর বাগানের উপর পালা করে নজর

বোলাল রানা, হঠাৎই আশার আলো দেখতে পেল। ক্যামেরাগুলো সব বাংলোর নীচতলা বরাবর বসানো হয়েছে, কিন্তু দোতলার লেভেলটা অরক্ষিত। তারমানে...

ঝটপট হ্যাভারস্যাক থেকে দড়ির বাগিল বের করল ও। সঙ্গে বের করল গ্র্যাপলিং হুক আর পিটন-শুটার। হকের সঙ্গে দড়ি বেঁধে শুটারে বসাল, তারপর জিনিসদুটো নিয়ে উঠে পড়ল একটা গাছে। ডাল বেয়ে পঁচিশ ফুট উচ্চতায় উঠে গেল ও, তাকাল বাংলোর দিকে। সম্ভ্রষ্ট বোধ করল, উচ্চতাটা যথেষ্ট।

পিটন-শুটারটা বাংলোর পাথরে তৈরি চিমনির দিকে তাক করে ফায়ার করল ও। মৃদু শব্দ করে ছুটে গেল গ্র্যাপলিং হুকটা, ওটার শরীর রবারে মোড়া; বাংলোর ছাদে আছড়ে পড়লেও আওয়াজ হলো না। নিশানাটাও নিখুঁত হয়েছে, দড়ি ধরে টানতেই চিমনির কিনারে বেধে গেল হকের বাহু, টানাটানি করে খোলা গেল না, শক্ত হয়েই আটকেছে। দড়ির এ-প্রান্তটা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে টানটান করে বাঁধল রানা, তারপর বুলে পড়ল—হাত-পা ব্যবহার করে র্যাপেলিংয়ের মাধ্যমে এগোচ্ছে বাংলোর দিকে।

দেড়শো ফুট প্যারালাল র্যাপেলিং—সহজ কাজ নয়। পিঠ আর হাতের পেশি ব্যথা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে, শীতবোধ উধাও হয়ে গেছে, পরিশ্রমে সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। থামল না ও, এগিয়ে চলল। শেষে যখন ছাতে পা রাখল, তখন সারা শরীর কাঁপছে।

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল রানা, তারপর বাংলোর পিছনদিকে গিয়ে ছাতের কিনারা থেকে উঁকি দিল। একটা টেরেস রয়েছে ওখানে, সাগরের দিকে মুখ করা। সাবধানে ওখানে নেমে পড়ল ও।

টেরেস থেকে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য ফ্রেঞ্চ-ডোর আছে, পাল্লাদুটো তালা দেয়া এখন। পকেট টর্চ বের করে তালাটা দেখল

রানা, অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করছে। কিছু দেখতে না পেয়ে স্বস্তি বোধ করল, হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে আনল লক-স্মিথ কিট। কয়েক মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে ফেলা গেল তালাটা। ফ্রেঞ্চ-ডোরের পাল্লা সরিয়ে সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকে পড়ল ও।

সতর্ক ভঙ্গিতে তল্লাশি শুরু করল রানা—সাবধানে পা ফেলছে, কড়া নজর রাখছে দেয়াল আর বাড়ির আনাচে-কানাচে... আর কোনও ক্যামেরা আছে কি না সেটা বুঝতে চাইছে। তবে দেখা গেল না-কিছু। শুধু বাইরেই ক্যামেরা বসিয়েছে সিদ্দিকী, ভিতরে নয়। হয়তো আশা করেছে, ওখানটা পেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।

মাস্টার বেডরুমটা খুঁজে বের করল রানা। দরজা খোলা ওটার, এমনকী ভিড়িয়েও রাখা হয়নি। ভিতরে ঢুকে বিছানার উপর আলো ফেলল ও, কিন্তু পরমুহূর্তে হতাশ হলো। শূন্য বিছানা পরিপাটি করে সাট করা। কেউ ওটাতে শুয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। ঘরের বাকি অংশের উপর নজর বোলাল। রুমটা বেশ বড়। সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। এককোণে একটা আটচল্লিশ-ইঞ্চির বিশাল ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভি রয়েছে, সেইসঙ্গে মিউজিক সিস্টেম। ছোট একটা র‍্যাকে অল্প কিছু বই, দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা পেইন্টিং, মেঝেটা কার্পেটে মোড়া। মাথার উপর সুদৃশ্য ঝাড়বাতি, একপাশের দেয়ালে রয়েছে ক্লজিট। ওটা খুলে ভিতরে ঝোলানো কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে গেল ও, ওটাও ফাঁকা... কেউ নেই ভিতরে।

চিহ্নিত ভঙ্গিতে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পরের রুমটিতে গেল। এটাও বেডরুম... এবং একই রকম ফাঁকা। দু'দু'দু'দু'দু' বেড়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি বাংলোর বাকি অংশ

তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লিভিং রুম, কিচেন, লব্ধি রুম, লাইব্রেরি, গেস্টরুম, স্টাডি, গ্যারাজ... সব দেখল এক এক করে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ড. সিদ্দিকীকে। বাড়িতে মানুষ বাস করবার চিহ্ন আছে, তারপরও সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বিস্মিত বোধ করল রানা—লোকটা গেল কোথায়? তার পরিচয় যে ফাঁস হয়ে গেছে, সেটা কি টের পেয়ে গেছে? পালিয়ে গেছে?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। না, পালায়নি সিদ্দিকী। গ্যারাজে পড়ে রয়েছে তার প্রিয় পোশাক গাড়িটা, পালালে ওটা নিয়ে পালাত। কিন্তু পালিয়ে যদি না গিয়ে থাকে, তা হলে গেল কোথায়?

কী যেন খুঁতখুঁত করছে রানার মনে, ঠিক ধরতে পারছে না। ঝড়ের বেগে মাথা খাটাল, হঠাৎ ধরতে পারল অসঙ্গতিটা। দোতলায় ফিরে গেল ও, আবার দেখতে শুরু করল ওখানকার সবক'টা রুম। মাস্টার বেডরুমের পাশের স্পেয়ার বেডরুমটাতে যেতেই থমকে দাঁড়াল। তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট এ-রুমটা। ওর হিসেব অনুসারে আরও বড় হবার কথা এটার। তাড়াতাড়ি মাস্টার বেডরুমে ফিরে গেল ও, এক হাতে পিস্তল ধরে খুলে ফেলল ক্লজিটটা। দুই বেডরুমের মাঝে পড়েছে ওটা, ও-পাশের রুমটার যা আকৃতি, তাতে ক্লজিটটা আরও অনেক বড় হওয়া উচিত। স্রেফ দেয়াল আলমারির মত নয়, এটা হওয়া উচিত ওয়াক-ইন সিস্টেমের, মানে ছোট-খাট একটা রুমের মত... যার ভিতরে হেঁটে ঢুকে পড়া যায়। অথচ চোখের সামনে মাত্র দু'ফুট গভীরতা দেখতে পাচ্ছে, একটা করে হ্যাঙ্গারের বেশি কিছুই ঝোলানো সম্ভব নয় ক্লজিটটাতে।

কাপড়গুলো বের করে ফেলে ক্লজিটের পিছনদিককার দেয়ালটা পরীক্ষা করল রানা। কাঠের তৈরি, তবে ক্লজিটের দরজার চেয়ে নতুন দেখাচ্ছে। মেঝের দিকে তাকাল, বাঁকা একটু

আঁচড়ের দাগ ফুটে রয়েছে। মুখে হাসি ফুটল ওর, জিনিসটা আসলে একটা গোপন দরজা। ওপাশে, ওয়াক-ইন ক্লজিটের বাকি অংশটাকে একটা লুকানো কামরায় পরিণত করেছে সিদ্ধিকী।

ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটার সুইচ খোঁজার ধৈর্য হলো না, তাই হ্যাভারস্যাক থেকে বের করল সি-ফোর বিস্ফোরকের একটা ব্লক। পুরোটা ব্যবহার করলে বাংলোর অন্তত অর্ধেকটা উড়ে যাবে। সামান্য একটু অংশ ছুরি দিয়ে কাটল ও। হাতে পাকিয়ে পাতলা স্ট্রিপের মত করল, তারপর ওটা বসাল ক্লজিটের পিছনের দেয়ালে। ডিটোনেটর আর টাইমার সেট করে বিছানার পিছনে এসে আড়াল নিল। সিগ-সাওয়ারটা হাতে নিয়ে রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রাখল।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর ঘটল বিস্ফোরণ। হিসেব করে সি-ফোর ব্যবহার করেছে রানা, চোখ-ঝলসানো আলোর সঙ্গে মৃদু আওয়াজ হলো শুধু। একইসঙ্গে ক্লজিটের পিছনের দেয়াল ভেঙেচুরে উড়ে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, একছুটে গিয়ে ঢুকল ছোট কামরাটিয়।

ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আবছাভাবে একপাশে একটা কনসোল দেখতে পেল ও—নিউয়ার্কের সেই হাইডআউটেও অনেকটা এরকমই একটা ছিল। নানা রকম বোতামের পাশাপাশি কয়েকটা ছোট ছোট মনিটর আছে—সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড দেখাচ্ছে ওগুলো। কনসোলের ঠিক পাশেই একটা সিঙ্গেল খাট, আর কিছু নেই কামরায়।

ড. সিদ্ধিকীকে দেখার আশায় নজর বোলাল রানা, কিন্তু ঘন ধোঁয়ার কারণে দেখতে পেল না কিছু। কামরার ভিতরে আলোও ঝলছে না। লোকটা ঠিক কোথায় রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। সিগ-সাওয়ারটা তুলল ও। কড়া গলায় বলল, 'বেরিয়ে আসুন, ডক্টর। আপনার খেলা শেষ!'

‘না, মি. রানা!’ ধোঁয়ার ভিতর থেকে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ। ‘খেল খতম হয়েছে আপনার!’

পরমুহূর্তে ঘাড়ের কাছে ঘ্যাঁচ করে বিঁধল কী যেন, টান দিয়ে ওটা খুলে আনল রানা। চোখের সামনে আনতেই দেখল, জিনিসটা একটা ট্র্যাঙ্কলাইজার ডার্ট। প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেল না, চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। হাতের মধ্যে সিগ-সাওয়ারটা কাঁপতে শুরু করেছে।

ধোঁয়া ভেদ করে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল ও—সুঠামদেহী একজন মানুষ, মেঝেতে শুয়ে ছিল এতক্ষণ। তীব্র আক্রোশ নিয়ে লোকটার দিকে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল, পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল রানার চোখের সামনে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল রানার। চোখের সামনে থেকে সরে গেল ধূসর একটা পর্দা, মাথাটা দপদপ করছে। কয়েক সেকেন্ড কেমন যেন বিভ্রান্তিতে কাটল, তারপর মনে পড়ে গেল সব। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে আগুন জ্বলে দিল ক্রোধ, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল ও। কিন্তু নড়তে পারল না একচুল। এতক্ষণে খেয়াল করল, একটা চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে।

‘ওয়েলকাম ব্যাক,’ শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ।

ঝট করে মাথা সোজা করল রানা, দেখতে পেল শত্রুর চেহারা। ওর মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসে আছে সিদ্দিকী, মুখে হাসি ফুটিয়ে পাইপ ফুঁকছে। ক্রোধের পাশাপাশি বিস্ময় ভর করল রানার ভিতরে। জিমনেশিয়ামের ম্যানেজার ভুল বলেনি, সত্যিই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে লোকটার বাহ্যিক অবয়বে। মোটাসোটা, স্থূল দেহ আর নেই এখন; তার বদলে অনেকটাই

ছিপছিপে হয়ে গেছে। তিন সপ্তাহের কম সময়ে এভাবে শুকানো সম্ভব—তা কল্পনাই করা যায় না। চেহারায়ও পরিবর্তন এনেছে লোকটা, ক্লিনশেভের পরিবর্তে গৌফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছে; চুলও ছুঁটেছে ছোট করে।

‘কী?’ হাসল সিদ্দিকী। ‘চিনতে পারছেন না?’

জবাব দিল না রানা, তাকাল চারপাশে। বাংলোর স্টাডিরুমে বসানো হয়েছে ওকে। জানালা নেই এ-ঘরে, বাতিও জ্বালা হয়নি; একপাশে ফায়ারপ্রেসে আগুন জ্বলছে, ওখান থেকে আসা মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ঘরটা। একটা দেয়াল ঘড়ি বুলছে একপাশে—তাতে দেখা যাচ্ছে, দু’টা বাজে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল ও।

‘আপনার পরামর্শটা গ্রহণ করেছি,’ বলল সিদ্দিকী। ‘শুকাতে বলেছিলেন না? চেহারাও পাল্টাতে বলেছিলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।’

‘তাতে বিশেষ লাভ নেই,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘আপনার চেহারা-সুরত এমনভাবে আমার মাথায় গেঁথে গেছে যে, নরকে গিয়েও ফাঁকি দিতে পারবেন না।’

‘তা হলে সেটা আপনার ব্যর্থতা বলে গণ্য হবে,’ হাসিটা ধরে রাখল সিদ্দিকী। ‘বলব, উধাও হবার টেকনিকে গলদ আছে আপনার।’

‘গলদ শোধরানোর জন্যই খুন করেছেন আমার বন্ধুদেরকে?’
গমগমে গলায় জানতে চাইল রানা।

‘অনেকটা সেরকমই বলতে পারেন,’ পাইপে আবার টান দিল সিদ্দিকী। ‘আমি ভেবে দেখলাম, নিখুঁতভাবে উধাও হতে গেলে কারো কোনও সূত্র রেখে যাওয়া ঠিক না। এমন কাউকে রেখে যাওয়া ঠিক না, যার কাছ থেকে নতুন পরিচয়টা ফাঁস হতে পারে। তাই সেটা পাচ্ছেন, কথাটা ভুল নয়। আপনি বেঁচে যাওয়ায়

আমাকে খুঁজে বের করে ফেলতে পেরেছেন।’

‘মনসুরের টিম, কিংবা আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে এ-কথা বলছেন। আমরা মরে গেলেও কিছুতেই আপনার খোঁজ দিতাম না কাউকে।’

‘ওসব আশ্বাসে বিশ্বাস নেই আমার,’ হাত নাড়ল সিদ্দিকী। ‘দুনিয়ায় সবাইকেই মচকানো সম্ভব। দরকার শুধু তার দুর্বল জায়গাটায় চাপ প্রয়োগ করা...’

‘আপনার অনেক ডিগ্রির কথা শুনেছি,’ ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। ‘কিন্তু ওগুলোর মধ্যে যে সাইকোলজি-ও আছে, তা কেউ বলেনি আমাকে।’

‘মানুষের মন পড়তে সাইকোলজির প্রয়োজন হয় না, মি. রানা। শুধু একটু বিশ্লেষণী শক্তি থাকলেই চলে। আপনার ব্যাপারটাই ধরুন। অনেক আয়োজন করে এসেছিলেন আমাকে ধরতে... কিন্তু কই, পেরেছেন? উল্টো নিজে ধরা পড়ে গেছেন। কারণ আমি জানতাম, আপনি আসবেন। সে-জন্য প্রস্তুত ছিলাম।’

‘কীভাবে জেনেছেন?’

‘আপনাকে চেনা হয়ে গেছে আমার, মি. রানা। পাঁচ-পাঁচজন বন্ধু খুন হয়ে যাবে, অথচ আপনি প্রতিশোধ নিতে চাইবেন না... তা-ই কি হয়? আমি জানতাম, আগে হোক, বা পরে, আমার কাছে ঠিকই পৌঁছে যাবেন আপনি। তাই গোপন কামরা বানিয়েছি বাড়িতে, ক্যামেরা বসিয়েছি...’

‘ক্যামেরাগুলোকে ফাঁকি দিতে পারিনি?’ জানতে চাইল রানা।

‘বাইরেরগুলোকে দিয়েছেন। কিন্তু বেডরুমের একটা ছিল, সেটা বোধহয় জানতেন না, তাই না? ইনফ্রা-রেড মিনিয়চার ক্যামেরা, দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিঙের ফ্রেমে লুকানো... অন্ধকারেও সব দেখতে পায়। ওটাতে আপনাকে দেখতে পাই আমি। বিস্ফোরক বসাচ্ছেন দেখে বিছানার তলায় গিয়ে

লুকিয়েছিলাম, আপনি ভিতরে ঢুকতেই ট্র্যাঙ্কলাইজার-গান দিয়ে ফায়ার করেছি। প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ ছিল না আপনার, তবে এলিমেন্ট-অভ-সারপ্রাইজ হারানোয় কাজে লাগেনি।’

‘কপাল খারাপ—আর কী বলব?’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

‘একটা জিনিস শুধু বুঝতে পারছি না। ক্লজিটের ভিতর যে আরেকটা কামরা আছে, সেটা কীভাবে বুঝলেন?’

‘খুব সহজ,’ রানা বলল। ‘বাইরে এতগুলো ক্যামেরা, অথচ ওগুলোর কোনও মনিটর দেখলাম না ভিতরে। বুঝতে পারলাম, কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো। বেডরুমের কাছাকাছিই হবার কথা। পাশের রুমটার সঙ্গে মেলাতেই মনে হলো, ক্লজিটটা আরও বড় হওয়া উচিত। হয়নি, কারণ ওটার একটা অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।’

‘আপনার পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না,’ হেসে বলল সিদ্দিকী।

‘আমারও একটা প্রশ্ন আছে, ডক্টর,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা।

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! যে-কোনও প্রশ্নের জবাব পাবার অধিকার অর্জন করেছেন আপনি। অন্তত ওটুকু যদি না করি, তা হলে মস্ত অন্যায্য হবে।’

‘আমি জ্বনতে চাই, আপনি এতসব কেন করেছেন? কেন আমার বন্ধুদেরকে খুন করেছেন? এতক্ষণ যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করি না এক বিন্দুও। শুধু গায়েব হতে চাইলে পিছনে সূত্র মুছে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। আপনার আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য আছে... কী সেটা?’

‘এ-কথা কেন ভাবছেন?’ ভুরু কৌচকাল সিদ্দিকী।

‘আপনার মহামূল্যবান আবিষ্কারের কথা জানা হয়ে গেছে আমার। ড্রাগ-ট্রাগ কিছু নয়, আপনি আসলে একটা নায়ো-কেমিক্যাল ওয়েপন আবিষ্কার করেছেন... ফিয়ার-গ্যাস।

ওটা নিয়ে কী মতলব আপনার?’

থমকে গেল সিদ্ধিকী। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘দেখা যাচ্ছে, আপনাকে আগার-এস্টিমেট করেছি আমি। স্রেফ একজন প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ নন আপনি, সত্যান্বেষীও বটে!’

‘আমার প্রশ্নের জবাব হলো না ওটা।’

‘কী জবাব দেব? আপনি তো মনে হচ্ছে সবই জানেন। অসাধারণ একটা আবিষ্কার করেছি আমি, অথচ পরিণামটা দেখুন! আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে উঠে-পড়ে লেগেছে ওরা। পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইছে! বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন?’

‘আপনার ওই ছেলে-ভুলানো গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনান। শুধু জীবন বাঁচাতে চাইলে আমাকে শুরুতেই সত্যি কথাটা বলতেন আপনি। কাউকে খুন করতেন না।’

‘ভাবছেন আরও কোনও উদ্দেশ্য আছে আমার?’

সরাসরি হ্যাঁ-না বলল না রানা। শুধু বলল, ‘ডেমিয়েনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।’

এক মুহূর্ত ওর চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকল সিদ্ধিকী, তারপরই হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। এতক্ষণের মুখোশটা খসে পড়ল চেহারা থেকে। বলল, ‘ওই গাধা আর ওর দলটাকে স্রেফ ব্যবহার করেছি আমি। তবে হ্যাঁ, ও যদি বলে থাকে—ফিয়ার-গ্যাসের ফর্মুলা আমি বিক্রি করতে চেয়েছি, তা হলে ভুল বলেনি। আপনিই ভাবুন, এমন চমৎকার একটা আবিষ্কার... আমেরিকানরা কাজে লাগাতে চায় না বলে কি হারিয়ে যেতে দেয়া উচিত? আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার ওটা, নিজের উপকারেই যদি না লাগল, তা হলে আর কীসের জন্যে? ফিয়ার-গ্যাস আমাকে টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি... সব এনে দিতে পারে। এমন সুযোগ আমি ছেড়ে দেব কেন?’

‘কিন্তু ওটা যদি টেরোরিস্ট বা মন্দ লোকেরা কিনতে চায়? পৃথিবীতে কী ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হবে, সেটা ভেবেছেন?’

‘টাকা থাকলে যে-কেউ কিনে নিতে পারে, আমার আপত্তি নেই। আজকালকার জামানায় বিবেক-টিবেক হলো অচল বস্তু, মি. রানা। আমাকে ওসবের দোহাই দিয়ে লাভ নেই।’

‘আপনি একটা পিশাচ!’

‘যা খুশি ভাবুন,’ মুখ বাঁকাল সিদ্দিকী। ‘তবে এই পিশাচ-ই কিছুদিনের মধ্যে অটেল ক্ষমতার মালিক হবে। জীবন কাটাবে রাজা-বাদশার মত। আপনি নন!’

‘এতটা নিশ্চিত হবেন না। আপনার আসল উদ্দেশ্য আগেই আঁচ করতে পেরেছি আমি, শুধু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। এখন আর আপনাকে শাস্তি দিতে বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করব না আমি।’

‘ফাঁপা বুলি বন্ধ করুন, রানা। দৌড়-ঝাঁপ শেষ হয়েছে আপনার, মরবেন খুব শীঘ্রি। কাউকে শাস্তি দেয়ার মত অবস্থায় আর নেই আপনি।’

‘আমি না থাকলেও আরও অনেকে আছে, ডক্টর। ওরা আপনার গোপন পরিচয় জেনে ফেলেছে, গা-ঢাকা দিয়ে আর থাকতে পারবেন না।’

‘হাহ্!’ অবহেলার ভঙ্গিতে বলল সিদ্দিকী। ‘একটা আইডেন্টিটি ফাঁস হয়েছে তো কী? নতুন পরিচয় নেয়ার সমস্ত ফলাফল আমি শিখে নিয়েছি, আরেকটা আইডেন্টিটি বানাতে কোনও অসুবিধে হবে না। এনিওয়ে, গল্প-গুজবের সময় শেষ। এবার আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হয়।’

‘কী করবেন?’

‘ভেবেছিলাম তো ক্লিফ থেকে নীচে ফেলে দেব, তবে এখন মনে হচ্ছে ওটা পরে করলেও হয়। ফিয়ার-গ্যাসের কথা যখন

জেনে ফেলেছেন, তখন মরার আগে আবিষ্কারটার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার আপনার। ওই ফর্জারের বাড়িতে একটা ক্যানিস্টার ফাটিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাতে তো দেখছি কাজ হয়নি। এখন তা হলে একটা সত্যিকার ডোজ দিই, কী বলেন? ক্লিফ থেকে হয়তো নিজেই ঝাঁপ দিতে চাইবেন, আমাকে আর খাটতে হবে না।’

জবাব দিল না রানা। চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল সিদ্দিকীর দিকে।

‘একটু অপেক্ষা করুন,’ হাসল ধুরন্ধর বিজ্ঞানী। ‘আমি যাব, আর আসব।’ স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। মোচড়ামুচড়ি করল শরীর, কিন্তু একচুল আলগা হলো না দড়ির বাঁধন। চেয়ারটার উপর নজর দিল ও, খুব শক্ত কাঠের নয়, কৌশল খাটিয়ে ভেঙে ফেলা যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো—শরীর বাঁধা আষ্টেপৃষ্ঠে, দু’পা-ও একত্র করে বেঁধে রাখা হয়েছে; দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর দাঁড়ানো না গেলে কৌশলটা খাটানো যাবে না।

চারপাশটা জরিপ করল রানা, ফায়ারপ্লেসের দিকে চোখ পড়তেই আশার আলো দেখতে পেল। চেয়ারসহ বসা অবস্থায় লাফাতে শুরু করল ও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ঠিক সামনে পৌঁছে থামল, দ্বিধা না করে দু’পা ঢুকিয়ে দিল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

প্যাণ্টে আগুন ধরে গেল চোখের পলকে, চামড়ায় কামড় বসাল তীব্র উত্তাপ—পা ঝলসে যেতে শুরু করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ব্যথাটা সহ্য করল রানা, একটু টিকে থাকতে পারলেই হয়, প্যাণ্টের পাশাপাশি দড়িতেও আগুন লেগেছে, ওটা দুর্বল হয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে। পা’দুটো দুদিকে প্রসারিত করার ভঙ্গিতে দড়িতে চাপ দিয়ে চলেছে ও, একটু পরেই প্রেশারটা আর

সহ্য করতে পারল না জ্বলন্ত বাঁধন। ফুলকি তুলে ছিঁড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি পা বের করে ফায়ারপ্রেসের সামনে থেকে সরে এল রানা। প্যাণ্ট জ্বলছে এখনও, তবে বিপজ্জনকভাবে নয়। দু'পায়ে ভর দিয়ে কুঁজো হবার ভঙ্গিতে দাঁড়াল ও, চেয়ারের সামনের দুই পায়া কোনাকুনিভাবে লেগে রইল মেঝেতে। অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিল রানা, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নেমে এল মাটিতে। ফলাফলটা হলো দেখার মত। ওর শরীরের পুরো টান গিয়ে পড়ল দুই হাতল আর ব্যাকরেস্টে। মড়মড় করে উঠল ওগুলো, ওজনটা সহিতে পারল না, শব্দ তুলে ভেঙে গেল। ধপাস করে ভাঙা চেয়ারসহ মাটিতে পড়ে গেল রানা।

ঝটকা দিয়ে চেয়ারের বাকি অংশ থেকে ভাঙা ব্যাকরেস্ট আর হাতল আলাদা করল ও, উঠে দাঁড়াল। এবার ঢিল হয়ে গেছে বাঁধন, মালার মত গলার উপর দিয়ে তুলে আনতে একটুও অসুবিধে হলো না। এরপর চাপড় দিয়ে প্যাণ্টের আগুন নেভাল ও।

মুখে নির্দয় হাসি ফুটল রানার। মুক্ত হয়ে গেছে, এবার ড. সিদ্দিকীর কপালে খারাবি আছে। ভাঙা চেয়ারের একটা পায়া খুলে নিল ও, ওটাকে মুণ্ডরের মত বাগিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে।

একটু পরেই পায়ের শব্দ হলো। শিস দিতে দিতে আসছে বিজ্ঞানী। দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'গেট রেডি, মি. রানা। অভূতপূর্ব একটা অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে আপনা...'

কথা শেষ হলো না তার, সামনে ভাঙা চেয়ার দেখে বাকশক্তি হারাল। পরমুহূর্তেই সজোরে তার ঘাড়ে পায়াটা দিয়ে মুণ্ডর লাগাল রানা। টলে উঠল বিজ্ঞানী, আর্তনাদ করে মুখ খুবড়ে পড়ল মেঝেতে; হাত থেকে ছুটে চলে গেল ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার।

লোকটাকে চিত করল রানা, বুকের উপর চড়ে বসল, হাঁটু দিয়ে আটকে রেখেছে দু'হাত। নড়াচড়ার উপায় রইল না

সিদ্দিকীর, চেয়ারের পায়াটা আড়াআড়িভাবে কণ্ঠার উপর নেমে আসতেই বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল।

‘কী, ডক্টর?’ টিটকিরির সুরে বলল রানা। ‘অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে তো?’

‘প্লিজ... মি. রানা...’ চিঁ চিঁ সুর বেরুল বন্দি বিজ্ঞানীর গলা থেকে।

‘জোরে বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি না।’

‘খোদার দোহাই! মারবেন না আমাকে!!’

‘আমাকে তো মারতেই যাচ্ছিলেন আপনি। একই সৌজন্য আমারও দেখানো উচিত না?’

‘প্লিজ... আ... আমাকে মাফ ক... করে দিন...’ কথা আটকে যাচ্ছে সিদ্দিকীর।

পায়ার উপর থেকে চাপ কমাল রানা, শান্ত হয়ে এসেছে। বলল, ‘রিল্যাক্স! আপনাকে খুন করব না আমি, অন্তত এখনি নয়।’

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সিদ্দিকী, কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনোমতে বলল, ‘সত্যিই বাঁচতে দিচ্ছেন আমাকে? কেন?’

‘কারণ আপনাকে দাবার গুটি হিসেবে প্রয়োজন আমার। কিন্তু তার আগে বলুন, কথামত কাজ করবেন কি না।’

‘এনিথিং, মি. রানা! এনিথিং!’

‘আমার বান্ধবীকে আপনার কন্ট্রোলাররা ধরে নিয়ে গেছে। ওদের সম্পর্কে ইনফরমেশন চাই আমি।’

‘কে নিয়েছে?’

‘সোনালিচুলো একটা মেয়ে...’

‘মেজর লারিসা মরগান,’ বুঝতে পেরে বলল সিদ্দিকী। ‘ভয়ঙ্কর মহিলা! বান্ধবীর আশা ছেড়ে দিন। ওই ডাইনির হাত

থেকে কিছুতেই তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে জানটা খোয়াবেন।’

‘উঁহু, আমার হাতে একটা ট্রাম্পকার্ড আছে—আপনি। আমার বান্ধবীর বদলে আপনাকে চেয়েছে ওরা।’

‘ভুলে যান! আমার জন্য বলছি না, আপনার জন্যই বলছি। কাউকেই ছাড়বে না মেজর মরগান। আমাকে হাতে পাওয়ামাত্র খুন করবে আপনাকে আর আপনার বান্ধবীকে।’

‘তবু যেতে হবে আমাকে। আমার বান্ধবী ফিয়ার-গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে, ওকে উদ্ধার করে অ্যান্টিডোট দিতে হবে। নিউট্রালাইজার-টা কোথায় রেখেছেন?’

‘আমার কাছে নেই, মি. রানা।’

‘মিথ্যে বলবেন না!’ ধমক দিল রানা। মাটিতে গড়াতে থাকা ক্যানিস্টারটা দেখাল। ‘গ্যাস রেখেছেন সঙ্গে, অথচ অ্যান্টিডোট রাখেননি? ইম্পসিবল! হতেই পারে না।’

‘সত্যি বলছি, নেই!’ পায়টা আবার গলার উপর নেমে আসছে দেখে আতঙ্ক ফুটল সিদ্দিকীর চেহারায়ে। ‘প্লিজ, মি. রানা। আমার কথা শুনুন! নিউট্রালাইজারটা আমি রাখিনি, কারণ ওটার দরকার পড়ে না আমার। ওটা একবার শুঁকলেই অনেকদিন শরীরে সক্রিয় থাকে।’ তবে... তবে... দরকার হলে আমি আপনাকে ফর্মুলাটা দিতে পারি...’

‘ফর্মুলা না, আমার ওষুধ দরকার। স্টকে যদি না থাকে, বানিয়ে দেবেন।’

‘তা হলেও ফর্মুলাটা দরকার হবে। ওটা আমার মুখস্থ করা নেই।’

‘কোথায় ফর্মুলা?’

‘ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজার... দুটোরই ফর্মুলা আমি নিরাপদ এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। এখান থেকে দূরে।’

‘বি স্পেসিফিক, ডক্টর।’

খুলে বলল সিদ্দিকী।

ভুরু কৌচকাল রানা, কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ‘আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি চালাকি খাটাবার চেষ্টা করছেন।’

‘কী? না, না!’ আতঙ্কিত ভঙ্গিতে বলল সিদ্দিকী। ‘বিশ্বাস করুন, আমার মনে কোনও কুমতলব নেই। বাঁচতে চাই আমি, তার জন্য আপনি যা বলবেন, তা-ই করব! শুধু একটাই অনুরোধ, মেজর মরগানের হাতে আমাকে তুলে দেবেন না।’

‘হুম, সেক্ষেত্রে একটা ছক সাজানো দরকার,’ কলার ধরে বিজ্ঞানীকে দাঁড় করাল রানা। ‘রওনা হবার আগে একটা ফোন করতে হবে আপনার!’

বিশ

বেশ কয়েকবার রিং বাজার পর ফোন ধরল মেজর লারিসা মরগান ওরফে ব্ল্যাক উইডো। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, ‘হ্যালো?’

‘মাসুদ রানা বলছি।’

ঘুমটা চটে গেল গেল লারিসার চোখ থেকে। বেডসাইড টেবিল থেকে হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল। চারটা বাজে। ভুরু কুঁচকে বলল, ‘এত রাতে... কী ব্যাপার?’

‘সব ভুলে গেছ নাকি?’ বিরক্ত গলায় বলল রানা। ‘আমার ফোন করবার কথা ছিল!’

‘হ্যাঁ, মনে আছে,’ বিছানায় উঠে বসল লারিসা। ‘এত

তাড়াতাড়ি করবে, ভাবিনি। বলো, কী খবর?’

‘সুসংবাদ আছে, ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে পেয়েছি আমি।’

‘ওড! কোথায় ও?’

‘আছে... আমার সঙ্গেই। বন্দি করেছি ওকে।’

‘খুন করতে বলেছিলাম...’

‘আগেই বলেছি, আমি পেশাদার খুনি নই। তা ছাড়া সিদ্দিকীকে যদি মেরেই ফেলি, তা হলে সোহানাকে ফিরিয়ে দেবার কোনও বাধ্যবাধকতাও থাকে না তোমার।’

‘আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছ না?’ হাসল লারিসা।

‘আমি সোহানার সঙ্গে কথা বলতে চাই,’ শান্ত গলায় বলল রানা।

‘এক মিনিট।’

রিসিভারে খসখস শুনল রানা, তারপর দরজা খোলার শব্দ; সম্ভবত আরেকটা রুমে যাচ্ছে ব্ল্যাক উইডো। একটু পরে আবছাভাবে ভেসে এল তার কণ্ঠ। ‘ওকে বলো, তুমি ঠিক আছ।’

নিরন্তর রইল অপরপক্ষ।

আবার শোনা গেল ব্ল্যাক উইডোর গলা, এবার খেপে গেছে।

‘কথা বলো! নইলে কিন্তু ভাল হবে না!’

দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল রিসিভারে, তারপর সোহানার কাঁপা কাঁপা গলা। ‘রানা...’

আবেগ উঁথলে উঠল রানার ভিতর, কোনোমতে সেটা চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাকে মারধর করেনি তো ওরা?’

‘এখনও না। ক্... কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, রানা...’

‘শান্ত থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে...’

কথা শেষ হলো না, তার আগেই আবার ফোনটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল রানা। ঠেকাল লারিসা। বলল, ‘হয়েছে এবার? তোমার মনটা আশান্ত আছে... এখন পর্যন্ত আর কী। কাজের কথায় এসো,

নইলে ওর আয়ু খুব শীঘ্রি ফুরিয়ে যাবে।’

‘ওর গায়ে যদি একটা টোকাও পড়ে,’ থমথমে গলায় বলল রানা, ‘তা হলে তোমাকে সেটার খুব চড়া মাশুল শুনতে হবে।’

‘হুমকি দেয়ার পজিশনে তুমি নেই, রানা,’ খ্যাপাটে শোনালা লারিসার গলা। ‘চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বন্ধ করে শোনো, কীভাবে সিদ্ধিকীকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে...’

‘জাস্ট আ মিনিট,’ বাধা দিল রানা। ‘ওটা আমি ঠিক করব। তোমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করি না আমি, কাজেই তোমার নিয়মে চলবার প্রশ্নই ওঠে না।’

‘স্মার্টনেস দেখাতে চেষ্টা কোরো না, রানা! কথা শুনতে হবে তোমাকে, নইলে...’

‘সোহানাকে খুন করবে?’ একটু হাসল রানা। ‘এবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বোধহয় তুমিই বলছ। সিদ্ধিকী আমার হাতে আছে, সোহানার কিছু হলে ওর মাধ্যমে তোমার আর তোমার বস্দের সমস্ত গোমর ফাঁস করে দেব আমি, মেজর লারিসা।’ নামটার উপর জোর দিল ও।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল ব্ল্যাক উইডো, কথা ফুটল না তার মুখে।

রানা বলল, ‘বুঝতেই পারছ, খুব একটা খারাপ পজিশনে নেই আমি। তোমাদের সবার নাম-ধাম ইতোমধ্যে সিদ্ধিকীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। এখন যদি আমার কথা না শোনো, তা হলে মহামান্য কন্ট্রোলারদের সমস্ত কুকীর্তির খবর মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে যাবে গোটা আমেরিকার সবার কাছে।’

‘কী চাও তুমি?’ চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল লারিসা।

‘তুমি যা চাইছিলে, তা-ই। সিদ্ধিকীর বিনিময়ে সোহানা... তবে সেটা আমার ঠিক করা জায়গায়, আমার নিয়মে।’

একটু চুপ করে থাকল লারিসা। তারপর বলল, ‘কেউ আমার

উপর জোর খাটালে আমি তা ভালভাবে নিই না, রানা ।’

‘সেক্ষেত্রে আমার উপর জোর খাটাবার চেষ্টা করাও উচিত হয়নি তোমার,’ শান্ত গলায় বলল রানা । ‘আমিও ভালভাবে নিই না । যাক গে, আমার প্রস্তাবে রাজি কি না, বলো ।’

‘জবাব দিল না লারিসা ।

রানা বলল, ‘ভেবে দেখো, আমি কিন্তু খুব একটা খারাপ প্রস্তাব দিইনি । কথা শুনলে তোমারও লাভ আছে । চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলে, কিন্তু তার আগেই সিদ্ধিকীকে হ্যাণ্ডওভার করতে যাচ্ছি আমি । শিডিউলে এগিয়ে যাচ্ছ... কন্ট্রোলারদের কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেখাতে পারছ...’

কিছু চিন্তা করল লারিসা । শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় আসতে হবে? কখন?’

‘হাইওয়ে ওয়ান ধরে কার্মেলের দক্ষিণে পনেরো মাইল যাবে । ওখানে একটা সাইড-রোড পাবে—পাহাড়ের ভিতরে চলে গেছে । একটা ঐতিহাসিক সাইটে যাওয়া যায় ও-পথে, সাইনবোর্ড দেখতে পাবে ।’

‘কীসের ঐতিহাসিক সাইট?’ বাধা দিয়ে জানতে চাইল লারিসা ।

‘একটা স্টোন-চ্যাপেল । ১৯০৬ সালে এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তৈরি করেছিলেন ওটা । ভদ্রলোক ব্যাংকার ছিলেন, স্যান ফ্রান্সিসকোর ভূমিকম্পে ওঁর পুরো পরিবার মারা যায় । তারপর থেকে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে ধর্মকর্মে নেমে পড়েন তিনি । এখন মনশ্য গির্জাটা পরিত্যক্ত ।’

‘এতকিছু তুমি জানলে কী করে?’

‘গির্জাটায় আগেও একবার গেছি আমি । খুবই নির্জন, আমাদের এক্সচেঞ্জ-জবের জন্যে আদর্শ ।’ অম্লানবদনে মিথ্যা বলল রানা । আসলে ওটার কথা ও শুনেছে সিদ্ধিকীর মুখে,

ওখানেই ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। তবে সেকথা প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যায় না।

‘তোমার ঠিক করে দেয়া জায়গায় যেতে স্বস্তি বোধ করছি না আমি,’ সোজাসাপ্টা ভাষায় জানাল লারিসা।

‘খামোকা ভয় পাচ্ছ,’ রানা বলল। ‘আমি একা মানুষ, তোমার তো লোকলস্করের অভাব নেই। কী-ই বা করতে পারব আমি? বরং তোমার খুশি হওয়া উচিত, চমৎকার একটা জায়গা বেছে দিয়েছি বলে। সিদ্দিকীকে হাতে পাবার পর ওখানে বসে তুমি যা-খুশি-তাই করতে পারবে। বাগড়া দেবার কেউ থাকবে না।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারিসা। পুরোপুরি সম্ভ্রষ্ট হতে পারছে না, কিন্তু তার হাতে সময় কম, পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে যত দ্রুত কন্ট্রোলারদের কাছে রিপোর্ট দিতে পারবে, ততই প্রমাণ হবে তার যোগ্যতার। শেষে ব্যবস্থাটা মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘ঠিক আছে, কখন আসতে হবে?’

‘এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে পারি আমি...’

‘এত তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে,’ বলল লারিসা। ‘দু’ঘণ্টা পর এসো... ঠিক আছে?’

‘যা তোমার ইচ্ছে।’

‘ওকে। বাই দ্য ওয়ে, রানা... কোনও রকম চালাকি খাটাতে যেয়ো না। ফলাফলটা মোটেই ভাল হবে না।’

‘জানি। দু’ঘণ্টা পর দেখা হচ্ছে তা হলে আমাদের।’

‘হ্যাঁ, যার-যার মাল সহ।’ লাইন কেটে দিল লারিসা।

সেলফোনটার ফ্ল্যাপ বন্ধ করে পকেটে ভরে রাখল রানা, হাতের কাজে মন দিল। ওর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে, মাটিতে বসে আছে ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। টেলিফোনের কথোপকথন শেষ হতেই আতঙ্ক ফুটল তার চোখে।

জিঙ্কস করল, ‘দু’ঘণ্টা পর আসছে ওরা?’

‘না, আরও আগেই আসবে,’ বলল রানা। ‘আমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দু’ঘণ্টার কথা বলেছে। আগে এসে ফাঁদ পাততে চাইছে।’

‘নিশ্চয়ই কল্পনাও করেনি, আপনি কোথেকে কথা বলছেন?’

‘না,’ মুচকি হাসল রানা। জেলে রাখা টর্চলাইটের আলোয় চোখ বোলাল গির্জার অভ্যন্তরে, একটু আগেই এখানে পৌঁছেছে ও বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে। ফোন করেছে প্রার্থনাকক্ষের ভিতরে বসে। গির্জাটা মাঝারি আকারের, প্রার্থনাকক্ষটা তুলনামূলকভাবে বড়। দেয়াল, পিলার, ছাদ—সব আজও মজবুত। অক্ষত রয়েছে পাথরের তৈরি বেদিটাও, ওখান থেকে পাদ্রীরা প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। তবে পুরনো আমলের বেঞ্চ-টেঞ্চ যা ছিল, সব ভেঙেচুরে কয়েকটা স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝেতে। এমনি একটা স্তূপের ভিতর ফায়ারক্র্যাকার বসাচ্ছে রানা, ওগুলোর কানেকশন দিচ্ছে একটা হাতে-বানানো রিমোট কন্ট্রোল ডিটোনেটরের সঙ্গে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে রানার কাজ দেখছে সিদ্দিকী। জিঙ্কস করল, ‘কী করছেন, জানতে পারি?’

‘সময় হলে দেখতেই পাবেন।’ কাজ শেষ হয়েছে রানার, উঠে দাঁড়াল। ‘চলুন, হাতে সময় কম।’

বেদির পিছনে ওকে নিয়ে গেল সিদ্দিকী। মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন হিসেব করল, তারপর গোড়ালি ঠুকল একটা টালির উপরে। বলল, ‘এটা সরাতে হবে।’

ছুরি বের করে টালির কিনারে চাড় দিল রানা, সহজেই উঠে এল ওটা। নীচে একটা খোপ দেখা গেল, তাতে প্লাস্টিকে মোড়া এক বাগিল কাগজ দেখা গেল। ওগুলো বের করল ও, মোড়ক সরিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। নানা রকম বৈজ্ঞানিক সূত্রে ভরা

সবকটা পাতা, কিছু বোঝা গেল না।

‘এগুলোই সব?’ জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সিদ্দিকী। ‘দেখতেই তো পাচ্ছেন।’

‘হুম!’ টালিটা আবার জায়গামত নিয়ে বসিয়ে দিল রানা।
‘টানেলটা কোথায়?’

বেদির পিছনে দেয়াল ঘেঁষে আরেকটা জায়গা দেখাল সিদ্দিকী। ওখানকার কয়েকটা টালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা সুড়ঙ্গের মুখ—গির্জায় গোপনে ঢোকা আর বেরুনোর জন্য খুঁড়ে রেখেছে বিজ্ঞানী। সুড়ঙ্গের অন্যপাশটা বেরিয়েছে গির্জার পিছনদিকে... পাহাড়ি ঢালে, গাছগাছালির আড়ালে। আলো ফেলে পথটা দেখল রানা—হামাগুড়ি দিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। সম্ভ্রষ্ট হয়ে বিজ্ঞানীকে নিয়ে বেদির আড়ালে গিয়ে বসল ও, নিভিয়ে দিল টর্চটা। নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল গির্জার অভ্যন্তরটাকে।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল, তারপর মুখ খুলল সিদ্দিকী।

‘মি. রানা...’

‘বলুন।’

‘আপনি কি সত্যিই মেজর মরগানের হাতে তুলে দেবেন আমাকে?’

‘কেন, সন্দেহ আছে?’

‘ও... ও আমাকে মেরে ফেলবে!’

‘সেটা আরও আগেই ভাবা উচিত ছিল আপনার—আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার আগে... আমার বন্ধুদেরকে, আমার প্রিয় মানুষদের খুন করবার আগে। এখন আপনার কপালে কী ঘটল না-ঘটল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কোন দুঃখে?’

‘প্লিজ! আ... আমি মস্ত ভুল করেছি! একটা সুযোগ দিন আমাকে... বাঁচতে দিন... আমি সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব...’

ফুঁপিয়ে উঠল বিজ্ঞানী ।

‘মায়াকান্না বন্ধ করুন!’ বিরক্ত গলায় ধমক দিল রানা ।
‘আপনাকে ওদের হাতে তুলে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার ।’

‘তারমানে... তারমানে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন?’

‘না, ডক্টর । ক্ষমা আপনি পাবেন না । আপনাকে আমি ওদের হাতে তুলে দেব না অন্য কারণে । ফর্মুলা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু ওগুলো যে কাজ করবে, তার গ্যারান্টি পাইনি । কোথাও কোনও গলদ হলে সেটা সামাল দেবার জন্যই আপনাকে আমার দরকার ।’

‘ক্... কিন্তু আমাকে বাঁচাবেন কীভাবে আপনি? মেজর মরগান বোকা নয়, যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে আসবে ও । ওকে ধোঁকা দিতে পারবেন না । তা ছাড়া আমাকে দিয়ে ফোন করিয়ে ডবল বিপদ ডেকে এনেছেন আপনি...’

‘মাথা ঠাণ্ডা রাখুন । সবকিছু জানবার প্রয়োজন নেই আপনার ।
ঝামেলা বাধলে স্রেফ মেঝেতে শুয়ে পড়বেন, ঠিক আছে? বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন ।’

‘মেঝেতে শুয়ে পড়ব!’ বিস্ময় ফুটল বিজ্ঞানীর কণ্ঠে ।

‘হ্যাঁ, তা হলে গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা কমে যাবে ।’

আরও কিছু জিজ্ঞেস করবার চেষ্টা করল সিদ্ধিকী, কিন্তু জবাব দিল না রানা । মৃদু ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল তাকে । এ-মুহূর্তে নীরবতা প্রয়োজন ।

গুরু হলো অপেক্ষার পালা ।

একুশ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন হলো না, বিশ মিনিটের মাথায় সচকিত হয়ে উঠল রানা—ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কয়েকটা গাড়ি আসছে গির্জার দিকে। বেদির আড়াল থেকে বেরিয়ে উঁকি দিল জানালা দিয়ে, তিন জোড়া হেডলাইট দেখতে পেল। ভুরু কঁচকাল ও, ছিল কোথায় ডাইনিটা? এত তাড়াতাড়ি পৌঁছুল কী করে? বেশি আগেই এসে পড়ছে না? একটু উদ্ভিগ্ন বোধ করল: প্ল্যানটা কাজে লাগবে তো! বুঝতে পারছে, কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

আগের জায়গায় আবার ফিরে এল ও। সিদ্ধিকী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ‘এসে গেছে ওরা, না?’

শান্ত গলায় রানা বলল, ‘হ্যাঁ। রেডি থাকুন। আমার কথামত কাজ করবেন, ঠিক আছে? আর ওই যে বললাম... গোলমাল শুরু হলেই শুয়ে পড়বেন মেঝেতে।’

‘ওহ্ গড!’

গির্জার সামনে এসে থামল গাড়ি তিনটে। ঝটপট ওগুলো থেকে নামল বারোজন সৈনিক, পুরোদস্তুর ব্যাটল গিয়ার পরে আছে সবাই। মেজর লারিসা ওরফে ব্ল্যাক উইডোর হাঁকডাক শোনা গেল, পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখে সুরক্ষিত করবার নির্দেশ দিচ্ছে। একটু পরেই বুটের শব্দ তুলে প্রার্থনাকক্ষে ঢুকল কয়েকজন। তল্লাশি শুরু করল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর গলা চড়িয়ে

বলল, ‘যে-যেখানে আছ, ওখানেই স্থির হয়ে যাও, বাছারা! আর এগোবার চেষ্টা করো না।’

থমকে গেল লোকগুলো। কী করবে, বুঝতে পারছে না।

‘তোমাদের মক্ষিরানী আছে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘না থাকলে ডেকে নিয়ে এসো। তল্লাশি-টল্লাশিতে সময় নষ্ট করো না, আমার হাতে সময় কম।’

ছুটে বেরিয়ে গেল একজন। একটু পরেই দলের সবাইকে নিয়ে প্রার্থনাকক্ষে উদয় হলো মেজর। চেষ্টা করে বলল, ‘রানা! কোথায় তুমি?’

বেদির আড়াল থেকে মুখে হাসি ফুটিয়ে বেরিয়ে এল রানা। প্রার্থনামঞ্চে দাঁড়াল নায়কের ভঙ্গিতে। দ্রুত দেখে নিল প্রতিপক্ষকে। সৈনিকদের সবার হাতে ফ্ল্যাশলাইট আছে, সেই আলোয় মোট তেরোজন মানুষ দেখা গেল—মেজর লারিসা, আর তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী সেই বক্সার রয়েছে সবার সামনে।

‘নাইস টু সি ইউ এগেইন,’ বলল রানা। ‘বিশেষ করে অ্যাভুনি... তোমাকে দেখে। ইলেকট্রিক শকে তোমার ঘিলু কতটা ফ্রাই হয়েছে, তা জানার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছি আমি।’

চেহারায় হিংস্রতা ফোটাল বক্সার। ‘নাগালে এসো, তারপর টের পাবে। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে, মিস্টার!’

‘তোমার সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছে আমারও আছে, অ্যাভুনি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিকুয়েন্স পারমিট করছে না।’

‘তোমার বোলচাল বন্ধ করো, রানা!’ চেষ্টা করে উঠল লারিসা। ‘সিদ্ধিকী কোথায়?’

‘এখনও পৌঁছায়নি,’ হালকা সুরে বলল রানা। ‘তুমি তো দু’ঘণ্টা পরে আসবে বলেছিলে।’ জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ও। ‘খু-উ-ব খারাপ, আমাকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি।’

‘তুমি দাওনি?’ পাল্টা অভিযোগ করল লারিসা। ‘আমাদের আগেই তো এসে বসে আছ!’

‘বাজে একটা অভ্যাস বলতে পারো—সুন্দরী কোনও মেয়ের সঙ্গে ডেইট থাকলে অস্থির হয়ে পড়ি।’ আগেভাগেই রওনা হয়ে যাই, যাতে কিছুতেই দেরি করে না ফেলি।’

‘যথেষ্ট হয়েছে!’ খ্যাপাটে ভঙ্গিতে বলল লারিসা। ‘তোমার এসব ফালতু কথা শোনার মুড নেই আমার, রানা। সিদ্দিকীকে হাজির করো, নইলে ডিলটা এখানেই খতম।’

‘বড্ড বেরসিক তুমি!’ গলায় কপট অভিমান ফোটাল রানা।

‘রানা!’

‘আচ্ছা, আচ্ছা! খবর দিচ্ছি ওকে। কিন্তু তার আগে সোহানাকে দেখতে চাই আমি।’

পিছন ফিরে ইশারা করল লারিসা। দুজন সৈনিক বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফিরে এল সোহানাকে নিয়ে। ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল রানা—চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে রক্ত গড়াচ্ছে, হাঁটতেও পারছে না ঠিকমত, হাতদুটো বেঁধে রাখা হয়েছে শরীরের সামনে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রানার। লারিসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী করেছ তুমি ওকে নিয়ে?’

‘নাথিং সিরিয়াস,’ তচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ব্ল্যাক উইডো। ‘টোকা দিতে মানা করেছিলে তো, তাই একটু দিয়ে দেখলাম কী হয়।’

‘কাজটা ঠিক করোনি।’

‘মেরে ফেলিনি সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যাক ওসব, এবার সিদ্দিকীকে হাজির করো, রানা। নইলে সোহানার সঙ্গে এটাই তোমার শেষ দেখা।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। বেদির পিছন থেকে কলার ধরে টেনে

তুলল বিজ্ঞানীকে, সামনে নিয়ে এল। লোকটাকে বর্মের মত করে ধরল ও, এক হাতে শোলডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল সিগ-সাওয়ার। বলল, ‘সম্ভ্রষ্ট, মেজর?’

ভুরু কুঁচকে গেল লারিসার। ‘তুমি কি মশকরা করছ, রানা? এ-লোক ড. আন্দালিব সিদ্দিকী নয়!’

‘চোখে ধাঁধা লেগেছে তোমার, মেজর।’ ভাল করে দেখো, এ-ই সিদ্দিকী। শুধু নাম-পরিচয় না, শরীরের গঠনও পাল্টে ফেলেছে।’

‘ইম্পসিবল! এ সিদ্দিকী হতেই পারে না!’

সিগ-সাওয়ার দিয়ে বিজ্ঞানীর পিঠে খোঁচা মারল রানা। ‘কথা বলুন, ডক্টর। মেজরের ভুল ভাঙিয়ে দিন।’

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সিদ্দিকী। তারপর বলল, ‘হাই, মেজর মরগান! আপনার বেড়ালদুটো কেমন আছে? কী যেন নাম... মিমি আর মিসি, তাই না?’

চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে লারিসার। কোনোমতে বলল, ‘হা যিশু! সিদ্দিকীই তো! ক্... কিন্তু কীভাবে...’

‘ইচ্ছাশক্তি, এবং কঠোর পরিশ্রম,’ বলল রানা। ‘ডক্টরের কাছ থেকে ভাল ভাল অনেক জিনিস শিখতে পারবে তুমি। যদি চাও আর কী! এনিওয়ে... এবার সোহানাকে পাঠাও।’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল লারিসা। ‘সেটি হচ্ছে না। আগে সিদ্দিকী, তারপর সোহানা।’

‘অন্যায় আবদার করছ। এমনতেই একগাদা লোক নিয়ে এসেছ, আমি একা। তারওপর আবার সিদ্দিকীকেও আগে চাইছ? এটা ঠিক না।’

‘কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, রানা। পাঠাও ওকে।’

‘এসো, সমঝোতা করি। একসঙ্গে অদল-বদল হোক, ওদিক থেকে তুমি সোহানাকে ছাড়ো, এদিক থেকে আমি সিদ্দিকীকে।’

কী বলো?’

কাঁধ ঝাঁকাল ব্ল্যাক উইডো। ‘ঠিক আছে।’ ইশারা করল সে।

সোহানাকে ছেড়ে দিল দুই সৈনিক, টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল ও। রানাও ড. সিদ্দিকীকে ছেড়ে দিয়ে পজিশন নিল বেদির আড়ালে। ধীর পায়ে পরস্পরকে অতিক্রম করল দুই বন্দি, খানিক পরেই পৌঁছে গেল যার যার গন্তব্যে। সোহানাকে টান দিয়ে বেদির পিছনে নিয়ে এল রানা। সিদ্দিকীকে ঘিরে ফেলল আমেরিকান সৈনিকরা।

‘ওর সমস্ত বার্থমার্ক চেক করো,’ নির্দেশ দিল লারিসা। ‘শিওর হও—সত্যিই সিদ্দিকী, নাকি অন্য কেউ আমার বেড়ালের নাম জেনে ধোঁকা দিতে এসেছে।’

রানাও সোহানাকে পরীক্ষা করছে। খুব দুর্বল দেখাচ্ছে ওকে। নার্স সম্ভবত সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, পরিস্থিতির ধকল সামলাতে পারছে না বেচারি। কেঁপে উঠছে বার বার।

‘রিল্যাক্স!’ নরম সুরে বলল রানা। ‘সব ঠিক হয়ে যাবে...’

‘কিছুই ঠিক হবে না, রানা,’ ভয়ানক কণ্ঠে বলল সোহানা। ‘এখন কী ঘটবে, জানো না তুমি? আমাদের সবাইকে খুন করে রেখে যাবে ওরা!’

ওর আশঙ্কাটাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন জোরে হেসে উঠল লারিসা। বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। জেনুইন সিদ্দিকীকেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছ তুমি। এর পুরস্কার দেব তোমাকে... সিদ্দিকীর সঙ্গী করে পরপারে পাঠিয়ে!’

‘আমাদের চুক্তিটা এমন ছিল না,’ রাগী গলায় বলল রানা।

‘চুক্তির শর্ত আমি একটু পাল্টে ফেলেছি। দুঃখিত, তোমাদের কাউকে জ্যান্ত ছাড়তে পারব না আমি। বেরিয়ে এসো, মরার আগে অন্তত একটা আনন্দ নিয়ে যাও। তোমার জানের শত্রু সিদ্দিকীকে তোমার চোখের সামনে গুলি করব আমি।’

দৃষ্টিতে আতঙ্ক ফুটল বিজ্ঞানীর, চেহারা বিকৃত হয়ে গেল।
হাঁটু গেড়ে অনুনয় করল সে, ‘প্লিজ মেজর...’

‘উঁহু, তোমার কোনও কথা শুনছি না আমি,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল লারিসা। ‘রানা, বেরুচ্ছ নাকি? আমি কিন্তু গুলি করতে যাচ্ছি!’ পিস্তল বের করে বিজ্ঞানীর দিকে তাক করল সে।

দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়াল রানা, পরিকল্পনাটা মাঠেই মারা পড়ছে বোধহয়। পকেটের ভিতর রিমোটটা আঁকড়ে ধরল ও, এটা এখনি ব্যবহার করতে হবে, আর উপায় নেই। বেদির আড়াল থেকে উঁকি দিতেই দেখল, এগিয়ে গিয়ে সিদ্দিকীর খুলিতে পিস্তল ঠেকিয়েছে ব্ল্যাক উইডো, এখনি গুলি করবে।

‘গুডবাই, ড. সিদ্দিকী!’

কাঁপছে বিজ্ঞানী, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। পকেট থেকে রিমোটটা বের করল রানা। বোতামে চাপ দিতে যাবে, ঠিক এই সময় শোনা গেল একটা গমগমে কণ্ঠ।

‘পিস্তলটা সরিয়ে নিলে ভাল করবে, ম্যা’ম। নইলে ড. সিদ্দিকীর সঙ্গী তুমিও হতে যাচ্ছ।’

থমকে গেল লারিসা, চোখে বিস্ময় ফুটল তার। চমকে গেছে তার সঙ্গীরাও। সবগুলো টর্চ ঘুরে গেল কণ্ঠটার উৎসের দিকে। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দীর্ঘদেহী মানুষকে দেখতে পেল ওরা, একটা উজ্জি সাবমেশিনগান তাক করে রেখেছে জটলাটার দিকে।

‘হ্যালো, মেজর!’ বলল লোকটা। ‘দুঃখিত, তোমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে হচ্ছে বলে।’

চমকটা সামলাতে পারছে না লারিসা। খ্যাপাটে গলায় বলল, ‘হোয়াট দ্য হেল... কে তুমি?’

‘আমার পরিচয় জেনে কাজ নেই তোমার,’ ইয়োরোপিয়ান উচ্চারণে বলল লোকটা। ‘পিস্তলটা সরাও, নইলে ঝাঁঝরা হয়ে

যাবে।’

‘ঝাঁঝরা!’ বোকা বোকা কণ্ঠে বলল লারিসা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল—এই লোক একা নয়, সঙ্গীসাথী নিয়ে এসেছে। ঝট করে আশপাশে তাকাতেই দেখল, ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচার, ময়লার স্তূপ, আর পিলারের আড়াল থেকে উদয় হয়েছে বেশ ক’জন অস্ত্রধারী লোক, সবার হাতে উজি... তাক করে রেখেছে তার দলের দিকে। অন্ধকার, সেই সঙ্গে রানার সঙ্গে ওর বাতচিতির সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে এরা; কোন্ ফাঁকে যেন গির্জার ভাঙা জানালা গলে ঢুকে পড়েছে ভিতরে, ওদের অজান্তে পজিশন নিয়ে ফেলেছে।

‘পিস্তল নামাও, মেজর,’ আবার বলল দীর্ঘদেহী লোকটা। ‘শেষবারের মত বলছি আমি!’

বিজ্ঞানীর মাথা থেকে অস্ত্রটা সরিয়ে নিল লারিসা, ইশারায় নিজের লোকজনকে শান্ত থাকতে নির্দেশ দিল, তারপর তাকাল নবাগতের দিকে। বলল, ‘আমি জানি, তোমরা কারা। সিদ্ধিকীর ফর্মুলা কেনার জন্যে তোমরাই তো টাকা ঢেলেছিলে, ওকে উদ্ধারের জন্যে বেইলি’জ রিজে হামলা চালিয়েছিলে, তাই না? এখানে পৌঁছুলে কী করে?’

‘ড. সিদ্ধিকী মত পাল্টেছে। তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ধরা দিতে রাজি হয়েছে। ফোন করে ও-ই খবর দিয়েছে আমাদেরকে।’

ভুরু কুঁচকে বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল লারিসা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল চেহারাটা। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল আসল ঘটনা। বলল, ‘সিদ্ধিকী না, তোমাদেরকে আসলে ডেকে এনেছে আরেকজন। ঠিক বলেছি, রানা?’

বেদির পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘কী করব? তোমার কাছে যেহেতু আমাদের প্রাণের কোনও

মূল্য নেই, তাই ওদেরকে ডাকতেই হলো।’

গাল দিয়ে উঠল লারিসা, কৌশলটা ধরতে পেরেছে। সিদ্দিকীকে জ্যাস্ত চায় টেরোরিস্টরা, কিছুতেই লোকটাকে খুন হতে দেবে না, আমেরিকানদের বাধা দেবে—জানত রানা। নিজে, সোহানাকে আর বিজ্ঞানীকে বাঁচাতে তাই খবর দিয়ে এনেছে এদের। চমৎকার টেকনিক খাটিয়েছে বটে বাঙালিটা, ওরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ভিতরে-ডেকে পাঠিয়েছে, বাইরের দিক ঘিরে ফেলতে দেয়নি। এখানে ঢোকার পরও নানা রকম কথাবার্তা বলে ওদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, যাতে চুপিসারে দ্বিতীয় দলটা ঢুকতে পারে গির্জাতে, ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। ইচ্ছেমত ওকে খেলিয়েছে রানা, লারিসা কিছুই বুঝতে পারেনি।

‘কে খবর দিল না দিল, তাতে কিছু যায়-আসে না,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল টেরোরিস্ট দলের নেতা। ‘ড্রপ দ্য আর্মস্, মেজর। তারপর ড. সিদ্দিকীকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।’

‘ইম্পসিবল!’ হিসিয়ে উঠল লারিসা। ‘দুনিয়া উল্টে গেলেও সিদ্দিকীকে পাবে না তোমরা!’

‘দুনিয়া উল্টানোর প্রয়োজন নেই, তোমাদেরকে খতম করেই ওকে কেড়ে নিতে পারি আমরা। আমাদের আগের গ্রুপটার সঙ্গে তুমি যা করেছ, তাতে এমনিতেই হাত নিশাপিশ করছে আমার।’

‘কেড়ে নেবে? হাহ্, সিদ্দিকীকে যদি এখুনি গুলি করে দিই?’ ঝট করে পিস্তল তুলে আবার বিজ্ঞানীর দিকে তাক করল লারিসা। তার সঙ্গীরাও অস্ত্র তাক করল টেরোরিস্টদের দিকে।

‘বোকামি কোরো না, মেজর,’ শান্ত গলায় বলল দীর্ঘদেহী লোকটা। ‘খামোকা রক্ত ঝরিয়ে কারও কোনও লাভ হবে না।’

‘সেক্ষেত্রে কেটে পড়ো এখুনি,’ বলল লারিসা। ‘বলা যায় না, তোমাদেরকে হয়তো মাফ করে দিতে পারি আমি।’

প্রত্যুত্তর দিল না টেরোরিস্টদের নেতা। গরম চোখে তাকিয়ে

এইল আমেরিকান মেজরের দিকে। লারিসার চোখ দিয়েও আগুন ঝরছে। দুই দলের সবাই অস্ত্র তাক করে রেখেছে পরস্পরের দিকে। দমবন্ধ করা একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে গির্জার ভিতর।

শান্তচোখে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করল রানা, রিমোট ধরা হাতটা শরীরের পিছনে রেখেছে ও। একটু অপেক্ষা করল, থমথমে নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতেই টিপে দিল বোতামটা।

সঙ্গে সঙ্গে ফাটল লুকিয়ে রাখা ফায়ারক্র্যাকারগুলো। এমনভাবে শব্দ হলো, যেন গুলি ছোঁড়া হয়েছে। বিস্ফোরণোন্মুক্ত পরিস্থিতিটাকে চরমে নিয়ে যেতে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল। কে গুলি করেছে... আদৌ গুলি করেছে কি না... এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ; বাজি-পটকার আওয়াজ শুনেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল সবার, নিজের অজান্তেই ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল।

গুলিবর্ষণের আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো গির্জা। চোখের সামনে দু'পক্ষেরই কয়েকজনকে ঘায়েল হতে দেখল রানা, ছিটকে পড়ে গেল লোকগুলো। অন্যরাও ঝাঁপ দিল মেঝেতে, ক্রল করে কাভার খুঁজে নিচ্ছে লড়াই চালাবার জন্য। এক পলকের জন্য ড. সিদ্দিকীকে দেখতে পেল রানা, ওর কথামত গুয়ে পড়েছে মেঝেতে। পরমুহূর্তে সমস্ত টর্চলাইট নিভিয়ে ফেলল সৈনিকরা, অন্ধকার ছেয়ে ফেলল প্রার্থনাকক্ষকে। থেকে থেকে শুধু ঝলসে উঠছে মাজলফ্ল্যাশ।

বেদির পিছনে রানাও ঝাঁপ দিয়েছে। সোহানার হাতে সিগ-সাওয়ারটা গুঁজে দিল ও, টালি সরিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বের করল। বলল, 'এখান দিয়ে বেরিয়ে যাও। গাছপালার ভিতরে আমাদের গাড়িটা দেখতে পাবে। ওটায় উঠে অপেক্ষা করো, আমার জন্য।'।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সোহানা।

‘সিদ্ধিকীকে আনতে। ওকে দরকার আমাদের।’ প্লাস্টিক মোড়া কাগজগুলো ওর হাতে তুলে দিল রানা। ‘এখানে ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা আছে, নিয়ে যাও। আমি যদি ফিরতে না পারি...’

‘তোমাকে ফেলে যাব না আমি,’ সোজাসাপ্টা ভাষায় জানাল সোহানা।

‘যেতে হবে তোমাকে!’ ধমকের সুরে বলল রানা।

‘না, রানা,’ সোহানার কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত। ‘এখানে রীতিমত যুদ্ধ চলছে। তোমার ব্যাকআপ প্রয়োজন।’

মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল রানা। বুঝতে পারছে, জোরাজুরি করে লাভ হবে না। কিছুতেই পাঠানো যাবে না সোহানাকে, মাঝখান থেকে সময় নষ্ট। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও। বলল, ‘ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট থাকতে পারো। কিন্তু কথা দাও, এরপর তুমি বেরিয়ে যাবে এখান থেকে।’

‘আর তুমি?’

‘পাঁচ মিনিটে যদি ফিরতে না পারি, তা হলে আর ফেরা হবে না আমার। ব্যাকআপ যদি প্রয়োজন হয়, ওই সময়ের ভিতরেই হবে।’

‘না-ই বা গেলে তা হলে! ফর্মুলা পেয়ে গেছ, এখন আর সিদ্ধিকীকে দরকার কী?’

‘দরকার আছে। ভয়ানক ধূর্ত লোক, ফর্মুলায় যদি কাজ না হয়, ওকে আবার প্রয়োজন হবে আমাদের।’

সোহানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না রানা, ক্রল করে নেমে গেল প্রার্থনামঞ্চ থেকে। বিরতিহীনভাবে চলছে গোলাগুলি, আমেরিকান টিম আর টেরোরিস্টরা পরস্পরকে ঘায়েল করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ডানদিক থেকে একটা আতঁচিংকার শুনতে পেল ও—একজন পটল তুলল বোধহয়।

মাথা নুইয়ে এগিয়ে চলল রানা, গির্জার ভিতরটা চিনে রেখেছে আগেই, অন্ধকারে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। ড. সিদ্দিকীকে যেখানটায় শুয়ে পড়তে দেখেছিল, সেখানে পৌঁছে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই। ব্ল্যাক উইডো আর ওর সঙ্গীরা কাভার নিয়েছে আশপাশে, বিজ্ঞানীও সরে গেছে কোথায় যেন।

‘ডক্টর!’ গোলাগুলির মাঝে চাঁপা গলায় ডাকল রানা। জবাব পাওয়া গেল না। তল্লাশি চালাবার ভঙ্গিতে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে শুরু করল ও, সিদ্দিকীকে পাবার আশায়। হঠাৎ হাতে ঠেকল কী যেন। জিনিসটা চোখের সামনে তুলে আনল ও—ছেঁড়া দড়ি। এটা দিয়েই বিজ্ঞানীর হাত বেঁধেছিল। লোকটা নিশ্চয়ই ভাঙাচোরা কোনও ফার্নিচারের সঙ্গে ঘষে খুলে ফেলেছে। খুলেছে ভাল কথা, কিন্তু গেল কোথায়?

জবাবটা আন্দাজ করতে পারল রানা সঙ্গে সঙ্গে। পালাচ্ছে সিদ্দিকী, নিশ্চয়ই সুডঙ্গটার দিকে গেছে... সোহানার দিকে! তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল ও, ফিরে চলল প্রার্থনামঞ্চের দিকে।

হঠাৎ সামনে এক জোড়া পা দেখতে পেল রানা। পাশ কাটাবার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটা হামাগুড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছে। গোড়ালি ঘষার আওয়াজে রানা বুঝতে পারল, ওর দিকে ঘুরছে প্রতিপক্ষ... পরমুহূর্তে গর্জে উঠল সাবমেশিনগান!

গড়ান দিয়েছে রানা আগেই, ঠিক মুখের সামনে মেঝেতে কামড় বসাল বুলেট। উড়তে থাকা ধুলো নাকে-মুখে ঢোকায় কাশতে শুরু করল ও। আবার গুলি করতে চাইল লোকটা, কিন্তু মাজল-ফ্ল্যাশ দেখে তার প্রতিপক্ষ গুলি করতে শুরু করেছে, বাধ্য হয়ে বসে পড়তে হলো তাকে। সুযোগটা নষ্ট করল না রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল বামপাশের দেয়ালের দিকে, ওখানে একসারিতে অনেকগুলো পিলার আছে, ওগুলোর পিছনে কাভার

নিতে পারবে।

ছুটন্ত রানার পিছনে গর্জে উঠল কয়েকটা সাবমেশিনগান, ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে। তবে অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পারল না গুটাররা, ঐকেবেঁকে গুলির ধারা ফাঁকি দিল রানা, সামনে দুটো পিলার দেখতে পেয়েই ডাইভ দিল, পিলারের সারি পেরিয়ে গেল—বিল্ডিংয়ের দেয়াল আর সারিবদ্ধ পিলারের মাঝখানে ওখানটায় চওড়া একটা প্যাসেজ সৃষ্টি হয়েছে।

সোজা হতেই আঁতকে উঠল রানা, ওর ঠিক কয়েক ফুট দূরেই একটা বিশালদেহী ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছে—অ্যাঙ্কনি... সেই বক্সার! ছোট্ট একটা লাইট জ্বলে ওর মুখের উপর আলো ফেলল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্ধূর হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, ‘বেশ, বেশ! মাসুদ রানা! তোমাকেই তো খুঁজছিলাম।’

বাইশ .

বাধা দেয়ার সময় পেল না রানা, তার আগেই সজোরে লাথি হাঁকাল অ্যাঙ্কনি। পেটের পাশে তীব্র সেই আঘাতে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, গুঙিয়ে উঠল, গড়িয়ে চলে গেল কিছুদূর। হিংস্র ভঙ্গিতে ওর দিকে এগোতে এগোতে বক্সার বলল, ‘আমাদেরকে ধাপ্পা দেয়ার শাস্তি পেতে হবে তোমাকে এখন, রানা!’

কোনোমতে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ব্যথাবোধটা দূর করবার চেষ্টা করল রানা, তাকাল প্রতিপক্ষের দিকে। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে। তবে এ-মুহূর্তে

বলপ্রয়োগের বিষয়ে মোটেই আগ্রহী মনে হচ্ছে না অ্যাভুনিকে। হাত থেকে ছোট্ট টর্চটা ফেলে দিল সে; মেঝে থেকে ছড়িয়ে পড়া ম্লান আলোয় তাকে হাতের সাবমেশিনগান তুলতে দেখল রানা, গুলি করেই খতম করতে চায় শত্রুকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার শরীরে, মেঝে থেকেই চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল অ্যাভুনির দিকে। শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল বস্কার, কিন্তু তার আগেই গায়ের উপর এসে পড়ল রানা, মুঠো করে ধরে ফেলল সাবমেশিনগানের ব্যারেলটা। অ্যাভুনি আশা করল, টান দিয়ে ওটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে, কিন্তু তা না করে সাবমেশিনগানটা সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। তাল হারিয়ে ফেলল বস্কার, পড়ে গেল পিছনদিকে, হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্র। হয় ডিগবাজি খেত সে, নাইয় তার ঘাড় মটকে যেত; কিন্তু দুটোর কোনোটাই ঘটল না। শেষ মুহূর্তে কনুই দুটো মেঝেতে বাধিয়ে দিয়ে পতনটা যতটুকু পারল সামলাল।

মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, সাবমেশিনগানটা তুলে নিল। ওটা ভূপাতিত শত্রুর দিকে ঘোরাতে চাইল ও, কিন্তু পারল না। অ্যাভুনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰ, চোখের পলকে সিধে হলো সে, হাতদুটো বিদ্যুৎ গতিতে বাড়িয়ে দিল রানার গলার দিকে। ধস্তাধস্তির মধ্যে পিছিয়ে গেল রানা, পিঠ ঠেকল গির্জার দেয়ালে গিয়ে। দুটো শরীরের মাঝখানে পড়ে গেছে সাবমেশিনগান ধরা হাতটা, কাজেই গুলি করার কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। ইস্পাতের মত শক্ত দুটো হাত ওর গলা টিপে ধরেছে। হাঁসফাঁস করতে শুরু করল ও, দম নিতে পারছে না। অসুরের শক্তি অ্যাভুনির গায়ে, রানা তার সাথে পেরে উঠছে না। দেয়ালের উপর পিষ্ট হচ্ছে শরীর, অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করছে প্রতিটি স্নায়ু। একটু অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, কিন্তু সরবরাহ নেই। বিকৃত হয়ে উঠল ওর

চেহারা ।

শত্রুর কোন আশা নেই, নেতিয়ে পড়েছে সে, আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না বুঝতে পেরে সাবমেশিনগানের ব্যাপারে মাথা ঘামাল না বন্ধার । রানার গলার ওপর হাতের চাপ আরও বাড়াল সে । আবছা আলোয় চোখের সামনে দেখতে পেল, শত্রুর মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে ।

ধস্তাধস্তি না করে শরীরটাকে একটু ঢিল করে দিল রানা, কিন্তু সাবমেশিনগানটা দুই শরীরের মাঝখানে সামান্য যেটুকু আটকে আছে বের করার জন্যে টানাটানি শুরু করল । কয়েক সেকেন্ডে চেষ্টা করার পর সফল হলো বটে, কিন্তু এখনও সেটা ব্যবহার করার সুযোগ হলো না । অ্যান্ড্রুনি যেভাবে টিপে ধরেছে গলা, তাতে হাঁসফাঁস অবস্থা রানার, মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছে; কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে । হঠাৎ মুক্ত সাবমেশিনগানটা রানার হাতে দেখতে পেয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল বন্ধারের । রানার গলা থেকে ডান হাতটা নামিয়ে ছোঁ দিল সেটা ধরার জন্যে । মুঠোর ভেতর একবার নিতে পারলে রানার সাধ্য নেই নিজের দখলে রাখে ওটা । ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত থেকে সেটা ছেড়ে দিল ও । মেঝেতে খটাস শব্দে আছড়ে পড়ল অস্ত্রটা ।

সাবমেশিনগানটা কেড়ে নিতে না পেরে রাগে অন্ধ হয়ে গেল অ্যান্ড্রুনি । হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা উপরে তুলল সে, তারপর বুটটা সজোরে নামিয়ে দিল রানার পায়ের উপর । তীব্র ব্যথাটা ইলেকট্রিক শকের মত ছড়িয়ে পড়ল রানার সারা শরীরে । সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠল ও । ডান হাত তুলে লোকটার মাথার চুল খামচে ধরল, চুলের গোছা চার আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে একপাশে টানতে শুরু করল সমস্ত শক্তি দিয়ে । মনে হলো, গোড়া থেকে উঠে আসবে ওগুলো । গলার ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ কমে

গেল, তারপর একেবারেই থাকল না। ফুসফুস ভরে পরিষ্কার বাতাস টেনে নিল রানা। জানে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নেবে শত্রু। চুল ছেড়ে দিয়ে হাতটা মুঠো পাকাল ও। তারপর বক্সারের মুখ এদিক ফিরতেই ঘুসি চালাল।

এটা আশা করেনি লোকটা। মুখ বাঁচাবার জন্যে দ্রুত পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মেঝেটা ওখানে ভেঙে উঁচু হয়ে থাকায় তাতে পা বেধে গিয়ে টালমাটাল অবস্থা হলো তার। পতনটা ঠেকাবার চেষ্টা করছে, এই সময় মাথা নিচু করে ধেয়ে এল রানা। ডান কাঁধ দিয়ে অ্যাঙ্কুরের পেটে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল ও। প্রায় উড়ে যাবার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেও হোঁচট খেল রানা।

উঠে দাঁড়াবার জন্যে হামাগুড়ি দেবার পজিশনে পৌঁছেছে, এই সময় দেখল, ফিরে এসেছে বক্সার। লাথি মারার চেষ্টা করল রানাকে। হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় থেকে তার ডান পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরল রানা, ঝটকা দিয়ে ব্যালান্স নষ্ট করে দিল লোকটার। ধপাস করে ভারী শরীর নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল অ্যাঙ্কুর, ককিয়ে উঠল ব্যথায়—পতনের ধাক্কা বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে তার।

নিজেকে সামলে নিতে এবারও বেশি সময় নিল না বক্সার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, তবে হামলা চালান না আর। লোকটার চোখে শঙ্কার মেঘ দেখল রানা। ব্যাটা ভাল করেই বুঝতে পারছে, শত্রু প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়েছে সে; এই বাঙালি যুবক আকার-আয়তনে ছোট হলে কী হবে, ফাইটার হিসেবে তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বরং কয়েক গুণ দক্ষ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল অ্যাঙ্কুর, খালি হাতের লড়াইয়ে আর গেল না, কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনল নিজের পিস্তল। গুলি করে মারবে শত্রুকে।

ঝলসে উঠল রানার হাত, গোড়ালির উপর বাঁধা এমারসন নাইফটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল ও অ্যান্ড্রিয়ার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটা তার হৃৎপিণ্ড বরাবর আমূল গেঁথে গেল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল বক্সারের, ট্রিগার চাপার চেষ্টা করল, কিন্তু একবিন্দু শক্তি পেল না আঙুলে। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল, আছাড় খাবার আগেই আজরাইল তার জান কবচ করে ফেলেছে।

সোজা হতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। গোলাগুলির শব্দ পাল্টে গেছে—এতক্ষণ একটা ছন্দ ছিল, হিসেবি ভঙ্গি ছিল... কিন্তু এখন হঠাৎ করেই যেন উন্মাদনা পেয়ে বসেছে সবাইকে। পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে সবাই, যে-যেদিকে পারে বুলেট ছুঁড়ে চলেছে। একের পর এক আতঁচিৎকার করে ঘায়েল হতে শুরু করেছে লড়াইরত মানুষগুলো।

পরমুহূর্তে নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ পেল ও... এবং বুঝে ফেলল ব্যাপারটা! ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে গির্জার ভিতর, সবাই আক্রান্ত হয়েছে তাতে। নিজেরাই নিজেদের খুন করতে শুরু করেছে আমেরিকান সৈনিক আর টেরোরিস্টরা। কিন্তু গ্যাসটা ছড়াল কীভাবে?

সত্যটা অনুধাবন করে তিক্ততায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। গির্জাটা স্রেফ সিদ্ধিকীর ফর্মুলা লুকানোর জায়গা নয়, এটা একটা ফাঁদ-ও! ফর্মুলার টোপ দেখিয়ে শত্রুদের এখানে নিয়ে আসবার প্ল্যান ছিল লোকটার আগে থেকেই, নিশ্চয়ই ভবনটার বিভিন্ন জায়গায় ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার লুকিয়ে রেখেছিল। এখন ফাটিয়ে দিয়েছে।

ভাবনাটা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করল না রানা। এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলাবার জন্য তৈরি রয়েছে ও, জ্যাকেটের ভিতর দিককার পকেট থেকে বের করে আনল একটা মিনিয়েচার

বিদ্দিং-অ্যাপারেটাস—স্বল্প সময়ের ডাইভে এগুলো ব্যবহার করে ডুবুরিরা। জিনিসটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, ফুসফুসে যাচ্ছে এখন বিশুদ্ধ বাতাস।

সোহানার কথা মনে পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল ও। গোলাগুলির প্রমত্ত ঝড় এড়িয়ে ছুটতে শুরু করল প্রার্থনামঞ্চের দিকে।

সোহানাও বিপদে পড়েছে। রানা চলে যেতেই বেদির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে নজর রাখছিল ও, হঠাৎ একটা সাবমেশিনগান গর্জে উঠল ওকে লক্ষ্য করে। বেদির পাথুরে শরীরে আঘাত হানল বুলেটগুলো, চলটা আর ধুলো ওড়াল। কাশতে কাশতে মাথা টেনে নিল সোহানা, আরেকটু হলেই লাশ হয়ে যেত।

আবার গুলি হলো। বুলেটগুলো বুক পেতে নিল প্রার্থনামঞ্চের বেদি। প্রমাদ গুনল সোহানা। মুহূর্মুহ গুলিবর্ষণ চলছে ওকে লক্ষ্য করে, তারমানে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে কেউ। এখানে পৌঁছেই খুন করবে ওকে। সিগ-সাওয়ারটা চোখের সামনে তুলে ধরল ও, হাত কাঁপছে ভীষণ, কিছুতেই স্থির থাকছে না। অচেনা শত্রু সামনে এসে দাঁড়ালে সুবিধে করতে পারবে না। আতঙ্কে বুকটা শুকিয়ে গেল ওর, কী করবে বুঝতে পারছে না।

গুলির শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শত্রু... এ-অবস্থায় হঠাৎ মনের মধ্যে জেগে উঠল বাঁচার ইচ্ছে। প্রচণ্ড সে-প্রেরণা দূর করে দিল ভয়কে, চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল সোহানা চারদিকে। বেরিয়ে যাবার সুড়ঙ্গটা পড়ল চোখে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল ও। সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল উল্টো ফিরে, গা-ঢাকা দিল।

একটু পরেই মঞ্চ পায়ের শব্দ পেল ও, ব্যারেলের উপর টর্চ বসানো একটা সাবমেশিনগান হাতে গুলি করতে করতে একজন

মানুষ এসে উঠেছে। মাথাটা একটু জাগিয়ে উঁকি দিতেই ব্ল্যাক উইডোকে চিনতে পারল। রাগে মুখটা লাল হয়ে গেছে মেজরের, রানার হাতে পরাজিত হবার জ্বালা সইতে পারছে না, উন্মাদ হয়ে গেছে প্রতিশোধ নেবার জন্য। বেদির পিছনে পৌঁছেই অবশ্য বোকা বনে গেছে সে, ওখানে আলো ফেলতেই শূন্য জায়গাটা যেন ব্যঙ্গ করতে শুরু করেছে তাকে।

‘কোথায় তোমরা, রানা?’ চেষ্টাল লারিসা। ‘বেরিয়ে এসো!’

কোমর-পর্যন্ত শরীর জাগাল সোহানা, শান্ত গলায় বলল, ‘এখানে।’

পাঁই করে ঘুরল লারিসা, গুলি করবার চেষ্টা করল, তবে সোহানা ওর চেয়ে এগিয়ে আছে। আগেই কর্মপন্থা ঠিক করে রেখেছে ও। বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরে আছে মেজর, তাই বুকে গুলি করল না, করল পায়ে। ধাঁই ধাঁই করে তিনটে বুলেট ছুটে গেল মেঝের ছ’ইঞ্চি উপর দিয়ে, ব্ল্যাক উইডোর শিনবোনে আঘাত হানল ওগুলো।

ব্যথায় চেষ্টিয়ে উঠল লারিসা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। তবে হাত থেকে সাবমেশিনগানটা ছাড়েনি। বুকে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে, অস্ত্রটা তাক করল সোহানার দিকে।

তাড়াহুড়ো করল না সোহানা, সিগ-সায়ারের নিশানা ঠিক করল শান্তভাবে, তারপর গুলি করল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল লারিসার মাথা, তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হয়েছে, খুলির পিছন দিয়ে রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। মুখ খুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল লাশটার দিকে। কাছে গিয়ে দেখল, শয়তান মহিলাটা সত্যিই মরেছে কি না। যখন নিশ্চিত হলো, অদ্ভুত একটা অবসাদ গ্রাস করল ওর শরীরকে। আর কিছু করবার শক্তি পাচ্ছে না।

চোখদুটো মুদে এল নিজের অজান্তে ।

হঠাৎ নতুন করে পায়ের শব্দ শুনতে পেল সোহানা । শরীর সাড়া দিতে চাইছে না, অনেক কষ্টে জোর করে খুলল চোখের পাতা । ড. সিদ্ধিকীকে দেখতে পেল ও, মঞ্চের পিছনদিকের একটা টালি সরিয়ে কী যেন করছে সে ।

‘কী করছেন আপনি?’ দুর্বল গলায় জানতে চাইল সোহানা ।

‘তেমন কিছু না,’ হাসল সিদ্ধিকী । ‘একটা মেকানিজম চালু করলাম । আপনি বিশ্রাম নিন, মিস সোহানা । কিছু করতে হবে না, একটু পর আপনাআপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন সব কষ্ট থেকে ।’

লোকটার হাসিটা কেমন যেন বিষাক্ত মনে হলো সোহানার কাছে, সিগ-সাওয়ারটা তুলতে চাইল, কিন্তু সাড়া পেল না হাতে । মুচকি হেসে এগিয়ে এল সিদ্ধিকী । ওর হাত থেকে নিয়ে নিল পিস্তলটা, লারিসার লাশের পাশ থেকে সারমেশিনগানটাও তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ ধরে ।

কয়েক মুহূর্ত পরই পরিচিত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ঝাপটা মারল সোহানার নাকে । চমকে উঠল ও, চিনতে পারছে গন্ধটা—সিদ্ধিকী গির্জার ভিতর ফিয়ার-গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে! সবাইকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা!

মনের গহীনে তীব্র ক্রোধ গর্জে উঠল ওর । প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে শরীরকে নড়তে বাধ্য করল । এভাবে একটা পিশাচকে পালিয়ে যেতে দেয়া যায় না । দুর্বল শরীরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল ও, ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে ।

টানেলটা সংকীর্ণ, ভিতরে কোনও আলো নেই । নিঃসীম অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে । বুক কাঁপছে সোহানার, কী যেন খামচে ধরেছে হৃৎপিণ্ডটাকে । থামল না ও, এগিয়ে চলল একটু একটু করে । অল্পক্ষণেই টানেলের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল, মুখ গলে বেরিয়ে এল আঁগাছা আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া পাহাড়ি ঢালে ।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সোহানা। দ্বিতীয় দফা ফিয়ার-গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে ও, সমস্ত নার্ভ বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে। কিন্তু হার মানল না দুঃসাহসী বাঙালি মেয়ে, ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে—সিদ্ধিকীকে খুঁজছে। টলমল পায়ে এগোতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, সামনেই গাছাগাছালির জঙ্গল, ওখানেই নিশ্চয়ই ঢুকেছে শয়তানটা।

মাত্র দশ গজ এগিয়েছে, এমন সময় বজ্রপাতের মত একটা শব্দ খান খান করে দিল পাহাড়ের নির্জনতা। কাঁধের কাছে ঘুসির মত একটা আঘাত পেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সোহানা, আছড়ে পড়ল নরম মাটিতে। আবার গুলি হলো, তবে আগাছার আড়ালে ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না আততায়ী, বুলেটগুলো বাতাসে শিস কেটে চলে যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে।

উষ্ণ তরল ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীরকে, হাত দিয়ে ক্ষতটা স্পর্শ করল সোহানা, আঙুল চটচটে হয়ে গেল ঘন রক্তে। এতক্ষণে ব্যথা অনুভব করল, বুঝতে পারল—গুলি লেগেছে ওর। চেষ্টা করেও আর চেতনা ধরে রাখতে পারল না সোহানা, নিখর হয়ে গেল ওর দেহটা।

নিহত এক সৈনিকের সাবমেশিনগান নিয়ে রানা যখন প্রার্থনামঞ্চে পৌঁছুল, তখন জায়গাটা খালি; মেজর লারিসা মরগানের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। এক্সেপ-টানেলের খোলা মুখটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর, বুঝতে পারল—ওখান দিয়েই বেরিয়ে গেছে সোহানা আর ড. সিদ্ধিকী। তাড়াতাড়ি পিছু নিল ও-ও।

সুড়ঙ্গ ধরে অর্ধেকের মত এগিয়েছে, এমন সময় কানে ভেসে এল গুলির আওয়াজ... তবে এটা গির্জার ভিতর থেকে নয়, আসছে টানেলের অন্যমুখটা দিয়ে। ক্রল করার গতি বাড়িয়ে দিল ও, কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল পাহাড়ি ঢালে।

ব্রিদিং অ্যাপারেটাসটা ফেলে দিয়ে এক ঝলকে পরিস্থিতি দেখে নিল রানা—গাছগাছালির আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে; আর ওর সামনে... কয়েক গজ দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সোহানার নিখর দেহ। অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল রানার বুক। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল ও, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সোহানার দিকে।

‘সোহানা! সোহানা!!’

জবাব পাওয়া গেল না, তাড়াতাড়ি ওকে চিত করল রানা, দেখতে পেল বুলেটের ক্ষতটা। পালস চেক করল—বেঁচে আছে সোহানা, তবে নাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। তীব্র আক্রোশে রানার ভিতরটা জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হলো ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করে এক্সুনি ওর টুটি ছিঁড়ে ফেলতে। কিন্তু সে-সময় নেই হাতে, এক্সুনি হাসপাতালে না নিতে পারলে মারা যাবে সোহানা। অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিল ও, উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলির শব্দ হলো। একপাশে ছিটকে সরে গিয়ে পরবর্তী বুলেটগুলোকে ফাঁকি দিল রানা, ছুটতে শুরু করল। একইসঙ্গে ঘুরিয়ে ফেলল হাতের সাবমেশিনগানটা, যেখানে মাজলফ্যাশ দেখা গেছে, সেদিকে পাল্টা গুলি করল।

গাছগাছালির সারি বেশি দূরে নয়, সাপ্রেসিভ ফায়ার করতে করতে ওখান পর্যন্ত খুব দ্রুত পৌঁছে গেল ও। লুকিয়ে রাখা টরাসে পৌঁছুতে সময় নিল মাত্র দু’মিনিট; ততক্ষণে ওর সাবমেশিনগানের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে। অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোহানাকে প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসাল, নিজে গিয়ে উঠল চালকের আসনে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়াল গাড়িকে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, ঠ্যাক্ ঠ্যাক্ করে রিয়ার এণ্ডে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। তবে ওখানটায় আর্মার প্লেট বসানো থাকায় গাড়ির ভিতরে ঢুকল না গুলি।

গাড়ি থেকে নেমে খুনে বিজ্ঞানীকে মোকাবেলার ঝোঁকটা বহু কষ্টে সামলাল রানা। লড়াইয়ে নামবার সময় নেই, যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছুতে হবে। অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ও, ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে এল গাছগাছালির আড়াল থেকে। ঝড়ের বেগে গির্জাটাকে অতিক্রম করল টরাস, ভিতরে গোলাগুলির শব্দ কমে এসেছে ততক্ষণে।

একটু পরেই রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। পাহাড়ি ঢালে তৈরি হয়েছে পথ—আঁকাবাঁকা; একপাশে পাহাড়ের শরীর, অন্যপাশ নেমে গেছে ঝপ্ করে... প্রায় তিনশো ফুট গভীর গিরিখাদে। রেলিং আছে অবশ্য, তবে জোরালো ক্র্যাশে ওটা টিকবে না। সাবধানে ড্রাইভ করতে হয় এ-ধরনের রাস্তায়, কিন্তু সেসব মাথায় রাখল না রানা। তীব্র গতিতে একেকটা বাঁক পেরোচ্ছে ও, একটাই চিন্তা মাথায়—সোহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

মিনিট দশেক নিরাপদেই কাটল, কিন্তু আঁকাবাঁকা পথ ফেলে মোটামুটি সরল একটা রাস্তায় পৌঁছুতেই আবার সাবমেশিনগানের গর্জন শুনতে পেল রানা। রিয়ারভিউ মিররে একটা ফোর্ড এক্সপ্রোরারকে উদয় হতে দেখল ও। মিলিটারি ভেহিকেল, মেজর লারিসার বাহন... ওটা নিয়েই ওদের ধাওয়া করছে ড. সিদ্দিকী। এখনও দূরে আছে গাড়িটা, তবে টরাসের চেয়ে ওটার গতি বেশি, মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছে ক্রমেই।

গুলি করল সিদ্দিকী, টরাসের পিছনে কামড় বসাল বুলেট, তবে এবারও আর্মার-প্লেট বাঁচাল ওদেরকে। বিজ্ঞানীর ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলো রানা, একহাতে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা, অন্যহাতে জানালা দিয়ে হাত বের করে গুলি ছুঁড়ছে... লক্ষ্যভেদ-ও করছে! কাজটা সহজ নয় মোটেই। লোকটা আসলেই জিনিয়াস! নইলে মাত্র তিন সপ্তাহের কম সময়ে ড্রাইভিং এবং ফায়ারিং এই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শঙ্কিতও বোধ করল ও। অ্যামেচারের মত লড়বে না সিদ্দিকী, নিউয়ার্ক থেকে পালাবার সময় রানা যেসব গাড়ির কৌশল খাটিয়েছিল, সব দেখেছে লোকটা... শিখে ফেলেছে। কার-ফাইটিঙে তাকে হারানো সহজ হবে না।

এই সময়ে নড়ে উঠল সোহানা। চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাল, দুর্বল গলায় জানতে চাইল, ‘কী হচ্ছে?’

‘সিদ্দিকী তাড়া করেছে আমাদেরকে, মেরে ফেলার চেষ্টা করছে,’ তিক্ত গলায় বলল রানা।

‘কেন?’ সোহানা যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

‘কারণ আমরাই ওর জীবনের শেষ ছেঁড়া সুতো। লারিসার টিম আর টেরোরিস্টদের খতম করে দিয়েছে শয়তানটা। এখন যদি আমাদেরকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তা হলে ওর পিছনে লাগার মত আর কেউ থাকে না। বাদ দাও ওসব, তুমি কেমন বোধ করছ?’

‘কী জানি!’ ঘোর লাংগা কণ্ঠে বলল সোহানা। ‘আমি সম্ভবত মারা যাচ্ছি, রানা।’

‘না!’ দৃঢ় গলায় বলল রানা। ‘মরবে না তুমি... অন্তত আজ না। মাথা নামিয়ে রাখো, গুলি যেন না লাগে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমি।’

গুটিসুটি মেরে সিটে প্রায় কুণ্ডলী পাকাল সোহানা, নীরব হয়ে গেল... সম্ভবত আবার জ্ঞান হারিয়েছে। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা, অনেক কাছে এসে গেছে সিদ্দিকীর ফোর্ড এক্সপ্লোরার। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেল না ও—পিছনের উইণ্ডশিল্ড এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল, সামনের উইণ্ডশিল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকটা। চোখের সামনে অনেকগুলো ফুটো দেখতে পেল রানা, কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো। সিদ্দিকী বুঝে ফেলেছে টরাসের

ট্রাক্টের কলাকৌশল, এখন উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে গুলি ছুঁড়ছে সে।

উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ল রানা, কিছু একটা করতে হবে এখনি, নইলে সমূহ বিপদ। ওর কাছে এখন কোনও অস্ত্র নেই, এ-অবস্থায় ওদের গাড়িটাকে যদি থামিয়ে দিতে পারে সিদ্দিকী, বাঁচার কোনও আশা থাকবে না। দ্রুত মাথা খাটিয়ে একটা প্ল্যান ঠিক করল ও, অ্যাকসেলারেটর থেকে কমিয়ে আনল চাপ। আসুক হারামজাদা, কাছে আসুক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রাসের ঠিক পিছনে এসে গেল সিদ্দিকীর ফোর্ড এক্সপ্লোরার, রিয়ারভিউ মিররে লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা—হাসছে। নির্বিকার রইল রানা, সিদ্দিকীকে পজিশন নিতে দেখল—নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউস থেকে পালাবার সময় ও যেভাবে প্রেসিশান ইমোবিলাইজেশন টেকনিক বা পিআইটি ব্যবহার করে শত্রুদের একটা গাড়িকে রাস্তার বাইরে ছিটকে ফেলেছিল, ঠিক সেভাবেই ট্রাসকেও ঘায়েল করতে চাইছে লোকটা। বাধা দিল না রানা, শুধু নিজের গাড়িকে কায়দামত এদিক-সেদিক করল, যাতে রাস্তার সামনেটা সিদ্দিকী ঠিকমত দেখতে না পায়।

চরম মুহূর্তটা এসে গেল কিছুক্ষণের ভিতর। পজিশন নেয়া হয়ে গিয়েছিল খুনে বিজ্ঞানীর, আচমকা অ্যাকসেলারেটর পুরোপুরি চেপে ধরে এক্সপ্লোরারকে আগে বাড়াল সে, ট্রাসের রিয়ার-এণ্ডের ডানপাশে গুঁতো দেবে। তবে তৈরি ছিল রানা, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল ও, ব্রেক চাপল... সেইসঙ্গে টিপে দিল ড্যাশবোর্ডে লাগানো একটা বোতাম।

দপ করে জ্বলে উঠল ট্রাসের পিছনে লাগানো হাজার পাওয়ারের ফগ-ল্যাম্পদুটো। অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ এই আলোর ঝলকানি ঝলসে দিল সিদ্দিকীর চোখ, চেষ্টা করে উঠল সে—আক্ষরিক অর্থেই সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে, কিছু

দেখতে পাচ্ছে না আর। বেচারার ব্যর্থও হয়েছে একই সঙ্গে, টরাসকে আগের পজিশন থেকে সরিয়ে ব্রেক চাপায় সংঘর্ষ ঘটতে ব্যর্থ হয়েছে এক্সপ্লোরার, তুমুল গতিতে চলে গেল রানার গাড়ির পাশ ঘেঁষে।

আবছাভাবে সামনে রাস্তার রেলিং দেখতে পেল সিদ্দিকী, স্থবির হয়ে গেল আতঙ্কে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে—টোপ ফেলে ওকে প্ররোচিত করেছে রানা, নিয়ে এসেছে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকের কাছে, মোড় ঘুরতে দেয়নি। কিন্তু বোঝাবুঝিতে লাভ নেই আর, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তুমুল বেগে রেলিংয়ের উপর আছড়ে পড়ল এক্সপ্লোরার, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল অনেকটা, অর্ধেকের মত গিয়ে আটকে গেল। বিপজ্জনকভাবে টেকিকলের মত দুলছে এখন।

ড্যাশবোর্ডে ঠোকর খেয়ে কেটে গেছে সিদ্দিকীর কপাল। সোজা হয়ে মাথা ঝাড়া দিল সে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল চারপাশে। লাফ দিয়ে নামতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু দরজা বরাবর শূন্যতা থাকায় সেটা অসম্ভব। তা ছাড়া নড়লেই কেঁপে উঠছে গোটা গাড়ি, পাহাড়ের কিনার থেকে খসে পড়তে চাইছে।

‘জানালা দিয়ে তাকাতেই রানাকে এগিয়ে আসতে দেখল সিদ্দিকী। ঠিক গাড়ির পাশে এসে থামল ও, নিজেকে আড়াল করে রেখেছে চেসিসের পিছনদিকে। চোঁচিয়ে উঠল বিজ্ঞানী, ‘আমাকে সাহায্য করুন, মি. রানা!’

‘মেশিনগানটা ফেলে দিন আগে,’ শান্ত গলায় বলল রানা।

দ্বিরাঙ্কিত করল না সিদ্দিকী, জানালা দিয়ে ফেলে দিল অস্ত্রটা, গিরিখাদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এবার দৃষ্টিসীমায় দেখা দিল রানা। মুখে নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘কী... কেমন বুঝছেন এখন?’

‘প্রিজ, সাহায্য করুন আমাকে!’

‘আপনার সাহস আছে বলতে হবে,’ প্রশংসার সুরে বলল রানা। ‘এতকিছুর পরেও আমার সাহায্য চাইছেন?’

‘সাহায্য করতেই তো এসেছেন, নাকি? নইলে গাড়ি থেকে নেমেছেন কেন? বান্ধবীকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে যেতে পারতেন।’

‘পারতাম। কিন্তু নিউট্রালাইজারটা না নিয়ে ওখানে গিয়ে লাভ কী, বলুন? ওকে দু’দফা ইনফেক্ট করেছেন আপনি, এ-অবস্থায় ডাক্তাররা কিছুই করতে পারবে না।’

‘কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা তো পেয়েছেন আপনি!’

‘সাধু সেজে লাভ নেই, ডক্টর। আমি ভাল করেই জানি, গির্জার কাগজগুলোতে আসল ফর্মুলা নেই। ওগুলো স্রেফ নিজের প্রাণ বাঁচানোর ফর্মুলা। বিপদে পড়লে গছিয়ে দেবার জন্যে রেখেছিলেন, যাতে ওগুলো উদ্ধারের অজুহাত দেখিয়ে শত্রুকে নিয়ে যেতে পারেন ওখানে, খুন করতে পারেন। করেছেনও!’

‘দেখুন... আমি...’

‘নিউট্রালাইজার, ডক্টর,’ হাত পাতার ভঙ্গি করল রানা। ‘আসলটা। নইলে আপনার জীবনের কোনও দাম নেই আমার কাছে।’

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সিদিকী, তারপর হার মানল। নিচু হয়ে নিজের জুতোর হিল খুলে ফেলল সে, ভিতরের ফাঁপা জায়গা থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট শিশি—বর্ণহীন তরলে ভরা। রানার দিকে ওটা ছুঁড়ে দিল সে। বলল, ‘এই নিন আপনার নিউট্রালাইজার। লিকুইড ফর্ম এটা, মিস সোহানাকে খাইয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।’

খপ করে শিশিটা ধরল রানা। বলল, ‘আপনাকে বিশ্বাস নেই। আমি দেখে আসছি কাজ হয় কি না।’

‘আর আমি?’

‘দুলতে থাকুন। এই ওষুধের কার্যকারিতা দেখে সিদ্ধান্ত নেব: আপনাকে বের করে আনব, নাকি ছুঁড়ে ফেলে দেব পাহাড়ের খাদে।’ উল্টো ঘুরল রানা।

তীব্র ঘৃণায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সিদ্ধিকীর। ছোঁ মেরে পাশের সিট থেকে তুলে নিল সিগ-সাওয়ারটা—সোহানার কাছ থেকে যেটা কেড়ে নিয়ে এসেছিল। চোঁচিয়ে ডাকল, ‘রানা!’

পাঁই করে ঘুরল রানা, পিস্তলটা দেখে থমকে গেল। শীতল গলায় বলল, ‘ওটা আমার।’

‘নট এনিমোর!’ খ্যাপাটে গলায় বলল সিদ্ধিকী। ‘ইউ আর আ ডেড ম্যান, রানা। আপনি—সেইসঙ্গে মিস সোহানাও! আসল অ্যান্টিডোট আদায় করে নিয়েছেন বটে, কিন্তু ওটা কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন না। ভেবেছেন আপনার সাহায্য না পেলে এই গাড়ি থেকে বের হতে পারব না? হাহ্, ফিজিক্সের সামান্য সূত্র প্রয়োগের ব্যাপার... ব্যালাস্ট শিফট করে বেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না। আই অ্যাম আ জিনিয়াস, ইউ নো, আমি সব করতে পারি...’

‘তা হলে দেখি, উড়তে পারেন কি না!’ বলেই সজোরে লাথি হাঁকাল রানা এক্সপ্রোরারের গায়ে। বিশাল বাহনটার তুলনায় সামান্য একটা আঘাত... কিন্তু ওটাই ব্যালাস্টটা নষ্ট করে দিল পুরোপুরি। ধাতব একটা শব্দ তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল গাড়িটা, পিছলাতে শুরু করল।

গুলি করল সিদ্ধিকী, কিন্তু ডাইভ দিয়ে তার আগেই সরে গেছে রানা। বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চলে গেল একদিকে। পরমুহূর্তেই কিনার থেকে খসে পড়ল এক্সপ্রোরার, আরোহীকে নিয়ে নামতে শুরু করল তিনশো ফুট গভীর গিরিখাদের তলায়। অন্যের মৃত্যু সামান্যতম দাগ কাটে না সিদ্ধিকীর মনে, কিন্তু

নিজের মৃত্যু এত কাছে চলে এসেছে টের পেয়ে আঁতকে উঠল সে, বকৃত হয়ে গেল চেহারা। চিৎকার করে উঠল, ‘না-আ-আ-আ!!!’

‘হ্যাঁ, সিদ্দিকী,’ বিড়বিড় করে বলল রানা। ‘সোজা নরকে চলে যাও!’

তিনশো ফুট নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ল এক্সপ্লোরার, নাক সোজা পড়ায় ফ্রন্ট-এণ্ড খেঁতলে গেল; তারপরই একপাশে আছাড় খেয়ে গড়াতে শুরু করল, প্রতি পাকের সঙ্গে ডেঙেচুরে তুবড়ে যাচ্ছে ওটার ইস্পাতের শরীর। গড়ানো যখন গামল, তখন আর গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই ওটাকে, স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ইস্পাতের ছড়ানো ফুলকির সংস্পর্শে ছোট ছোট আগুন ধরে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল উল্টে থাকা গাড়িটাকে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল।

রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল রানা, তারপর দৌড়াতে শুরু করল টরাসের দিকে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে ছোট্ট শিশিটা। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছুতে হবে ওকে।

তেইশ

তিনদিন পর।

আবার মিটিঙে বসতে যাচ্ছে কন্ট্রোলাররা। সরু একটা

করিডোর ধরে সভাকক্ষের দিকে এগোচ্ছে সবাই—উচ্চপদস্থ লোকটা রয়েছে সামনে, তাকে অনুসরণ করছে জেনারেল আর মিলিটারি অ্যানালিস্ট; সবশেষে রয়েছে দুই লেফটেন্যান্ট কর্নেল। নেই শুধু ওদের একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত লারিসা।

‘ট্র্যাজেডি একটা,’ হাঁটতে হাঁটতে বলল উচ্চপদস্থ লোকটা। ‘মেজর মরগানের কথা বলছি। আমাদের জন্য একটা অ্যাসেস্ট ছিল ও। অকালে মারা পড়ল... খুব ক্ষতি হলো কিন্তু!’

‘সুখবরও আছে,’ বলল জেনারেল। ‘ড. সিদ্দিকীও খতম হয়ে গেছে। আমাদের কোনও টেনশন রইল না। আর লারিসা... ওর মত ভয়ঙ্কর নির্ভুর, একরোখা আর অ্যাবসলিউটলি লয়্যাল মানুষ পাওয়া যদিও কঠিন, তবে ওর রিপ্রেসমেন্ট পেতে খুব অসুবিধে হবে না। ইন ফ্যাক্ট, এলিজিবল ক্যাণ্ডিডেটদের একটা শর্ট-লিস্টও নিয়ে এসেছি আমি।’

‘দ্যাটস্ গুড,’ মন্তব্য করল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। ‘তবে পুরো ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু। আমাদের ওই প্রজেক্টটার খবর মিডিয়ার কাছে প্রমাণ সহ ফাঁস করে দিতে পারে, এমন অন্তত দুজন মানুষ এখনও বেঁচে আছে।’

‘মাসুদ রানা, আর সোহানা চৌধুরীর কথা বলছ?’ জিজ্ঞেস করল উচ্চপদস্থ লোকটা।

‘হ্যাঁ। ওদের রেকর্ড জানা আছে আমাদের সবার। দ্রুত মুখ বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে ওরা।’

‘রিল্যাক্স!’ তাক্সিল্য প্রকাশ পেল জেনারেলের কণ্ঠে। ‘কবর থেকে কেউ কারও বিপদ ডেকে আনতে পারে না। খুব শীঘ্রি ওদের ব্যবস্থা নেব আমরা।’

‘রাইট!’ একমত প্রকাশ করল উচ্চপদস্থ লোকটা। ‘আমি তো ভাবছি, একটা পুরস্কার ঘোষণা করব—ওদের কল্যাণ কেটে এনে যে

আমাকে দেখাতে পারবে, তাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে!’

হেসে উঠল দুই লেফটেন্যান্ট কর্নেল। একজন তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল, ‘চমৎকার আইডিয়া, সার! দুনিয়ার সমস্ত পেশাদার খুনিরা লেগে যাবে ওদের পিছনে।’

‘আমি অবশ্য আরেকটু সূক্ষ্ম চিন্তা করছিলাম,’ বলল জেনারেল। ‘ওদেরকে একটা মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দিলে কেমন হয়? আমাদেরকে কিছুই করতে হবে না; সিআইএ, এফবিআই... এরাই আমাদের হয়ে খতম করে দেবে ওদেরকে...’

‘বুদ্ধিটা মন্দ না অবশ্য,’ স্বীকার করল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। ‘আমরা লাইমলাইটের বাইরে থাকতে পারব ওভাবে।’

‘এসো, তা হলে এ-বিষয়টা নিয়ে আজকের মিটিঙে বিশেষ আলোচনা করি, একটা সিদ্ধান্ত নিই—কীভাবে দুনিয়াছাড়া করা হবে ওই দুই বাঙালিকে,’ প্রস্তাব দিল উচ্চপদস্থ লোকটা।

রাজি হলো সবাই।

সভাকক্ষের সামনে পৌছে গেছে কন্ট্রোলাররা, দরজা খুলে ঢুকল প্রায়াক্রমিক রুমটার ভিতরে। ঘরের মাঝখানে রাখা বড় টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সবাই, নিজ নিজ আসনে বসবে... কিন্তু থমকে গেল কাছে গিয়ে।

সাদা রঙের একটা খাম পড়ে আছে টেবিলের উপর, ঠিকানার ডায়গায় লেখা: কন্ট্রোলারদের জন্য। ভুরু কঁচকাল জেনারেল: ‘হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস?’

‘দেখো তো।’ নির্দেশ দিল উচ্চপদস্থ লোকটা।

খামটা তুলে নিল মিলিটারি অ্যানালিস্ট, ভিতর থেকে বের করল একটা চিঠি। জোরে জোরে পড়ল। সম্বোধন-টম্বোধন কিছু নেই, গোটা গোটা অক্ষরে টাইপ করা রয়েছে কয়েকটা বাক্য:

জেনিসটা আমাকে দিতে চেয়েছিল ড. আন্দালিব সিদ্দিকী।

কিন্তু ভেবে দেখলাম, যা-কিছু ঘটেছে, তার পরে এটা শুধু একমাত্র তোমাদেরই প্রাপ্য হয়। তা ছাড়া আমার ধারণা, এটা পেলে আমাকে বা আমার বান্ধবীকে আর বিরক্ত করবে না তোমরা। তাই পাঠিয়ে দিলাম। টেবিলের তলায় পাবে ওটা, কেমন লাগল জানিয়ে।

‘মানে কী এসবের!’ রাগী গলায় বলল জেনারেল। ‘কেউ তামাশা করছে নাকি? চিঠিটা এখানে পৌঁছুল কী করে?’

টেবিলের তলায় উঁকি দিচ্ছিল মিলিটারি অ্যানালিস্ট, হঠাৎ আঁতকে উঠল সে, সভয়ে পিছিয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে বাকিরাও উঁকি দিল, জিনিসটা দেখে একই অবস্থা হলো তাদেরও। নিরীহদর্শন একটা ক্যানিস্টার আটকানো টেবিলের তলায়, সঙ্গে একটা রিমোট কন্ট্রোল ডিটোনেটর।

‘বেরুতে হবে... এফুনি বেরুতে হবে...!’ চেষ্টা করে উঠল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। ছুটে গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি শুরু করল, কিন্তু খুলতে পারল না। ওরা ঢোকানোর পর ওপাশ থেকে কে যেন তালা মেরে দিয়েছে, অনড় রইল দরজা।

এমনি সময়ে বিপ্ বিপ্ করে শব্দ হলো... দরজার ওপাশ থেকে অচেনা মানুষটা রিমোটের বোতাম চেপে দিয়েছে। চোখ-ধাঁধানো আলো-টালো কিছুই দেখা গেল না, শুধু শোনা গেল ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘর ভরে গেল ঝাঁঝালো গন্ধে। শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বয়ে যেতে শুরু করল প্রতাপশালী মানুষগুলোর। কাঁপুনি দেখা দিল শরীরে, বুক খামচে ধরল অচেনা আতঙ্ক। দৃষ্টিতে উন্মাদনা ফুটল, একে একে পিছিয়ে গেল সবাই—কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না আর।

ভয়াবহ ও সন্দেহজনক দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা। মাথা কাজ করছে না আর। তারপর.. হঠাৎ করেই যেন খেয়াল করল

ওরা—ওদের সবার কাছেই পিস্তল আছে...

উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সোহানা বিছানার পাশে বসে আছে রানা। এখানে আসবার পর থেকে ঘুমোয়নি ও, বিশ্রামহীনভাবে রয়েছে একই জায়গায়, সতর্ক প্রহরীর মত। রেসপিরেটর-টা খুলে নেয়া হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, এখন নিয়মিত তালে বুক ওঠানামা করছে সোহানার। নানা রকম রেখা আর শব্দ করতে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো অবস্থার উন্নতি নির্দেশ করছে।

গায়ে একটা ছায়া পড়তেই চোখ তুলে তাকাল রানা, এরিক এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন আছেন উনি?’

‘বিপদ কেটে গেছে,’ বলল রানা। ‘আশা করছি খুব শীঘ্রি জেগে উঠবে।’

‘নিউট্রালাইজারটা খাঁটি ছিল?’

‘মনে তো হয়। ওর হরমোন লেভেল স্বাভাবিকে নেমে এসেছে। যাক গে, তোমার খবর বলো।’

‘সবকিছু ঠিকঠাক আছে,’ বলল এরিক। ‘ব্যাপারটা সামলাতে একটু ঝামেলা হয়েছে বটে... হবারই কথা, গির্জায় এতগুলো লাশ পাওয়া গেল... ঝামেলা হবে না তো হবে-টা কী! তবে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। পুলিশ কিংবা এফবিআই আপনাদেরকে আর বিরক্ত করবে না।’

‘গুড, তা হলে তো সব সামালই দিয়ে ফেলেছ।’

‘মোটাই না,’ গোমড়ামুখে বলল এরিক। ‘সিদ্ধিকীর কন্ট্রোলাররা রয়ে গেছে, ওরা চুপ করে বসে থাকবে না। আপনার এবং মিস সোহানার উপর খুব শীঘ্রি হামলার আশঙ্কা করছি আমি।’

মুচকি হাসল রানা। ‘ওদের নিয়ে ভেবো না। ব্যবস্থা নিয়ে

‘হলেছি আমি, একটা ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার পাঠিয়ে দিয়েছি
দেবের কাছে। আমার এজেন্সির খুব যোগ্য একজন অপারেটর
নিয়োগে গেছে ওটা।’

‘ফিয়ার-গ্যাস কোথায় পেয়েছেন?’ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস
করল এরিক। ‘আপনার কাছে যে-ফর্মুলা আছে, ওটা তো ভুয়া!’

‘কারমেলের বাড়িতে আমার ওপর একটা ক্যানিস্টার ফাটাতে
চেষ্টাছিল সিদ্দিকী... পারেনি। ওটা রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।’

‘হুম! তা হলে তো ভাল কাজ করেছেন। ব্যাটারদের উচিত
সাজা হবে।’

‘ঠিক।’ একটা মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল।

হেসে ফেলল রানা। চোখ মেলেছে সোহানা। রান্নার দিকে
তাকাল ও, হালকা একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। উঠে গিয়ে ওর হাত
ধরল রানা।

‘কেমন লাগছে?’

‘ভাল,’ আস্তে করে বলল সোহানা।

‘ভয় করছে না তো?’

‘হ্যাঁ... করছে। তোমাকে হারাবার!’

‘পাশে আছি আমি,’ বলল রানা, চুমু খেল সোহানার কপালে
‘হারাব না কোনওদিন। ভয় নেই তোমার।’

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের 'পূর্ণ ঠিকানা' দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —ক। আ. হোসেন।

সেলিনা

মিরপুর, ঢাকা।

আচ্ছা, আপনি প্রথমে গল্পের কোন বইটি পড়েছিলেন? মনে আছে?

* স্পষ্ট মনে নেই, তবে খুব সম্ভব বইটির নাম: 'কিশোর বীরদের কাহিনী'—বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট কিশোরদের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের চমকপ্রদ কয়েকটি গল্প। তখন সবে শৈশব থেকে পা দিয়েছি কৈশোরে। বইটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয় সর্দার ভাইয়া (প্রফেসর সর্দার ফজলুল করিম)।

আবদুল্লাহ আল হারুন

প্রযত্নে: উদয়ন লাইব্রেরি, সদর রোড, উপজেলা+জেলা: পটুয়াখালী।

নতুন প্রকাশিত বই 'অন্তর্ধান-১'-এর জন্য শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বইটি পড়তে অত্যধিক ভাল লেগেছিল সোহানা থাকার জন্য। 'ব্ল্যাকমেইলার' বইটিতে সোহানার উপস্থিতিতে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল, 'অন্তর্ধান-১' বইটির মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রানাকে বরফের দেশে পেয়েছিলাম 'মৃত্যুশীতল স্পর্শ' বইটিতে। যত শীঘ্র সম্ভব রানাকে আবার বরফের দেশে পাঠান। সবশেষে সেবা সংশ্লিষ্ট সবার দীর্ঘায়ু কামনা করছি ও কাজীদা'র সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

* আপনার জন্যও আমাদের সবার শুভকামনা রইল।

শাওন

প্রযত্নে: মিজান উকিল, নারায়ণপুর, শেরপুর।

আপনার লেখা 'বিগ ব্যাঙ' ও 'মাদক চক্র' বই দুটি পড়লাম। এত ভাল লেগেছে যে বলে—থুত্থু—লিখে বোঝাতে পারব না। এরকম বই আরও আশা করছি। অনেক দিন পর লিখছি। এর অবশ্য কারণও আছে। সেটা শুধু

আপনাকেই জানানো যায়। আর ভণিতা না করে কারণটা লিখেই ফেলি। কারণ হচ্ছে: বর্তমানে ডাকে পাঠানো বই-এ খরচ বেশি পড়ে এবং লেখাপড়ার চাপ তো, পরবর্তী খবর এই যে আমার কাছে আপনাদের নতুন কোন মূল্যতালিকা নেই। আশা করছি, চিঠি পাওয়া মাত্রই ৩ কপি মূল্য-তালিকা পাঠিয়ে দেবেন।

✽ বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্যতালিকা পেতে হলে আপনার নিকটস্থ সেবা-বইবিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নতুন তালিকা ছাপা হলেই অগ্রহী পাঠককে দেবার জন্য তাঁদের কাছে পাঠানো হয়।

শিমুল হাসান শিশির

থানা-পোস্ট: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর। মোবা: ০১৬৭১-০৯৫৯০৫

অন্তর্ধান-১ হাতে নিয়েই পড়লাম দাঙ্গার মাঝে। তারপর-ই দাঙ্গা রূপান্তরিত হলো ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়ায়। কাহিনির প্রতিটা অংশ উত্তেজনায় ভরপুর। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার-রহস্য। অন্তর্ধান-১-এর জন্য আপনাকে নীলপদ্মের শুভেচ্ছা। নজর কাড়া প্রচ্ছদের জন্য শিল্পীকে একটা লাল গোলাপ। দ্বিতীয় খণ্ডের আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। যদি একটু তাড়াহুড়ো করে বইটা...

✽ এই তো, আপনার হাতে পৌঁছে গেছে।

হীরক

৪৫/১, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা। মোবা: ০১৯১১০৩৪৪৮৩

সাত-আট বছর আগে যখন প্রথম ‘মাসুদ রানা’ পড়া শুরু করি, তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ ছিলাম। এরপর বেশ কিছু সময় বয়ে গেছে। জীবনে অনেক রুঢ় বাস্তবতা দেখেছি। মানবিক অনুভূতিগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনও ‘মাসুদ রানা’র প্রতি ভালবাসা তেমনি আছে। এখনও প্রতিটি বই পড়ে মনে মনে ওর সমালোচনা করি। আজ ‘অন্তর্ধান-১’ পড়লাম। আপনাকে আর কতভাবে ধন্যবাদ জানাব! ‘অন্তর্ধান-২’-এর জন্য অপেক্ষা করছি। লাখো মানুষের ভালবাসায় আপনি দীর্ঘায়ু হোন, এই প্রার্থনা করি। আর ‘মাসুদ রানা’র পাঠকেরা চাইলে আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

✽ আপনার ভালবাসার কথা জেনে আমরা—মানে রানা ও আমি—মুগ্ধ। ...আশা করি বন্ধু পুঁপয়ে যাবেন। ...সমালোচনা কীসের জন্য জানালে সুখী হতাম।

আশরাফুল ইসলাম

৫৩/১ মনির হোসেন লেন (৬ তলা), নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

পত্রের প্রথমেই আমার অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নেবেন। আশা করি অসংখ্য পাঠকের অপরিসীম ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে ভালই আছেন, দোয়া করি এমনটি থাকবেন বহু দিন।

বহু সংকোচ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখলাম। কাজী দা, আমি সেবার প্রায়-নতুন পাঠক। মাত্র তিন বছর আগে মাসুদ রানার ‘কালপুরুষ’ বইটি দিয়ে যাত্রা শুরু। রানার প্রতি আমার ভালবাসার কথা আপনাকে লিখে বোঝাতে পারব না। টিফিনের পয়সা জমিয়ে রানার বই কিনতাম। সর্বসাকুল্যে পড়েছি রানার তিন

তাধিক বই, সংগ্রহে আছে দুইশত পঁচাশিটি।

তবে, আপনাকে লেখার কারণ শুধু আমার চিঠি ছাপানো বা রানার প্রতি আমার ভালবাসা প্রকাশই নয়। আমি লিখেছি রানার ‘মুক্ত বিহঙ্গ’ বইটির একটি উদ্ধৃতি সম্পর্কে। বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৫ কপিটির ১৬২ পৃষ্ঠায় রানা ও প্রিন্সের কথোপকথনে জন ডনের যে উদ্ধৃতিটি আছে তা কি সম্পূর্ণ? আমার মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নয়। যদি না হয়ে থাকে সম্পূর্ণটি কী? জানালে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব। প্লিজ, চিঠিটি ফেলে দিয়ে আমাকে বিমুখ করবেন না। সবশেষে সেবার সকল কলাকুশলীর প্রতি আমার সালাম রইল। ভাল থাকবেন, সবসময়।

✽ সম্পূর্ণ কি না বলতে পারব না, আগে-পরে আরও কিছু থাকতে পারে। ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখতে পারেন।

মোঃ শোয়েব হাসান, মোবা: ০১৭২২-৬৯৯১৯৬, ০১৬৭০-৬৯৭৮৭৩

সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বাংলা শাখা, পিরোজপুর, বরিশাল।

মাসুদ রানা ৩৯০ ও ৩৯১ অচেনা বন্দর প্রসঙ্গে আজকের চিঠি। অনেক দিন পর মনের মত বই পেলাম। রানা যেন সেই প্রথম দিকের রানা, এমনটাই মনে হলো। অতিথি গিল্টি মিয়াও ছিল। ভালই! তবে মিশ্রি খানকে না মারলে কি চলত না? প্রথমটার চাইতে দ্বিতীয়টার প্রচ্ছদ বেশি ভাল। বিপ্লব ভাইকে ধন্যবাদ।

✽ ধন্যবাদ পৌছে গেল যথাস্থানে।

জিসান আহমেদ নীল, মোবা: ০১৭২৩-৫৪০০৬৫

প্রযত্নে: পোস্টার গ্যালারি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

প্রকাশ পেলেও তখনও ‘অচেনা বন্দর-২’ বোয়ালমারী এসে পৌছে নাই। অতঃপর অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যচ্যুত হওয়ার দশা, তখনই খবর পেলাম আমার এক বন্ধু ঢাকা বই মেলায় যাচ্ছে। দেরি না করে তখন বন্ধুটির কাছে টাকা দিয়ে দিলাম এবং অপেক্ষায় থাকলাম কবে টাকা থেকে ফেরে। অবশেষে দুদিন পর যখন সে ফিরল এবং ‘অচেনা বন্দর-২’ হাতে পেলাম খুশিতে তখন নাচতে ইচ্ছা করছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্টক থেকে ‘অচেনা বন্দর-১’ বের করে পড়তে শুরু করলাম। একে একে দুটি বই শেষ করলাম। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি উত্তেজনা ঘাম হয়ে বের হচ্ছে। আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কী এক জাদু বলে যেন ঘণ্টার কাঁটা ৪ ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে। ওফ! অসাধারণ হয়েছে বই দু’টি। সেই পুরনো রানাকে যেন আবার আমাদের মাঝে ফিরে পেলাম। সেই সাথে আতাসী, মার্সিয়া ও মিশ্রি খানকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। আর সোহেল ও গিলটি মিয়া তো আছেই। চমৎকার একটি অভিযানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কাজীদাকে একটা রিমোট কন্ট্রোল্ড বোমা পাঠালাম। ওহ, সরি, রিমোটটা পাঠাতে ভুলে গেছি। ‘ব্ল্যাকমেইলার’ বেরোতে দেরি হলে বলা যায় না ভুল করে রিমোটের লাল বোতাম দাবিয়ে দিতে পারি।

✽ তারপর কী ঘটবে, সে-খেয়াল আছে?

মোঃ আছিকুর রহমান

দোহার, ঢাকা-১৩২১। মোবা: ০১৯১৩০০৬১১১

কাজীদা, জানি না অন্তর্ধান ২য় খণ্ডে আমাদের জন্য কী বিস্ময় রেখে